দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা ৬

শ্রীযুক্ত সুধীর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা সুলেখা মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় সংস্করণকে শুধু মাত্র প্রথম সংস্করণের পরিমার্জিত রূপ বললে বোধকরি কমই বলা হবে, বলা যেতে পারে এটি নতুন ভাবে রচিত। কারণ প্রথম সংস্করণটি একশ পৃষ্ঠারও কম পরিসরে রচিত হয়েছিল। আর সেখানে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল দশ। এবারে অতিরিক্ত আরও ছ'টি প্রবন্ধ যেমন সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তেমনি পূর্বেকার প্রবন্ধগুলিকে আনুপূর্বিক পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে। এইভাবে গ্রন্থটিকে সামগ্রিকতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙ্গালী জাতি এবং বাংলা দেশের একটি সামগ্রিক পরিচয় ফুটিয়ে তোলার অভিপ্রায়েই গ্রন্থটি পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছে। পাঠক সেই পরিচয় লাভ করলেই গ্রন্থকারের প্রয়াস সার্থক হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটিকে গ্রিফিথ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশে অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ অনুপকুমার মাহিন্দার যে উৎসাহ দেখিয়েছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। সেইসঙ্গে গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যাপারে 'দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস' এর পুলিনচন্দ্র বেরা এবং স্বপনকুমার সাউ এর নিরলস পরিশ্রমের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। যে সব পাঠক গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানিয়েছেন, তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

বিষয়সূচী

বাংলা প্রবাদে দেব-দেবী

বাংলা প্রবাদের বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এ পর্যন্ত সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যাকে বিষয়-বৈচিত্র্য অতিক্রম করে যায়নি ঠিকই, কিন্তু তবু কত বিবিধ প্রসঙ্গই না সংগৃহীত প্রবাদগুলিতে স্থান পেয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে কেবল দেব-দেবী সংক্রান্ত প্রবাদগুলিই আলোচিত হবে। দেব-দেবী সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যা হবে শতাধিক। তবে দেব-দেবী সংক্রান্ত হলেও এইসব প্রবাদে যে অধ্যাত্ম রস মুখ্য হয়ে উঠেছে, তা কিন্তু নয়। বরং বেশকিছু প্রবাদে দেব-দেবীদের সম্পর্কে একপ্রকার তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের পূজিত দেব-দেবীর সংখ্যা সীমাহীন, তার মধ্যে কয়েকজনই মাত্র প্রবাদগুলিতে উল্লিখিত হয়েছেন। দেব-দেবী সংক্রান্ত প্রবাদে মানব চরিত্রের সমালোচনাই প্রকট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও এইসব প্রবাদের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে প্রচলিত নানা রীতি-নীতি ও সামাজিক সংস্কারের কথা যেমন জানতে পারি, তেমনি কোন দেব-দেবী আমাদের সমাজে অধিকতর জনপ্রিয়, তাও বেশ বোঝা যায়। কারণ অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় দেব-দেবীরাই যে শুধু প্রবাদে স্থান পেয়েছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত যাঁরা, তাঁরাও স্থান পেয়েছেন। তাছাড়া সংখ্যাধিক্যের থেকেও বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর জনপ্রিয়তার আভাস লাভ করা সম্ভব হয়।



অর্থনীতিতে যেমন শ্রমবিভাগ স্বীকৃত, আমাদের ধর্মীয় জীবনেও তেমনি দেব-দেবীদের আধিপত্যের বিভাগ স্বীকৃত। অর্থাৎ দেবতা হলেই যে তিনি এখনকার মন্ত্রীদের ন্যায় সর্ববিষয়ে পারঙ্গম তা নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট। প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সেই পরিচয়টুকুরও সন্ধান পাই। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের উপরি লাভ।

হিন্দুদের সর্ববিধ পূজার্চনায় প্রথমেই যে দেবতার আরাধনা প্রশস্ত, তিনি হলেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের পূজা ব্যতিরেকে কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বাংলা প্রবাদে এ হেন গণেশের নিষ্প্রভ ভূমিকা আমাদের যারপরনাই বিস্মিত করে। পূজার্চনার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিকে দেব-দেবী সংক্রান্ত প্রবাদের আলোচনায় অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে গণেশ সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যাল্পতাই শুধু নয়, যে দু' একটি প্রবাদে গণেশ স্থান পেয়েছেন, তাতেও গণেশের সিদ্ধিদাতা ভূমিকার পরিচয় অনুপস্থিত। তার পরিবর্তে তাঁর স্থূল বপুর জন্য নিষ্ক্রিয় ভাবটিকেই ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

গোবর গণেশ

কারবারে দেউলিয়া হওয়া বোঝাতে বলা হয়ে থাকে সেই বহুল পরিচিত বাক্যাংশটি—গণেশ ওল্টানো।

এক্ষেত্রেও গণেশের সিদ্ধিদাতা ভূমিকার পরিচয় অনুপস্থিত।

বাঙ্গালীদের কাছে প্রিয় দেব-দেবীদের একজন হলেন জগন্নাথ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সূত্রেই নীলাচল বাঙ্গালী ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক তীর্থক্ষেত্রে পর্যবসিত, আর সেইসঙ্গে জগন্নাথদেবও এক অতি পরিচিত দেবতা। স্বভাবতঃই জগন্নাথদেবকে নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে—

ক. কালো হাঁড়ি কেয়াপাত, তবে দেখবি জগন্নাথ।

খ. জগন্নাথে গেলে হাড়ীর ঝাঁটা খেলে।

গ. জগন্নাথের আটকে বাঁধা।

ঘ. লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।
দেল্‌কোর মাথায় দিয়ে হাত, কাঁদেন প্রভু জগন্নাথ॥

ঙ. ধনীর চিন্তা ধন ধন, নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা॥

চ. আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত!

ছ. থোঁড়া কি জগন্নাথের সেথো।

জ. যেমন জগন্নাথ, তেমনি সুভদ্রা।

উদ্ধৃত প্রবাদগুলির মধ্যে প্রথম দুটি প্রবাদে সেকালের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। আগে যখন দেশে যানবাহনের সুব্যবস্থা ছিল না, তখন মানুষ এক স্থান থেকে অপর স্থানে হেঁটেই যাতায়াত করতো। বিশেষত

দূরবর্তী তীর্থস্থান সমূহে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাই এক্ষেত্রে সময় লাগতো প্রচুর। পথে যেতে যেতে তীর্থযাত্রীদের নিজেদেরই রান্না-বান্না করে উদরপূর্তি করতে হত। শ্রীক্ষেত্র দর্শনের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেই ইঙ্গিতটিই প্রথম প্রবাদটিতে দেওয়া হয়েছে যে, কালো হাঁড়িতে রান্না করে পথিমধ্যে আহার্য গ্রহণ এবং কেয়া-বন অতিক্রমণের মত নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর তবেই শ্রীক্ষেত্রস্থিত জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ সম্ভব হত।

আগেকার দিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশের আগে প্রবেশেচ্ছু ভক্তকে প্রথমে হাড়ীর ঝাঁটার আঘাত খেতে হত। নতুবা মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করা যেত না। তৃতীয় প্রবাদটিতে পুরীধামে জগন্নাথের প্রসাদের জন্য যাত্রীকর্তৃক অর্থ বরাদ্দের প্রসঙ্গটিই অভিব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ প্রবাদটিতে যুক্তি-পারম্পর্যহীন ঘটনাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পঞ্চম প্রবাদটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন প্রকার চিন্তা-ভাবনা তথা অবলম্বনের বৈচিত্র্যের দিকটিই মূলতঃ ব্যক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'জগন্নাথ' অর্থে নির্দিষ্ট কোন দেবতাকে ইঙ্গিত না করে সাধারণভাবে ভগবানকে বোঝান হয়েছে।

স্বাবলম্বনের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গেই এবং সেইসঙ্গে অন্যের তুলনায় নিজের প্রয়াসকে বড় করে দেখাতেই 'আপন হাত জগন্নাথ পরের হাত এঁটোপাত' প্রবাদটির সৃষ্টি। আর জগন্নাথদেবের যেহেতু হাত নেই, তাই খোঁড়াকে জগন্নাথের সাথী বলে বলা হয়েছে জগন্নাথ সংক্রান্ত সপ্তম প্রবাদটিতে! আসলে সমপর্যায়ের মানুষের মধ্যেই যে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে, সেই সত্যই এই প্রবাদটিতে প্রকাশিত। তাছাড়া জগন্নাথ-বিগ্রহ অদ্ভুত রকমের। সেই কারণেই জগন্নাথ নিয়ে রসিকতাও হয়েছে। প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বোঝাতেই জগন্নাথ সংক্রান্ত শেষ প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

জগন্নাথের পর দুর্গা-বিষয়ক প্রবাদগুলির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। দুর্গা-পূজা যে কেবল অন্যান্য দেবদেবীর পূজার তুলনায় ব্যয়-সাপেক্ষ পূজা তাই নয়, সেইসঙ্গে দুর্গাপূজার মত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রায় অন্য কোন পূজাতেই দেখা যায় না। সর্বোপরি তিন-চারদিন স্থায়ী এই পূজা বাঙ্গালী জীবনের এক পরম বাঞ্ছিত অনুষ্ঠান। তাই দুর্গা এবং দুর্গাপূজা সঙ্গত কারণেই কয়েকটি প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

হিঁদুদের দুগ্‌গা পুজো।
উপরে চিকণ চাকণ ভিতরে খড়ের বুজো॥

প্রবাদটি যে কোন হিন্দুর রচনা নয়, তা বোধকরি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, এই প্রবাদটির রচয়িতা কোন অ-হিন্দু, সম্ভবত কোন মুসলমান। দুর্গা প্রতিমাই প্রবাদটির লক্ষ্য। কারণ অন্যসব প্রতিমার মত দুর্গা প্রতিমার কাঠামোও খড় আর কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়, তারপর তার ওপরে মাটির প্রলেপ পড়ে। সবশেষে রঙ, পোশাক, অলঙ্কার ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিমাকে সুসজ্জিত করা হয়। কিন্তু যতই কেন ঐশ্বর্যময়ী রূপ দৃষ্টিগোচর হোক, আসলে প্রতিমা যে খড়ের তৈরী, প্রবাদটিতে সেই কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। নিছক স্নিগ্ধ পরিহাসপ্রিয়তাই প্রবাদটিতে পরিস্ফুট। কোনক্রমেই হিন্দুদের দেবী দুর্গাকে ছোট করা হয়নি।

আধারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই উপকরণ-উপাদানের গুরুত্বে কিভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, সেই প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে বড়ো সুন্দর করে বলা হয়েছে—

এক ঝাড়ের বাঁশ
কোনটিতে দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হাড়ীর ঝুড়ি।

সচরাচর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় শরৎকালের আশ্বিন মাসে। কিন্তু কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও ঘটে—অর্থাৎ আশ্বিন মাসে না হয়ে কার্তিক মাসেও পূজার দিন পড়ে পাজির গণনানুযায়ী। সেই প্রসঙ্গেই একটি প্রবাদে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে—

পাঁজি হয়েছে উজন সুজন, কার্তিক মাসে দুর্গাপূজন।

দুর্গাপূজায় নানা আয়োজন করতে হয়। পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ-উপচারের প্রয়োজন হয়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

গুয়াপানের জন্য দুর্গোৎসব বাকি থাকে না।

অর্থাৎ অনেকটা সেই 'পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে'র মত। পূজার আনুষঙ্গিক সব আয়োজন সম্পন্ন হলে নিছক পান-সুপারির জন্য আর পূজা আটকায় না। বৃহৎ অনুষ্ঠান যে সামান্য উপকরণের জন্য অসম্পূর্ণ থাকে না, সেই কথাটি বোঝাতেই এই প্রবাদটির সৃষ্টি।

যখন যার প্রয়োজন, তখন সেই ব্যবস্থা না করে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে

অবাঞ্ছিত আয়োজনে নিম্নোদ্ধৃত দুটি প্রবাদ প্রযুক্ত হয়—

ক. ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।

খ. দুর্গাপূজায় শাঁখ বাজে না ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।

অল্প থেকে বেশির দিকে অগ্রসর হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সোজা সরল বিষয় থেকে দুরূহ বিষয় বা অনুষ্ঠানের আয়োজন না করে একেবারেই যদি জটিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তখন প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি—

জন্মে হয় নি ঘেঁটু পূজো, একেবারে দশভূজো।

ঘেঁটুপূজায় যৎসামান্য আয়োজন প্রয়োজন। সেটুকুও যে ব্যক্তি কখনও করেনি, তার পক্ষে দুর্গা পূজার ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করা যে খুবই কঠিন, প্রবাদটির বাচ্যার্থে তাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—

কোনকালে নাই মনসা পূজা, একেবারে দশভুজা

এইবার কালীবিষয়ক প্রবাদগুলির আলোচনা। বাঙালী হিন্দু যদিও নানা পুরুষ দেবতার আরাধনা করে থাকে, তবে তুলনামূলক বিচারে স্ত্রী-দেবতার আরাধনাই যে অধিক পরিমাণে হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার বিভিন্ন স্ত্রী-দেবতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী হলেন কালী। শুধু স্বদেশেই নয়, এমন কি প্রবাসী বাঙালীদেরও বিশেষভাবে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়। কয়েকজন ইংরেজ একত্র হলে যেমন 'Play House' খোলে, তেমনি কয়েকজন হিন্দু বাঙালী একত্রিত হলে কালী-মন্দির স্থাপনে উদ্যোগী হয়। অতএব এ হেন কালীভক্ত বাঙালী যে কালী সম্পর্কে প্রবাদ রচনা করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে একথা ঠিক যে কালীবিষয়ক প্রবাদের সংখ্যা কালীর জনপ্রিয়তা তথা আধিপত্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

কালীর ভীতিপ্রদ রূপ নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—রক্তদন্তী কালী। অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

রাম রহিম কালী, ভেদ করলেই মলি।

সব দেবতাই সমান, রূপে ভিন্ন হলেও স্বরূপে সকলেই যে এক এই চিরন্তন সত্যটিই প্রবাদটিতে অভিব্যক্ত। বিশেষ বিশেষ ধর্ম এবং দেব-দেবী সম্পর্কে আমাদের অনেকেই স্পর্শকাতর, কিন্তু তা যে কতখানি মূল্যহীন, সকল ধর্মই যে সমান মর্যাদার অধিকারী, সকল দেব-দেবীই সমান, উদ্ধৃত প্রবাদটি সেই

কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কালীর শোভা করে অসি, শিবের শোভা শিরে শশী।

কালীপূজার সঙ্গে পাঁঠাবলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শাস্ত্রে পঞ্চরিপুর বলিদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আমরা দেবীর কাছে নিরীহ ছাগল বলি দিই। একটি প্রবাদে এই বলিদান প্রথাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে আসলে এই প্রথার উদ্দেশ্য হল—

কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া।

অপর একটি প্রবাদে বৈষ্ণব ও শাক্ত—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এবং সেইসঙ্গে সামগ্রিকভাবে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় বিরোধ যে কত অন্তঃসারশূন্য তা বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—

কালী কালী বনমালী, শেখ পরাণে জয়ধর আলি।

বাংলা প্রবাদে লক্ষ্মী সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যাধিক্য বেশ চোখে পড়ার মত। লক্ষ্মীসংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে মুখ্যত দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ; এক, কি ভাবে মানুষ লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হতে পারে, যার ফলে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। আর দ্বিতীয় হল, কি কারণে লক্ষ্মী মানুষকে পরিত্যাগ করেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচারে, লক্ষ্মীর করুণা যাতে অবিচল থাকে সেই ব্যাপারেই প্রবাদ-গুলিতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে পরামর্শ দান করা হয়েছে।

একটি প্রবাদে ধান্যরোপণ বিধি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কোল পাতলা ডাগর গুছি,
লক্ষ্মী বলেন—ওইখানে আছি।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন রাত্রি জাগরণে মা লক্ষ্মীর অপার করুণালাভ সম্ভব বলে বিশ্বাস প্রচলিত—

জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নিদ্রায় হন লক্ষ্মী বিরূপা।

এইবার আরও কি কি কারণে লক্ষ্মী বিরূপা হন তার প্রসঙ্গে আসা যাক। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কালো কাপড়, রুক্ষ মাথা
লক্ষ্মী বলেন—থাকব কোথা।

অর্থাৎ কালো কাপড় এবং রুক্ষ কেশে লক্ষ্মীর অসন্তোষ। অন্য একটি প্রবাদেও লক্ষ্মী কি কারণে গৃহস্বামীকে পরিত্যাগ করেন সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

দক্ষিণে তাল উত্তরে বেল, লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল।

উপার্জনের অধিক ব্যয় করলেও লক্ষ্মী অচলা থাকেন না—

বৃত্তি বাইরে করে ব্যয়, তার লক্ষ্মী কদিন রয়।

লক্ষ্মী সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ :

ক. হাতে লক্ষ্মী, বলে লক্ষ্মীছাড়া।

খ. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

গ. হাড়ীর লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।

ঘ. লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।

ঙ. লক্ষ্মীর ঘরে কালো পেঁচা।

চ. আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলার বায়ে বালাই ওড়ে।

ছ. লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মী ছাড়া, শঙ্কর ভিখারী।

জ. কালার কানে শোলার বুজো, কালা বলে মোর লক্ষ্মী পুজো।

ঝ. আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।

ঞ. হাড়ীর যখন লক্ষ্মী ছাড়ে শুয়োরকে ঝাঁটা মারে।

পুরুষ দেবতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী দেবতা যদি কেউ থাকেন আমাদের দেশে, তবে তিনি মহাদেব। তিনিই আবার শিব বা শঙ্কর। নীলকণ্ঠ বা বিশ্বম্ভর নামেও তিনি পরিচিত। আবার অল্পে তুষ্ট বলে তিনি আশুতোষ। শিব যে আমাদের দেশে কত জনপ্রিয়, তার প্রমাণ শিব বিষয়ক প্রবাদের সংখ্যাধিক্যেই নিহিত রয়েছে। সমুদ্রমন্থন জাত হলাহল পান করে শিব হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর।

শিব এক বিচিত্র দেবতা। অন্যান্য দেবদেবীর পূজা আড়ম্বরপূর্ণ হলেও শিব পূজায় কিন্তু আড়ম্বর অনুপস্থিত। শিবকে স্নান করান হয় ডাব বা নারকেলের জলে। আবার অনেক সময়েই শিব-লিঙ্গের ওপরেই কঠিন নারকেল ভাঙ্গা হয়। যে দেবতার আরাধনা, তাঁরই মাথায় কঠিন নারকেল ভাঙ্গা যে কতখানি অসামঞ্জস্য-পূর্ণ তা আমরা ভেবে দেখি না। এই বিষয়টিই একটি প্রবাদে ব্যক্ত হয়েছে, যদিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে—

শিবের মাথায় নারকেল ফাটান।

শিবের বাহন ষাঁড়। শিবের বাহন বলে ষাঁড়ের দৌরাত্ম্য কিছু কম নয়। যত্র-তত্র তার বিচরণ। ভক্তদের দেওয়া আহার্য গ্রহণে বাহনটি স্ফীতকায়ও বেশ।

অলস জীবন যাপন তার। তার ওপর কারণে-অকারণে অপরকে তাড়না করা তার স্বভাব। তবু তাকে আঘাত করা চলে না। যতই হোক দেবতার বাহন। এইজন্য একটি প্রবাদে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে—

শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না।

লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে যদি উপলক্ষ্যকে মুখ্য করে তোলা হয়, সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় একটি প্রবাদ—

শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা।

যে বিষয়টি যে ব্যক্তির জানা প্রয়োজন, তাকে না জানিয়ে যদি অবাঞ্ছিত বা অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সেই বিষয়ে অবহিত করা হয়, তাহলে বলা হয়—

যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, খবর পেলেন ঘেঁটু মনসা।

গাঁজাখোরের গাঁজাখোর জামাতা বোঝাতে বলা হয়ে থাকে—

শিবের কন্যা শিবকে দান।

শিব সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ হল—

ক. শিব নাচে রঙ্গে পার্বতী নাচে সঙ্গে।

খ. শিবরক্ষক বন, বনরক্ষক শিব।

গ. ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপও টের পায় না।

ঘ. ভোলানাথ ভজতে তোমায় ভক্তি নেইকো আর।
চালচিত্তির চটে গেছে, কাঠামো হয়েছে সার,

ঙ. সাপ মারলে শিবকে লাগে।

চ. শিব গড়তে বাঁদর।

ছ. নেশায় শিবের বাবা।

দুজনের মধ্যেকার আত্মিক সম্পর্ক বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

অভেদাত্মা হরিহর।

সর্প অধ্যুষিত বাংলাদেশ। প্রতি বছরই এখানে বহু মানুষ সর্পাঘাতে মৃত্যু বরণ করে। তাই সর্পাঘাতজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে সর্পদেবী মনসার আরাধনা বাংলাদেশের বিস্তৃততর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। প্রবাদেও মনসা দেবীর সেই প্রভাব পরিস্ফুট। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

হেলে নয় গিরগিটি নয় মনসার সঙ্গে বাস।

অপর একটি প্রবাদ হল—

মনসার ভয়ে খাট করালে ওলাবিবি কি ঠাঁওরালে।

এক্ষেত্রে 'মনসা' বলতে অবশ্য সাপকে বোঝান হয়েছে। 'মনসা' সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা পরিচিত প্রবাদটি হল—

একে মা মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

উপলক্ষ্য লক্ষ্যকে যদি ছাড়িয়ে যায়, তাহলে প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি। এটিও বেশ জনপ্রিয়—

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকায়।

অর্থাৎ যে মনসাপূজার জন্য ঢাক আনা হল, তার খরচ মেটাতে শেষে স্বয়ং মনসাকেই বিক্রী করতে হল।

দুটি বস্তু বা ঘটনার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বোঝাতে প্রযুক্ত হয় যে প্রবাদটি সেটি হল—

মনসা পূজার সাপ, চৈত পরবের কাপ।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—

'তুমি শালগ্রাম শিলা
শোওয়া বসা যার সকলি সমান
তারে নিয়ে রাসলীলা।'

অর্থাৎ শালগ্রাম শিলার দেবত্বকে কবি পরিহাস করেছিলেন এই কারণে যে এই শিলার শোওয়া-বসার পার্থক্যটুকুও অন্তর্হিত। অথচ এ হেন শিলাকেই সর্বশক্তিমান নারায়ণ জ্ঞানে মানুষ পূজার্চনা করে থাকে। নারায়ণের নাকি এটি প্রতীকী রূপ। এ হেন শালগ্রাম শিলাকে নিয়ে প্রবাদেও পরিহাস করা হয়েছে—

শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান।

যতীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সূত্ররূপে এই প্রবাদটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ কবির রচনার বহু আগেই এই প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছিল। শিবকে নিয়ে পরিহাসের নানা অবকাশ থাকলেও এবং শিবের তুলনায় নারায়ণের ঐশ্বর্যময় রূপ স্বীকৃত হলেও, উল্লেখযোগ্য যে শালগ্রামকে নিয়ে প্রবাদে যেমন ব্যঙ্গ ও পরিহাস করা হয়েছে, তেমনটি অন্য কোন দেব-দেবীর ভাগ্যে ঘটেনি। শালগ্রাম সংক্রান্ত প্রায় সব ক'টি প্রবাদেই দেবত্বের লেশমাত্র স্বীকৃত হয়নি। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে শালগ্রামকে বাটনা বাটার নোড়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আবার একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

সকল নোড়াই শালগ্রাম হলে হলুদ বাটি কিসে।

অন্য একটি প্রবাদের বিষয়—

সব নুড়ি শালগ্রাম হয় না।

এ ছাড়াও বলা হয়েছে—

ক. শালগ্রামের ধান ভানা।

খ. শালগ্রাম চিবিয়ে খায়, শাল তো কোন ছার।

গ. শালগ্রাম বাঁধা দিয়ে মদ খাওয়া।

ঘ. শালগ্রাম ফেলে নোড়া ভজা।

ঙ. বানরের হাতে শালগ্রাম শিলা।

চ. বাড়ীতে আছেন শালগ্রাম দেখতে দেখতে তল গেলাম।

শালগ্রাম দিয়ে যে ধান ভানা যায় না, সেটাই বোঝানো হয়েছে প্রথমটিতে। অক্ষম ব্যক্তির গুরুতর কার্যসাধনে ব্রতী হওয়াকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই প্রবাদে। আবার মদ্যপ ব্যক্তির নেশার জন্যে যে কোন কিছু করতে বাধে না, সে কথাই বোঝান হয়েছে তৃতীয় প্রবাদটিতে। আসল জিনিসকে অবজ্ঞা করে কৃত্রিম বস্তু নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে চতুর্থ প্রবাদটিতে।

বিশ্বাসে সাধারণ বস্তুও যে কত অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, তারই উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হতে পারে যে প্রবাদটি সেটি হল—

মানি ত শালগ্রাম না মানি ত পাথর।

অর্থাৎ বিশ্বাস ব্যতিরেকে শালগ্রাম শিলাও সামান্য প্রস্তর খণ্ড বই কিছুই নয়।

প্রবাদে শালগ্রাম শিলা নিয়ে পরিহাস করা হলেও হরি, কৃষ্ণ বা গোবিন্দকে কিন্তু বাঞ্ছিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখান হয়েছে—

ক. হরি বাঁচান প্রাণ বদ্যির বড় মান।

খ. হরি যার সখা বল, দুশমন তার পায়ের তল।

গ. পারের কর্তা হরি, দেবেন চরণতরী।

ঘ. বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলে রইতে নারি।

ঙ. হরি বল মন চললেন গোবর্দ্ধন।

চ. হরিপদে থাকে মন হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।

একটি প্রবাদে অবশ্য হরির বিরুদ্ধে কিছু অনুযোগ উচ্চারিত হয়েছে—

তুমি যদি হরি পতিতপাবন, তবে কেন আমার দশা এমন।

কিংবা, কৃষ্ণ যদি পতিত পাবন, তবে রাধার কেন দশা এমন।

অপর একটি হরি বিষয়ক প্রবাদে বলা হয়েছে—

কড়ি পেলে হরি মেলে।

এইবার একটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল যাতে হরিকে খুব মৃদুভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।

যৎসামান্য প্রয়াসে নিশ্চিত লাভের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়—

হরি বললেই কাঁড়া চাল।

হরির পর কৃষ্ণ-বিষয়ক অন্যান্য প্রবাদের প্রসঙ্গ। এই প্রবাদগুলিতে কৃষ্ণের দেবত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতাকে—

ক. ইষ্ট যেই কৃষ্ণ সেই, দুয়ে কিছু ভেদ নেই।

খ. কৃষ্ণকথা মধুর বাণী, তুমি বল আমি শুনি।

গ. বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

ঘ. রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

ঙ. কৃষ্ণ কেমন, যার মনে যেমন।

চ. ফলের মধ্যে আম, মানুষের মধ্যে শ্যাম।
কাপড়ের মধ্যে সাদা, নারীর মধ্যে রাধা॥

অভাবনীয় বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে কৃষ্ণ সংক্রান্ত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

তেমনি আবার জাগতিক কর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে—

তাঁতী তাঁত বুনতেই মন, তাঁতী কৃষ্ণকথা শোন।

চারিত্র ধর্ম বোঝাতে গিয়ে একস্থানে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণকথা কয়না বকে, মধু হয়না বোলতার চাকে।

অর্থাৎ যে যার ধর্ম তাই অনুসরণ করে, এর বৈপরীত্য সুলভ নয়। যে কাজ অন্য সকলের ক্ষেত্রে প্রশস্ত, সেই কাজেই বা আচরণে যদি মুষ্টিমেয়ের প্রতি ভিন্নতর আচরণ প্রদর্শিত হয়, তবে স্বভাবতঃই দুঃখের আর অবধি থাকেনা। সেই অভিমানই অভিব্যক্ত হয়েছে এই প্রবাদটিতে—

সবাই কৃষ্ণের নাম করে, আমি করলেই ধরে মারে।

'কড়ি পেলে হরি মেলে'র অনুরূপ প্রবাদ হল—

কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হলে কৃষ্ণ পাই।

গোবিন্দবিষয়ক প্রবাদে বলা হয়েছে—

ক. ভাই বল বন্ধু বল সম্পদের সাথী—
অসময়ে নিদান কালে গোবিন্দ সারথি।

খ. পেট ভরলে আনন্দ, ভর্জরে গোবিন্দ।

উদ্ধৃত প্রবাদগুলিতে গোবিন্দ সম্পর্কে কোন অশ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশিত হয়নি। বরং গোবিন্দের প্রতি আন্তরিক নির্ভরতাই ব্যক্ত হয়েছে।

একটি প্রবাদে অবশ্য গোবিন্দের তুলনায় গুরু-ভজনকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমন সাবধান বাণী করা হয়েছে যে গুরুকে অবজ্ঞা করে গোবিন্দ ভজনায় প্রবৃত্ত হলে, ভজনকারীর নরক বাস অবশ্যম্ভাবী। প্রবাদটির মধ্য দিয়ে গুরুবাদী মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়—

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে।

অপর পক্ষে গোবিন্দের প্রতি আস্থায় মানুষ কি পরিমাণ নিশ্চিন্ত ও সেইসঙ্গে অপরিণামদর্শী হতে পারে, তারও পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে—

আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে।

মানুষ অনেক সময়েই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেব-সেবা করে না, কয়েকটি প্রবাদে সেই বিষয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে—

ক. বিছুটি-ঝাড়ের আম গোপীনাথের।

খ. উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

গ. ফাটলে পড়ল ফল, গোপালায় নমঃ।

ঘ. হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ।

অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠিত কোন কাজের সুফল লাভে প্রত্যাশী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এইসব প্রবাদ প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

উত্তর ভারতের তুলনায় পূর্বভারতে রামচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বেশ সীমিত, বিশেষত পূজার্চনার পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ পূর্বভারতের হিন্দুরা রামচন্দ্রকে অবতার বলে মানেন, তাঁর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল একথা স্বীকার করেও অকপটে বলতে হয় যে নিয়মিত পূজার্চনা লাভ এতদঞ্চলে যে সব দেবদেবীদের ভাগ্যে ঘটে থাকে, শ্রীরামচন্দ্র তা থেকে বঞ্চিত।

বাংলা প্রবাদে তাই বলে রামচন্দ্রকে অবহেলা করা হয়নি, অবহেলা যে করা হয়নি তার প্রমাণ একাধিক প্রবাদেই রামচন্দ্রের উপস্থিতি। 'রাম না হতে রামায়ণ' অর্থে যে প্রবাদটি প্রচলিত, তা হল—

রাম না হতে রামের মা।

আদর্শ রাজ্য বলতে এখনও আমরা যে বা যাঁর রাজ্যের কথা শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করি তা হল—

রামরাজ্য।

ভূতের ভয় মানুষের এক চিরন্তন ভয়, আর এই ভয় থেকে উত্তীর্ণ হতে স্মরণ করা হয় রামচন্দ্রকেই। কারণ—

রাম নামে ভূত পালায়।

দুই অবাঞ্ছিত পরিণামের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হলে বুদ্ধিমান মানুষ স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত ভালটিকেই নির্বাচন করে, আর এই প্রসঙ্গে যে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটি হল—

রাম রাবণে মরা ভাল বাঁদরের দাঁত খিচুনি সয়না।

অপরপক্ষে যেখানে দুটি পরিণামই অবাঞ্ছিত এবং অনিবার্য, সেক্ষেত্রে বলা হয়

রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব।

সিদ্ধান্ত নিতে যখন আমরা ইতস্ততঃ করি, বিশেষত যেখানে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে, কিংবা থাকলেও ইতর বিশেষ মাত্র, সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি—

রাম ভজি কি রহিম ভজি।

অভাবনীয় বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় যে প্রবাদটি, তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় বিদ্যমান—

ভূতের মুখে রাম নাম।

আমরা যে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই ধর্ম নিয়ে বিরোধ ঘটাই, এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মকে ও সেই ধর্মের উপাস্যদের হেয় জ্ঞান করি, কয়েকটি প্রবাদে অতি সূক্ষ্মভাবে সেই সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ধর্ম নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব প্রবাদে যে যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে, তা স্বীকার করতে হয়—

ক. হিন্দুর 'নারায়ণ', মুসলমানের 'তোবা'।

খ. রাম রহিম কালী ভেদ করলেই মলি।

প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী যে পরিবারে সন্তান হয় না, সেই পরিবারে কার্তিক পূজা করলে নাকি সন্তান লাভ ঘটে। একটি প্রবাদে এই সংস্কারটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে—

হবে না আর বাঁজার ছেলে কার্তিক রে তোর বাবাও এলে।

শনিঠাকুরকে খুব ভীতির দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। কারণ শনির কোপে নাকি জীবনে সুখ-শান্তির লেশমাত্র থাকে না। সকলপ্রকার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি জোটে মানসিক অশান্তি ও দুর্ভোগ। একটি প্রবাদে প্রাতঃকালে আহারাদির অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে যে সীমাহীন কষ্টভোগের সম্মুখীন হতে হয়, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বিহানী লৌকিক যে জন ছাড়ে, শনিঠাকুর ঘুরায় তারে।

ঘেঁটু, খোস-প্যাঁচড়া নিরাময়ের দেবতা। দেবকুলে এর স্থান খুবই নীচে। এর পূজা হয় বাড়ির বাইরে, আর পূজার উপকরণও যৎসামান্য। তাই এ হেন ঘেঁটু পূজার আড়ম্বরকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে—

ক. ঘেঁটু পুজোতে চিনির নৈবেদ্য।

খ. ঘেঁটু পুজোতে ঢোল সানাই।

অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বরানুষ্ঠানই এইসব প্রবাদের প্রেরণা। অনুরূপ প্রেরণায় রচিত আর একটি প্রবাদ উদ্ধার করা যেতে পারে—

মূল দেবতার পূজা নাই, স্তবচনীর ঘটা।

একই বিষয় নিয়ে রচিত প্রবাদে পরস্পর বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন বাংলা প্রবাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা চলে। তাই একটি প্রবাদে যখন বলা হল—

ঈশ্বর ঈশ্বর করে যেই, তার ঘরে ভাত নেই।

তখন অন্য একটি প্রবাদে অভিব্যক্ত হল—

ভাই বল বন্ধু বল সম্পদের সাথী।
অসময়ে নিদান কালে গোবিন্দ সারথি।

দেব-কারিগর বিশ্বকর্মাকে বাংলা প্রবাদে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি, তৎপরিবর্তে তাঁর তথাকথিত শিল্পনৈপুণ্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, সমালোচিত হয়েছেন তিনি। আর এই প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার কারণ নীলাচলের অসম্পূর্ণ জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণ। প্রবাদের ভাষায়—

বিশ্বকর্মা কত কারিগর তা জগন্নাথে দেখা গেছে।

অপর এক প্রবাদেও বিশ্বকর্মা সমালোচিত হয়েছেন এইভাবে—

বিশ্বকর্মার বেটা বিয়াল্লিশকর্মা।

বিশ্বকর্মার পর চণ্ডীর প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। কোপনা রণচণ্ডী নারী অর্থে প্রযুক্ত হয়—

দশবাহু চণ্ডী বা দশবাই চণ্ডী।

কুলুই চণ্ডী সম্পর্কিত প্রবাদটি হল—

কুলুই চণ্ডীর পূজায় নৈবেদ্যের চূড়া।

স্পষ্টতঃই এখানে কুলুই চণ্ডী সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশিত।
চণ্ডী সম্পর্কিত আর একটি প্রবাদ—

ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া।

গঙ্গার উৎপত্তি পৌরাণিক মতানুযায়ী শিবের জটাজাল থেকে, আর স্বয়ং ভগীরথ সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের মুক্তির জন্য এই সুরনদীকে আবাহন করে এনেছিলেন। গঙ্গা তাই হিন্দু মাত্রেরই কাছে অতি পবিত্র নদী বলে বিবেচিত। গঙ্গা সম্পর্কিত প্রবাদগুলিতে গঙ্গার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আস্থাই সূচিত হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

গঙ্গায় ময়লা ফেললে গঙ্গার মাহাত্ম্য কমে না।

মাছের তেলে মাছ ভাজার মত বলা হয়ে থাকে :

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

সকল পূজাতেই গঙ্গার পবিত্র বারিধারা অপরিহার্য। গঙ্গা পূজাতেও গঙ্গাজল আবশ্যক, কিন্তু এক্ষেত্রে ভক্তকে আর বাইরে থেকে তা সংগ্রহের প্রয়াস করতে হয়না। গঙ্গায় উপনীত হয়ে গঙ্গার জলেই গঙ্গাপূজা সম্পন্ন করা চলে। গঙ্গা সম্পর্কিত অপর একটি প্রবাদ হল—

মা গঙ্গাই জানেন।

ঘরামির ঘর ছেঁদার মতস্বয়ং অন্নপূর্ণার আনুকূল্য লাভ করেও যে ব্যক্তি অন্নের জন্য হা-হুতাশ করে নিজের মূঢ়তার পরিচয় দেয়, তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি—

অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

বাঞ্ছিত সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য যদি কেউ ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তবে সেক্ষেত্রে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য দেব-দেবী নিয়ে রচিত কয়েকটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ —

ক. নাড়ুগোপাল।

খ. দর্পহারী মধুসূদন।

গ. সরস্বতীর বরপুত্র।

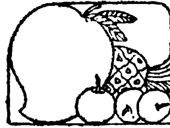
ঘ. সাক্ষীগোপাল।

ঙ. ভাঁড়ে মা ভবানী।

দেব-দেবী সংক্রান্ত অধিকাংশ প্রবাদে বিভিন্ন দেব-দেবীর কথা উল্লিখিত হলেও মূলতঃ এগুলিতে বৃহত্তর কোন সত্যকেই প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছে। বিশেষকে ছাপিয়ে নির্বিশেষ সত্যই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

বাংলা প্রবাদে ফল-মূল

বিচিত্র দেশ বাংলাদেশ। বৈচিত্র্য এর সর্বত্র—সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মাচরণে, সঙ্গীতে। এমন কি প্রকৃতির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য—এই বৈচিত্র্য এর ঋতু পরিক্রমায়, পাখ-পাখালিতে, ফল-মূলে, গাছ-গাছড়ায়। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়েই বলা চলে 'সকল দেশের সেরা' বলে যদি বা নাই বলি, তবে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'—কথাটা আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে সোচ্চার কণ্ঠেই বলতে পারি।



বাংলাদেশে যেমন নানা ধরণের পাখি, নানা ধরণের ফুল, তেমনি নানা ধরণের ফল-মূলও দেখতে পাওয়া যায়। এইসব ফল বছরের নানা সময়ে নানা ঋতুতে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ঋতু নানারকমের ফুলের সঙ্গে ফলের ডালি সাজিয়ে আমাদের যেন পরম সোহাগভরে উপহার দেয়। এইসব ফলের বর্ণ, স্বাদ ও আকৃতি নানাশ্রেণীর। কোনটি ছোট, কোনটি বা মাঝারি আবার কোনটি বা বেশ বড়। স্বাদের দিক থেকেও কোনটি জোলো, কোনটি মিষ্টি, কোনটি টক, কোনটি কষায়। কোন ফল সরস, আবার কোনটি নীরস। রঙেরও তাদের কত না বাহার—লাল, কালো, হলদে, সবুজ, গোলাপী, বাদামী, নীলাভ, খয়েরি, সাদা আরও কত কি! উপাদান হিসেবে এইসব ফলমূলের সংযোজন বাংলা প্রবাদের বৈচিত্র্যকেই অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ধাঁধাতে ফল-মূল বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে; কিন্তু প্রবাদের মত নির্বিচারে সব রকম ফলের সেখানে স্থান হয়নি। মুষ্টিমেয় কেবল সেই ক'টি ফলই স্থান পেয়েছে, যেগুলির গঠনে আছে কিছু বৈশিষ্ট্য অথবা অস্বাভাবিকতা। ফলমূল বিষয়ক ধাঁধাতে যেখানে বক্তব্য একান্তভাবে বিশেষ বিশেষ ফলমূলের গঠন প্রকৃতির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ, সেক্ষেত্রে প্রবাদে ফল-মূলকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্নতর এক বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সে

বক্তব্য হল মূলতঃ মানব-চরিত্র সম্পর্কিত। মানব-চরিত্রের সমালোচনাই সেখানে প্রধান। তবে একান্তভাবে ফলমূল বিষয়েই নিবদ্ধ, এমন প্রবাদও আছে। নিঃসন্দেহে তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। এই ধরণের প্রবাদের মধ্যে আছে বিশেষ বিশেষ ফল-মূল ভোজনের রীতি, ফলের দ্রব্য গুণ, ফলের গঠন বৈশিষ্ট্য, ফল বিশেষের স্বাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত বক্তব্য।

এইবার বিভিন্ন ফল অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলির আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। ফলের রাজা আম। প্রবাদেও আমের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—

ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।

কিংবা, ফলের মধ্যে আম, মানুষের মধ্যে শ্যাম।
কাপড়ের মধ্যে সাদা নারীর মধ্যে রাধা॥

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—

ফল ফল আম্রফল, নারীর সেবা ইন্দ্রজল।

তাই আমের ওপর সবারই লোভ। সকলেই এই অমৃতফলের আস্বাদের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু ব্যাকুল হলেই ত আর এই ফল হস্তগত করা সহজসাধ্য নয়। ইচ্ছামত আম কেবল সেইসব মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান মানুষেরাই ভক্ষণ করতে পারে, যাদের আছে নিজেদের আম-বাগান। তাই ত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

চাইলেই কি পাবে।
খাস বাগানের আম নয়ত চোকলা কেটে খাবে॥

আম যেমন অমৃতফল, তেমনি এর আস্বাদন, যোগ্য ব্যক্তি ছাড়াও সম্ভবপর নয়। এর আস্বাদনকারীকে হতে হবে যথার্থ ভোজনরসিক, নতুবা অপাত্রে এই ফলের যোগ্য মর্যাদা থাকে না। সেক্ষেত্রে অনেকটা বানরের গলায় মুক্তার মালার মত অবস্থা দাঁড়ায়। একটি প্রবাদে এই বক্তব্যকেই একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে—

কাকের মুখে সিঁদুরে আম।

কিংবা, বানরের হাতে পাকা আম, বানরে বলে রাম রাম।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না ঠিকই, কিন্তু যার কপালে দুধ জোটে না, তার ঘোলের উপর নির্ভর করা ছাড়া করারই বা থাকে কি? ঠিক তেমনই, যার কপালে আম জোটে না তাকে আমড়ার ওপরই নির্ভর করতে হয়। স্বাদে পার্থক্য থাকলেও দুটিই ফল। আর তাছাড়া দুটি ফলেরই প্রথম দুটি বর্ণের

মধ্যেও রয়েছে অভিন্নতা। তাইত বলা হয়েছে—

ফল না থাকলে আমড়া চোষে।

কিন্তু যার কপালে আম জোটে, সে যদি এহেন অমৃত ফল লাভ করেও তার স্বর্গীয় আস্বাদন না করে, প্রবাদের ভাষায়—

'আম ফেলে আঁটি চোষা' স্বভাব যাদের, তাদের প্রতি সত্যিই করুণা হওয়ার কথা। আসলে এই প্রবাদটিতে মূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েও যারা তার উপযুক্ত ব্যবহার না করে তার থেকে অনেক কম মূল্যের সম্পদে পরিতৃপ্ত থাকে, সেইসব মূঢ়দের বোঝান হয়েছে।

অনেক সময় আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে অকারণে মাথা ঘামাই, এই অনুচিত আচরণ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

আম খাওয়া নিয়ে কথা, আঁটি নিয়ে কি মাথাব্যথা।

আম এমনই আকর্ষণীয় যে কোনো কারণে তা আস্বাদন করা সম্ভব না হলে, অঙ্গে তার স্পর্শ থেকেও এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিলাভ ঘটে—

পাকা আমের রসি, খাই না খাই গায়ে ঘসি।

আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ, অথচ সামর্থ যেখানে অল্প, সেখানে প্রযুক্ত হয় যে প্রবাদটি, সেটি হল—

হাত ছোট, আম বড়ো।

আম থেকে তৈরী হয় দুটি লোভনীয় খাবার—আমসি আর আমসত্ত্ব। আমসি করা হয় আম ফুরিয়ে গেলে আমের অনুপস্থিতিতে খাবার জন্যে। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

আম ফুরোলে আমসি খাবে।

নতুন আম যখন পাওয়া যায় তখনই যদি আমসি খাওয়া হয়, তাহলে আম ফুরোলে তার বিকল্প হিসেবে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আমসত্ত্ব তো আসলে আমেরই সার পদার্থ। তাই আম বাদ দিয়ে কখনও আমসত্ত্ব প্রস্তুত হতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি আম না পেয়েই আমসত্ত্ব তৈরীর জন্য ব্যাকুল হয়, তাহলে ব্যাপারটা 'রাম না হতে রামায়ণে'র মত দাঁড়ায়।

প্রবাদের ভাষায়—

আম না হতে আমসত্ত্ব।

যেখানে যে জিনিসের প্রাচুর্য, সেখানে সেই জিনিস অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এটাই সাধারণ রীতি। কিন্তু যদি এর বৈপরীত্য ঘটে, তাহলে

ব্যাপারটা দাঁড়ায়—

আমতলায় আম মাঙ্গার মত।

আম বাগান থাকলে আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের গাছের আম বিলোতে হয়। এটা একটা বাৎসরিক রীতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ গাছের ভাল আমগুলি নিজেদের জন্যে রেখে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের আম অপরকে বিলিয়ে থাকে। আর সেই সূত্রেই রচিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি—

টক্ টেঁসো আঁটিসারা শস্যশূন্য আঁশভরা।
এই আম বিলাবার ধারা॥

সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় সকল সময়েই প্রত্যাশীদের ভীড় হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্যফল' রচনাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। একটি প্রবাদেও বলা হয়েছে—

মিষ্টি আমেই পোকা ধরে।

বাচ্যার্থের দিক দিয়েও বাস্তবিকই পোকা কখনও টক আমে ধরে না, তারাও মিষ্টি আমকেই আশ্রয় করে। নিছক অনুগ্রহ প্রত্যাশী যারা, তারা যখন দেখে ব্যক্তি বিশেষের আর অনুগ্রহ বিলোবার ক্ষমতা নেই, তখন তারা অতি সহজেই এক সময়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করে চলে যায়। এইসব সুযোগ সন্ধানীদের উদ্দেশেই রচিত হয়েছে এই প্রবাদটি—

ফুরল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান।

যার যা ক্ষমতা তার কাছ থেকে তার বেশি আশা করাই অনুচিত। আমরা যদি স্মরণে রাখি—'আমড়া গাছে আম হয় না' তাহলে অনেক হতাশার হাত থেকেই আমরা অতি সহজে রেহাই পেতে পারি।

আমরা অনেক সময়েই বড় বেশি আশা করি আর সেই আশাও অনেক-ক্ষেত্রেই হয় অস্বাভাবিক। পরিণামে তাই প্রতারিত হতে হয়। এই প্রতারিত হওয়ার চিত্রটি দুটি প্রবাদে বড় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

ভক্ত বড় ভক্তি করে, গুরু রইল বসে।
গাছের আম গাছে রইল বোঁটা গেল খসে॥

অপর প্রবাদটিতে অনিশ্চিতের আশায় অপেক্ষাকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইল প্রত্যাশে।

আমের ফলন হয় প্রচুর, একটি প্রবাদে সেই প্রাচুর্যের কথা বলা হয়েছে এইভাবে—

আম ফলে থোলো থোলো
তেঁতুল ফলে বাঁকা
ভাদর লোকের ঘরে কেবল
রাঁড়ের হাতে শাঁখা।

গাছে যত আম ধরে তার সব থাকে না। বেশ কিছু নানা কারণে ঝরে যায়। গেলেও যা থাকে তাও নেহাৎ কম না। মোট আমের যদি এক আনাও গাছে থাকে তাহলেও তার সংখ্যা যথেষ্টই হয়। যেমন যত ডিম বা চারা মাছ জলে ছাড়া হয় তার সব থেকে তো আর মাছ হয় না। মোট ডিম বা পোনার এক কোনা ছানাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে কোনা হল যে পাত্রে মেপে ডিম বা পোনা ছাড়া হয়। এইবার এই সম্পর্কিত প্রবাদটি কি রকম দেখা যাক্—

আমের আনা, মাছের কোনা।

আমের ফলন বাংলা দেশের সর্বত্র হলেও তবু কোন কোন অঞ্চল বিশেষ ভাবে চিহ্নিত এজন্য—

আম, আমড়া, কুঁজড়াধান, এই তিন নিয়ে বর্ধমান।

কুয়াশার ঝাঁঝে তাল তেঁতুলের কোন ক্ষতি না হলেও আম্রমুকুলের খুবই ক্ষতি হয়। এই সম্পর্কিত একটি প্রবাদ—

কুয়া হয়, আমের ভয়, তাল তেঁতুলের কিছুই নয়।

প্রায় সব মানুষই চায়—অবিমিশ্র লাভের অধিকারী হতে, অর্থাৎ লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারতে। কিন্তু যদি এমন হয় সাপও মরল না, আবার এদিকে লাঠিটিও ভাঙ্গলো? সেক্ষেত্রে দুঃখ রাখার জায়গা মেলা ভার। অনুরূপ ভাবটুকু বিধৃত হয়েছে একটি প্রবাদে—

আমও গেল, ছালাও গেল।

আমের পরেই যে ফলের নাম স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় তা হল কাঁঠাল। আমের মত কাঁঠালও বাংলাদেশের এক অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় সুস্বাদু ফল। কাঁঠালের জনপ্রিয়তা তাকে নিয়ে রচিত প্রবাদের সংখ্যাধিক্য থেকেও অনুমান করা যায়। কাঁঠাল খাওয়ার ক্ষেত্রে এক বড় বিপত্তি হল আঠা লাগার ভয়। কাঁঠালের আঠা যেমন আছে, তা ছাড়াবার ব্যবস্থাও তেমনি আছে। যতই হোক আঠার কারণে তো আর এমন রসাল ফলটিকে অনাস্বাদিত রাখা যায় না।

একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

কাঁঠাল খেয়ে লাগল আঠা, তেল দিয়ে ঘুচাও লেঠা।

আবার বুদ্ধি থাকলে আঠা বাঁচিয়েও কাঁঠাল খাওয়া যায়। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

শেয়াল কাঁঠাল খায়, বকের মুখে আটা।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হল—'কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা'। এই প্রবাদের মূল অর্থ হল অপরকে কষ্টের ভাগীদার করে নিজে সুফলের অধিকারী হওয়া।

যা অস্বাভাবিক, বাস্তবে হয় না, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় এই প্রবাদটি—

আবাতি কাঁঠালের ভোঁতা।

কচি কাঁঠালের যে ভোঁতা হয় না, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রবাদটি রচিত। অপরিপুষ্ট কাঁঠাল পাকলে, তার ভেতরে আঠার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইজন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

নাটা কাঁঠালের আটা বেশি।

আমের মত নিজেদের গাছের কাঁঠালও পরিচিত পরিজনদের দেওয়া রীতি। কিন্তু রীতি হলেই যে সকলে তা মানবে বা মেনে চলে তা নয়। তবে মুখের ওপর একেবারে না দেওয়ার অস্বীকৃতি অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বলা হয়—কাঁঠাল পাকে শ্রাবণ মাসে।

অন্য একটি প্রবাদেও এই না দেওয়ার মানসিকতার সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে—

না-দেওয়া কাঁঠালের শাওনে নাম।

কাঁঠাল পাকে গ্রীষ্মে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের অনেক আগে থেকেই রসাল ফলটির জন্য রসনা লোলুপ হয়ে ওঠে—

চৈত্র মাসে খরাণে, কাঁঠাল খোঁজে পরাণে।

জামাইষষ্ঠীতে জামাইকে আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলমূল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। যে জামাই কখনও কাঁঠাল খাননি, প্রথমে স্বভাবতঃই কাঁঠাল খেতে সে অনীহা প্রকাশ করবে। কিন্তু প্রথমে অস্বীকারের পর একবার কাঁঠালের স্বাদ পাবার পর যখন এই ফলটির প্রতি তার আসক্তি জন্মায় তখন বেচারীর কপালে আর কাঁঠাল জোটে না, কেননা ইতিমধ্যেই তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

আগে জামাই কাঁঠাল খান্ না।
শেষে জামাই ভোঁতাও পান্ না॥

একটি প্রবাদে কাঁঠালের আস্বাদ-প্রাপ্ত ব্যক্তির সন্তানসহ আগমনের কথা বলা হয়েছে এবং এর থেকেই ফলটির রসনা তৃপ্তির ক্ষমতাও প্রতিপন্ন হয়েছে—

সোয়াদী গাছের কাঁঠাল খেয়ে, ছানা নিয়ে আসে ধেয়ে।

'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান' কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। অর্থাৎ কিনা যার উপযুক্ত যোগ্যতা নেই তাকে যোগ্য করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ভিতরে যদি সার না থাকে, কিল গুঁতায় কি কাঁঠাল পাকে।

অর্থাৎ উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকলে শত চেষ্টাতেও অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য করে তোলা যায় না। যে ফলপ্রাপ্তি অনিশ্চিত তার জন্যে বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণকে একটি প্রবাদে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

কাঁঠাল সংক্রান্ত আর একটি প্রবাদ—

কাঁঠালটি আমায় দাও, বিচি গুণে কড়ি নাও।

কাঁঠালের প্রতি দুর্বলতার কারণে মানুষ কাঁঠাল গাছ রক্ষাতেও বিশেষ যত্নবান। যেখানে কারণে অকারণে মানুষ অন্যান্য গাছপালা কেটে নষ্ট করে, সেখানে কাঁঠাল গাছ কাটা দূরের কথা, উল্টে কাঁঠাল গাছের গোড়ায় ভাল করে মাটি দিয়ে পরিচর্যা করে—

সকল গাছ কাটি কুটি, কাঁঠাল গাছে দেই মাটি।

বাংলাদেশের নানাবিধ ফলমূলাদির মধ্যে অন্যতম হল কলা। কলা আমাদের দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফল। এখানকার মাটিও কলা চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। তাই কলা এখানে সুলভও বটে। কলার খাদ্যগুণের কথা বাদ দিলেও পূজার্চনায় কলা এক আবশ্যিক উপাদান। কলা ব্যতিরেকে কোন পূজাই হয়-না। ঘটস্থাপনে যেমন কলার প্রয়োজন, তেমনি নৈবেদ্যেও কলার দরকার। মোটের ওপর কলা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বাংলা প্রবাদেও তাই কলা সঙ্গত কারণেই তার উপযুক্ত স্থানটি করে নিয়েছে। পূজার্চনা আর কলা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে বেশ কয়েকটি

কলা-সংক্রান্ত প্রবাদে পূজার প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

পরের চাল পরের কলা, ব্রত করেন চন্দ্রকলা।

অপরের সঙ্গতির বিনিময়ে ইষ্টসাধনের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ব্রত-পার্বণ উপলক্ষ্যে অনেক ধর্মভীরু মানুষই উপবাস করেন, আর উপবাস ভঙ্গের পর প্রথমে ফলাহার করেন। কেউ কেউ আবার তণ্ডুল জাতীয় ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণের পরিবর্তে ফলাহার করে অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহার করেও ব্রত-পার্বণ পালন করেন। মোটের ওপর ব্রত-পার্বণের সঙ্গে ফলাহারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আর ফলাহার যেখানে, কলার উপস্থিতিও সেখানে অনিবার্য ভাবেই ঘটে থাকে। একটি প্রবাদে আমরা তারই সন্ধান পাই—

বার কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা॥

প্রবাদটি অবশ্য প্রভূত আহার্য গ্রহণের অধিকারী উপবাসীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়।

আর একটি প্রবাদে তথাকথিত ভক্তদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—

'ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্যি নে' ছুটে পালা।

ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত ভোজ্যসামগ্রী শেষপর্যন্ত ভক্ত ও পূজারীর পেট-পূজাতেই লাগে। ঠাকুর নিজে কিছুই গ্রহণ করেন না। বাচ্যার্থ এইরকম হলেও আসলে এই প্রবাদটিতে সেইসব সুযোগ সন্ধানীদের সমালোচনা করা হয়েছে, যারা অপরকে লোভনীয় বস্তুতে প্রলুব্ধ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে এবং শেষ পর্যন্ত যে লোভনীয় বস্তুর দ্বারা কার্যসিদ্ধি করে, তা থেকেও অপরকে বঞ্চিত করে।

কলা বানর এবং হনুমানদের বড়ই প্রিয়। তাই কলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে স্বাভাবিক নিয়মেই বানরের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, যেমন এসে পড়েছে এই প্রবাদটিতে—

কলা খেল যত বান্দর, রাজ্য পেল রামচন্দর।

কৃপণ অথচ ভক্ত এমন ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত একটি প্রবাদ হল—

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ

অর্থাৎ কিনা নৈবেদ্যর জন্য প্রয়োজনীয় কলা না কিনে হাটের কলাকেই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে। 'এক ঢিলে দুই পাখী মারা'র মত

একই সঙ্গে দুটি কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে যে প্রবাদ প্রায়ই ব্যবহৃত হতে শোনা যায়—সেটি হল—

রথ দেখা কলা বেচা।

ঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন নিজেদেরই স্বার্থে, অথচ সেই ঠাকুরকে আপ্যায়নের বেলায় আমরা তাঁর মৌনতার সুযোগ নিই। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের ভোজ্যসামগ্রী, যা নাকি মানুষের অব্যবহার্য, তাই দেওয়া হয় ঠাকুরের ভোগে। প্রবাদের ভাষায়—

পচা কলা খাবে কে ? বাঁদী নেই, দাসী নেই, ঠাকুর ঘরে দে।

বেচারী ঠাকুরের কাছে আমরা সুযোগ নেবো, কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে যা দেবো তা না দেওয়ারই সমান। নৈবেদ্যতে দেওয়া হয় আলোচাল আর কলা, তাও অতি নিকৃষ্ট মানের—

আলো চাল বেঁড়ে কলা, খাওনা ঠাকুর এই বেলা।

এইবার অন্যান্য প্রবাদের ক্ষেত্রে কলার ব্যবহার কিরূপ তা দেখা যেতে পারে। ছেলে ভোলানোর ব্যাপারে কলার একটা ভূমিকা আছে। এমনিতেই শিশুরা ভোজনপ্রিয়। তার ওপর যদি কলা জোটে তো কথাই নেই। তাই ত বলা হয়েছে—

কলা দিয়ে পোলা ভোলানো।

আবার নিতান্ত বৈষয়িক মানুষকে হাত করতেও শিশুকে খুশি করা হয়ে থাকে। কি রকম ভাবে ?

ছেলের হাতে কলা দিলে, ঝানু বুড়োর মন মিলে।

আদর করে কলা খেতে দিলে তার খোসাটিও গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। তাই একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

আদরের কলা, বাকলও ভালা।

কলা যতই উপাদেয় এবং জনপ্রিয় ফল হোক, তা শ্লেষ্মা বর্ধক, কণ্ঠস্বরের অনিষ্ট-কারক। একটি প্রবাদে তাই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

ঘোল, কুল, কলা—তিনে নষ্ট গলা।

কলা সম্পর্কিত আর একটি প্রবাদ—কলা কাটে, খোসায় বাধে।

আমরা নিজেদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে অপরের প্রতি স্নেহ, প্রেম, সোহাগ ইত্যাদি দেখাতে প্রস্তুত। একাধিক প্রবাদ এই আচরণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে—

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচকড়া।

কিংবা,

দয়া আছে মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।
আধপয়সার আটটি কলা পরাণ গেলে না দি॥

একটি প্রবাদে অধিক পরিমাণে কলা ফলানোর উপায় বর্ণিত হয়েছে—

কলায় দলা, হলুদে ছাই, বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।

অর্থাৎ কিনা কলাগাছের গোড়ায় মাটির দলা দিতে হয়, যেমনটি দিতে হয় হলুদ গাছের গোড়ায় ছাই। এতে ফসল বাড়ে।

শশা আমাদের আর একটি পরিচিত ফল। আম-কাঁঠালের মত সুস্বাদু কিংবা রসাল না হলেও এই ফল প্রবাদ রাজ্যে পরিত্যক্ত হয়নি। কয়েকটি প্রবাদেই শশা তাই স্থান পেয়েছে। অন্যান্য ফলের তুলনায় শশা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের, কিন্তু দরিদ্রের কাছে তারও মূল্য যথেষ্ট। একটি প্রবাদে তাইত বলা হয়েছে—

কাঙালের শশাও ধন।

ভাই এবং বোনের সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতেও শশার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে একটি প্রবাদে। ভাইয়ের বোনের জন্যে যত না দরদ, তার থেকে ঢের বেশি দরদ বোনের তার ভাইয়ের জন্যে—

শশা খেয়ে জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান্।
গুড় খেয়ে জলকে টান্, তেমনি বোনের ভাইকে টান॥

আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো ভালবাসায় যদি আমরা আকৃষ্ট হই, তাহলে পরিণামে যে আমাদের প্রতারিত হতে হয়, ভোগ করতে হয় চরম দুঃখ ও অশান্তি একটি প্রবাদে তা সুন্দর করে বলা হয়েছে—

লোকদেখানো ভালবাসা, ভাদ্রমাসের কচি শশা।
দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ॥

কৃত্রিম প্রীতি কে অন্য একটি প্রবাদেও এইভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

শশার পিরীত ভেতর ফাঁক।

সৌভাগ্যবান এবং দুর্ভাগ্যবান মানুষের পার্থক্য একটি প্রবাদে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে—

কেউ খায় শশা, কেউ মারে মশা।

শশা সংক্রান্ত আর দুটি প্রবাদ হল—

ক. আইল অন্তর শশা যার যেমন দশা।

খ. শশা বেচুনি বেচে শশা, তার হয়েছে সুখের দশা।

নিজের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এমন মানুষ আছে যে অপরের ত্রুটির সমালোচনা থেকে বিরত না হয়ে বরং সোচ্চার হয়ে ওঠে। এইসব মানুষকে সমালোচনা করা হয়েছে—

'চালুনি বলে ধুচুনি তোর পেছন কেন ছাঁদা'—প্রবাদটিতে। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হল—আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খস্‌খসে।

ধাঁধায় আনারস বেশ গুরুত্ব পেলেও প্রবাদে কিন্তু এই ফলটি অন্যান্য ফলের তুলনায় বেশ অবহেলিত থেকে গেছে লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে উদ্ধৃত প্রবাদটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্বীকার করতে হয়।

বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে না পারলে আমরা সেই বাঞ্ছিত বস্তুটির বিরূপ সমালোচনা করে নিজেদের অসাফল্যকে ভুলতে চাই বা অপরকে নিজেদের অসাফল্য সম্বন্ধে ভোলাতে চাই। এই প্রসঙ্গেই বলা হয় 'আঙ্গুর ফল টক'। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ রচিত হয়েছে আখকে কেন্দ্র করে—

আখের চেয়ে সোঁদাল মিঠে।

আখকে নিয়ে আরও অনেকগুলি প্রবাদ রচিত হয়েছে। আখ নিজে মিষ্টি, কিন্তু তাই বলে তার শেকড়টি নয়—

আখ হোক মিষ্টি, শেকড় নয় ইষ্টি।

আখ রসাল ফল ঠিকই, কিন্তু সেই রস পেতে গেলে বেশ কিছু পরিশ্রম করতে হয়, আখকে বলপ্রয়োগ করে পিষতে হয়, নতুবা এর রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়। একটি প্রবাদে তাই বলা হল—

আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে।

কথায় বলে হাত দিয়ে জল গলে না কিন্তু পেছন দিয়ে হাতী গলে যায়। একদিকে চরম কার্পণ্য অথচ অন্য ব্যাপারে চরম ঔদার্য্যের পরিচয় অনেক মানুষের কাছ থেকেই আমরা পেয়ে থাকি। স্ব-বিরোধিতা মানুষের চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আখ সংক্রান্ত একটি প্রবাদে এই স্ব-বিরোধিতার চিত্রটি প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

আখ দিতে পারে না, গুড়ের নাদা ধরে দেয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আখ থেকেই গুড় তৈরী হয়।

সচরাচর মানুষ যে পর্যন্ত সৌভাগ্য-সুখের অধিকারী হয়, সে পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে অহংবোধ। সৌভাগ্যসুখ অন্তর্হিত হলে তখন দেখা দেয় তার মধ্যে বিনয়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

আখক্ষেত থাকতে সেলামালি নেই।

'সেলামালি' শব্দটি আসলে হল 'সেলাম আলেকুম' বা অভিবাদন। মানুষের চরিত্রের নানা ত্রুটির মধ্যে একটি হল অকৃতজ্ঞতা। যার সাহায্যে আমরা কোন কার্য সম্পাদন করি, কার্যশেষে অনেক সময়েই আমরা সেই ব্যক্তির অবদানকে বিস্মৃত হই। অথবা সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত প্রকাশ করি না। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

যার আখ তার গুড়, কলা চোষেন ভুঁড়ো সুর।

Morton-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আখ ক্ষেতে ফসল পাহারার জন্যে এক কাল্পনিক দেবতার মূর্তি স্থাপন করা হয়। কিন্তু সমস্ত আখ-সংগ্রহ সম্পন্ন হবার পর আর সেই দেবতার মূর্তি ক্ষেতে রাখা হয় না। এখানে 'ভুঁড়ো সুর' বলতে আখ ক্ষেতে স্থাপিত কাল্পনিক দেবমূর্তিকেই বোঝান হয়েছে। আখের চাষে বিশেষ প্রয়োজন লোকবলের। তাই বলা হয়েছে—

সাত পুত তের নাতি, তবে করে আখের ক্ষেতি।

আখ সংক্রান্ত আর একটি প্রবাদ হল—

আখ গাছটি দিয়ে মারলেও মিষ্টি লাগে না।

আখের মিষ্টত্ব যতই থাক, তবু আখকে যখন মারার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন প্রহৃত ব্যক্তির কাছে স্বাভাবিক কারণেই আখের মিষ্টত্ব আচ্ছন্ন হয়ে যায় আঘাতের কাছে।

কুকশোভা বা কুকুরশোঁকা গাছ ছেঁচে দিলে কাটা স্থানের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে আখ ছেঁচতে গিয়ে এ হেন কুকুরশোঁকা গাছের কথা বলা অবান্তর। কারণ আখের রসে ত আর ক্ষতস্থান নিরাময় হয় না। অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে তাই বলা হয়—

আখ ছেঁচতে কুক্‌সিমের বাত।

এক্ষেত্রে কুক্‌সিম বলতে কুকুরশোঁকা গাছকেই বোঝান হয়েছে।

আমড়া হেন ফলও প্রবাদ রাজ্যে ঠাঁই পেয়েছে। তবে আমড়ার শাঁস যে খুব কম, এর আঁটি মাত্র সার, সামান্য শাঁস ছালের মত আঁটির গায়ে লেগে থাকে। একটি প্রবাদে তাই বর্ণিত হয়েছে—

হায়রে আমড়া আঁটি আর চামড়া।

কাম্যবস্তু যদি সহজে পাওয়া যায়, তাহলে কে আর তার জন্যে কাঠ খড় পোড়াতে চায়? একটি প্রবাদে তাই বলা হল—

আমড়াতলায় যদি আম পাই, আমতলায় কেন যাই।

আম এবং শিমুলের সঙ্গে আমড়াও ফাল্গুন মাসের বৃষ্টিতে নির্মূল হয়ে যায়, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

আম আমড়া শিমুল ফাল্গুনের জলে নির্ম্মুল।

যে ক'টি ফলের সকল অবস্থাতেই প্রশংসা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল আমড়া—

আমড়া, চালতা, তাল, আবাল বৃদ্ধ ভাল।

নারকেল আনারসের মতই গঠন বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষভাবে ধাঁধার বিষয় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে প্রবাদ-রাজ্যেও তার অনুপস্থিতি ঘটেনি। অবশ্য যে কারণে নারকেল ধাঁধার বিষয় হয়েছে অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সেই কারণেই নারকেল প্রবাদের বিষয় হয়েছে—

খোদার এমন কল, নারকেলের ভেতর জল।

মানুষের যে অভিলাষ কোনদিনই বাস্তবায়িত হবেনা, যেরূপ অসম্ভব আশাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে একটি প্রবাদে—

আশা করেছেও কাও, পাকলে খাবেন ডাও।

'ডাও' অর্থে ডাব। প্রবাদে ডাব প্রায় অনুপস্থিত দেখা গেছে।

নারকেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এগুলির অস্বাভাবিক সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ। আর মজার ব্যাপার হল যত নারকেল পাওয়া যায়, ততই ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাঁশের ক্ষেত্রে কাটলে তা আর বাড়ে না। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গটিই স্থান পেয়েছে—

দাতার নারিকল, বখিলের বাঁশ।
কাট না কাট বাড়ে বার মাস॥

বানরে অন্যান্য সব ফল খেলেও কঠিন নারকেল ভক্ষণ করা তার সাধ্যের অতীত। কঠিন আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত সুস্বাদু শস্য তার আয়ত্তের বাইরে। তাই তো বলা হয়েছে—

নারিকেল কি খেতে পারে বানরে?

নালকেলকে একটি প্রসঙ্গে 'ধার্মিক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ আর কিছুই নয়। নারকেলের বাইরেটা কঠিন, কিন্তু ভেতরে তার মধুর শাঁস—

ধার্মিক নারিকেল, পাপী কুল।

'বানরের গলায় মুক্তার মালা'র অনুরূপ একটি প্রবাদ হল—

বানরের হাতে ঝুনো নারকেল।

এক্ষেত্রে অবশ্য বোঝাতে চাওয়া হয়েছে—যে দ্রব্য আমাদের ব্যবহারের অতীত তার অর্থহীন অধিকারী হওয়া।

নারকেল নিয়ে রচিত আর একটি প্রবাদ—

বার নারকেল তের বামুনের ঘাড় ভাঙ্গে।

বাংলাদেশের আর একটি পরিচিত ফল হল তাল। তাল আকারে অনেক বড় হয়। তাই পাকা ভারী তাল গাছ থেকে যখন পড়ে, তখন তার আঘাত-দানের ক্ষমতাও হয় অনেকখানি। একটি প্রবাদে তাই তালের আঘাতকে শূলের আঘাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

তালের ঘা যেন শালের ঘা।

বেতালা-সঙ্গীত রসিক শ্রোতার চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, সেই আঘাতের তীব্রতা বোঝাতে বলা হয়েছে—

বেতালের ওপর মারে তাল, ভাদ্রমাসের যেন তাল।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—'তাল পাকলেই শাল'।

তালগাছে অন্যান্য গাছের মত সহজে ফল ধরে না। বার বৎসরে তাল-গাছে ফল ধরে। তাই একটি প্রবাদে বলা হল—

তাল যদি হল কাত, বার বছর দেখে এক রাত।

তাল কিভাবে পড়ে তারও হদিস রয়েছে একটি প্রবাদে—

তাল বাড়ে ঝোপে, খেঁজুর বাড়ে কোপে।

তাল যতই ঘষা যায়, নতই তার মিষ্ট গন্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ লেবুর ক্ষেত্রে ঘষলে তা তেতো হয়ে যায়। লেবুর তুলনায় তালের এই বৈপরীত্য তাই একটি প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে—

তাল ঘষলে গন্ধ মিঠা, লেবু ঘষলে হয় তিতা।

তাল এমনিতেই খুব মিষ্টি, তার ওপর যদি অকালের ফল হয়, তাহলে ত কথাই নেই, কারণ তাহলে তার মিষ্টত্ব আরও বৃদ্ধি পায়—

অকালের তাল বড় মিষ্টি।

তাল সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিশেষ ফলটির প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দা করা হয়েছে।

তেঁতুল ও মাদারের মত তাল বিশেষত ভিটার পক্ষে অনিষ্টকারক, কারণ সূর্যালোক সুষ্ঠুভাবে আসতে না পারায় ভিটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে—

তাল তেঁতুল মাদার, তিনে দেখায় আঁধার।

বাস্তভিটা নির্মূল করার ক্ষেত্রে যেসব গাছকে দায়ী করা হয়েছে, তন্মধ্যে তাল-বৃক্ষও অন্যতম—

তাল তেঁতুল কুল, তিনে বাস্তু নির্মূল।

শরীরের পক্ষেও তাল যে খুব আদর্শ ফল নয়, তার প্রমাণ এই প্রবাদটি—

তাল তেঁতুল দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই।

নিরীহ এবং ভালমানুষের পক্ষে, বিশেষত মহিলাদের পক্ষে যেসব গাছ সামলানো কঠিন, তার মধ্যে তাল গাছও পড়ে—

তাল তেঁতুল বাবলা, কি করবে ত্বধুমুখী একলা।

একটি প্রবাদে বিশেষ করে তাল গাছ অধ্যুষিত অঞ্চলের উল্লেখ করা হয়েছে—

তাল বাবলা ছুঁচো পোঁচা—এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

এমন অনেক মানুষ আছে যারা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কিছু বর্ণনা করতে অক্ষম। সব সময়ে সব কিছুকে বহুলাংশে বাড়িয়ে বলা এদের প্রকৃতি। এদেরই উদ্দেশে বলা হয়েছে—

হয় যদি তিলটা, কয় তবে তালটা।

গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে নানারকমের ফল পাওয়া যায়। এই সময়ে লভ্য ফলগুলির মধ্যে অন্যতম হল তরমুজ। তরমুজের দেহের তুলনায় তার বোঁটাটি বড়ই ক্ষুদ্র। অনেক সময়ই অন্যান্য ফলের মত নিছক বোঁটাটির মাধ্যমে বৃহদাকৃতির তরমুজ ধরা যায় না। তরমুজ সংক্রান্ত একটি প্রবাদে এই বিষয়-টিকেই প্রকাশ করা হয়েছে—

হায় তরমুজ করব কি, বোঁটা নেই ত ধরব কি।

Logic-এ যাকে বলে bad analogy, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময়েই এই ধরণের ভ্রান্ত তুলনার আশ্রয় নিয়ে থাকি। একটি প্রসঙ্গে এরই সমালোচনা করে বলা হয়েছে—

আমড়ায় আর আমে, জামরুলে আর জামে।

নারকেলের মতই আর একটি কঠিন ফল হল বেল। যদিও বেল নারকেলের তুলনায় ছোট, তবু এই ফলটির ক্ষেত্রেও শাঁস থাকে কঠিন আবরণের মধ্যে।

নারকেলের শস্য যেমন বানরে খেতে পারে না, তেমনি বেলের শাঁস কাকের নাগালের বাইরের বস্তু। একটি প্রবাদে তাই বলা হল—

বেল পাকলে কাকের কি, ঠোকরালে আর পাবে কি।

এক্ষেত্রে ব্যঙ্গটি হল যা মানুষের নাগালের বাইরে, তা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায় না।

ক্ষুদ্রকে কখনও অবহেলা করতে নেই। কারণ বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়েই সৃষ্টি হয় সমুদ্রের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা দিয়েই তৈরী হয় মরুভূমি। একটি প্রবাদে এই রকমই প্রায় এক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—রাই কুড়িয়ে বেল।

প্রবাদটিতে অবশ্য সীমিত সঙ্গতির অধিকারী মানুষের অল্প অল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যে পৌছানকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানুষ সচরাচর নিজের ত্রুটির বেলায় উদাসীন থাকে, কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটিও অনেক বেশি বড় করে দেখা হয়ে থাকে। একটি প্রবাদে এই মানসিকতার সমালোচনা স্থান পেয়েছে—

পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে।

নির্গুণ অথচ রমণীয় কান্তির মানুষকে তুলনা করা হয় শিমুল ফুল কিংবা মাকাল ফলের সঙ্গে। মাকাল ফল হয় এক ধরণের লতায়। এটি দেখতে গোলাকৃতি এবং রক্তিম বর্ণের, কিন্তু এই ফলের ভেতরটা কালো, শুধু তাই নয় তা দুর্গন্ধ-যুক্ত। মাকাল ফলের সঙ্গে গুণহীন অথচ লোভনীয় চেহারার মানুষের তুলনার কারণটির সন্ধান পাওয়া যাবে একটি প্রবাদে—

মাকাল ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো।

অন্য একটি প্রবাদেও মাকাল ফলের বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত—

বাইরে গোরা ভেতরে কালো,
মাকাল ফলকে চিনলাম ভালো।

গাব, আম-কাঁঠালের মত সম্মানিত ফল না হলেও প্রবাদে কিন্তু এ হেন অন্ত্যজ ফলও স্থান পেয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না খাব কি, গাবের মতন আছে কি॥

যখন কোন লোক কোন কাজে বিপদে পড়ে, তখন সে বিপদের কারণ ও ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে বিপদ মুক্ত

হলে, তার পূর্ব অবস্থার কথা মনেই থাকে না, আবার সেই কাজ করার পক্ষে দৃঢ় যুক্তি দেখায়।

এখানে 'আর' শব্দটি লক্ষণীয়।

কোন লোকের গাব খাওয়ার সময় গাবের বিচি গলায় আটকে যাওয়া বা অন্ত কোন দুর্দশায় পড়া ও বিপদ মুক্ত হওয়ার পরবর্তী ঘটনাই এই প্রবাদ বাক্যের মূল।

কুল অতি ক্ষুদ্রাকৃতির এক ফল। কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ হেন কুল নিয়েও রচিত হয়েছে প্রবাদ। নতুন কুল যে মিষ্টি হয় না সেই কথা বলা হয়েছে একটি প্রবাদে—

নূতন মুহুরীর ঠিকে ভুল, মিষ্টি হয় না নূতন কুল।

নব নিযুক্ত ব্যক্তির কাজ যে আশানুরূপ হয় না, কিছুটা ত্রুটি থেকেই যায়, প্রবাদটির মাধ্যমে সেই কথা বলা হয়েছে।

কুল যতই মুখরোচক ফল হোক, তবু খালি পেটে কুল খাওয়া যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, একটি প্রবাদ থেকে সেই তথ্যটি জানা যায়—

শুধু পেটে কুল, ভরা পেটে মূল।

শূন্য পেটে যেমন কুল খাওয়া খারাপ, তেমনি ভরপেটে খেতে নেই বেল।

খালি পেটে বদরিকা, ভরা পেটে বেল
কবিরাজ দেখে বলে—এই রোগী ত গেল॥

অন্য একটি প্রবাদেও একই তথ্য প্রকাশিত—

অভুক্তা বড়ই, ভুক্তা বেল ডাক বলে পরাণ গেল।

কুল যে খালিপেটে খাওয়া অনিষ্টকারক, অন্য একটি প্রবাদেও তা বলা হয়েছে—

খালি পেটে খাবে কুল, ভরা পেটে খাবে মূল।

কুল যে পাড়ে তার কপালে জোটে না। কারণ কুল পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গাছতলায় অপেক্ষমান যারা তারা সংগ্রহ করে নেয়। তাই যে কুলপাড়ে তার পরিশ্রমই সার হয়—

কুল পাড়ে পরে পায়, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে যায়।

পরিশ্রমের ফল যখন অন্যে ভোগ করে তখন এই প্রবাদ হয় প্রযোজ্য। কুল সম্পর্কে যতই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হোক, তবু কুলগাছ থাকলে আর তাতে যদি কুল ফলে থাকে, তবে অনেকেই সময়ে-অসময়ে তাতে নাড়া দিয়ে দু'চারটি কুল সংগ্রহের চেষ্টা করে।

কুল গাছ থাকলে অনেকে নাড়া দেয়।

অর্থাৎ লোভনীয় কিছুর অধিকারী যে, তার কাছ থেকে কিছু আদায়ের চেষ্টা অনেকেই করে থাকে।

কুল যদি মিষ্টি হয়, তবে সেক্ষেত্রে মানুষ আর তার লোভ সংবরণ করতে পারেনা, আঁটিশুদ্ধ কুল গলাধঃকরণ করে—

মিঠে কুল পেলে আঁটি শুদ্ধ গেলে।

কুলকে পথের বালাই বলে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কুল কলাই পথের বালাই।

কুল সংক্রান্ত আর দুটি প্রবাদ—

ক. কুল ত নয়, কুলের আঁটি, নরম নয় দাঁতে কাটি।

খ. কুল আর জল, নীচে করে স্থল।

অতএব আকৃতিতে ছোট হলেও কুল প্রবাদ রাজ্যের অনেকটা জায়গাই অধিকার করে নিয়েছে।

বিশেষ ফলকে বাদ দিয়ে নির্বিশেষ ভাবেও ফল নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে। বৃদ্ধ মানুষ যে রুক্ষ স্বভাবের হয়ে ওঠে, একটি প্রবাদে তার ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—

ফল পাকলে মিঠা, মানুষ পাকলে তিতা।

ফলের বোঁটা গাছ থেকে খসে পড়বে অথচ গাছে ফলটি থেকে যাবে, এমনটা কোনমতেই সম্ভব নয়। এই বক্তব্যকে উপলক্ষ্য রূপে ব্যবহার করে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ভক্ত বড়ো ভক্তি করে, গুরু রইলো বসে,
গাছের ফল গাছে রইলো, বোঁটা গেল খসে।

আসলে এক্ষেত্রে বলতে চাওয়া হয়েছে সেইসব লোভী গুরুদের কথা, যাঁরা শিষ্যদের আপাত ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে, তাদের কাছ থেকে বহুকিছু লাভের আশায় অপেক্ষা করে থাকেন, অথচ কখনই এদের আশা আর পূরণ হয় না।

শরীরের পক্ষে ফল যে অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রবাদে সে সম্পর্কেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—

বার মাসে বার ফল
না খেলে যায় রসাতল।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এক এক সময়ে এক এক ধরণের ফল ফলে,

শুধু উপাদেয় বলেই নয়, স্বাস্থ্যের কারণেই এইসব সময়োপযোগী ফল আহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

প্রবাদে যে সব ফল স্থান পেয়েছে তাদের সংখ্যা যেমন বেশ উল্লেখযোগ্য, তেমনি যে সব ফল স্থান পায়নি তাদের সংখ্যাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তালশাঁস, লিচু, পেয়ারা, গোলাপজাম, ফলসা, টেঁপারি, শাঁকালু এবং এই ধরণের আরও অনেক ফলই প্রবাদ বাক্যে অনুপস্থিত। তবু বাংলা প্রবাদের বৈচিত্র্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ফল কেন্দ্রিক প্রবাদগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলা প্রবাদে পাখ পাখালী

বাংলা প্রবাদের বিষয় বৈচিত্র্যে অন্যান্য নানা উপাদানের সঙ্গে পাখীরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বেশ কিছু প্রবাদে পাখী উপলক্ষ্য রূপে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে যেমন ফলের বৈচিত্র্য, ফুলের বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্য তেমনি এখানকার পাখীতেও। টিয়া, চন্দনা, দোয়েল, বউকথা কও, মাছরাঙ্গা, কোকিল, ছাতারে, তিতির, ময়না, শালিক, চড়াই, টুনটুনি, তোতা, ঘুঘু এবং আরও কতই না পাখী গ্রামবাংলার নানাস্থানেই দৃষ্ট হয়ে থাকে। এইসব পাখীদের কোনটির বা রঙের বাহার, কোনটির আবার কথা বলার অপূর্ব দক্ষতা। বাংলা প্রবাদে বাংলাদেশের অসংখ্য পাখীদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পাখীই স্থান পেয়েছে, আর যেসব পাখী স্থান পেয়েছে তাদের রূপ অথবা কণ্ঠস্বর সম্পর্কিত কোন বৈশিষ্ট্যের কথা তেমন উল্লিখিত হয়নি। সাধারণভাবে প্রবাদের যা লক্ষ্য—মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং মানব চরিত্রের সমালোচনা—পাখী সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতেও সেই লক্ষ্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই পাখী বিশেষের উল্লেখ থাকলেও স্মরণ রাখতে হবে যে এই পাখী, বিশেষ কোন বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম রূপেই গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়। কোন কোন প্রবাদে পাখীবিশেষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও উল্লিখিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।



পাখীসংক্রান্ত প্রবাদগুলির মধ্যে সিংহভাগ অধিকার করে আছে কাক। কাক আমাদের অতি পরিচিত। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কাক আমাদের অনেক উপকার করে। নানা আবর্জনা কাক ভক্ষণ করে। তবু কাকের সংখ্যাধিক্য, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রূপ, কর্কশ কণ্ঠস্বর

আর তার ছোঁ মেরে খাওয়ার স্বভাবের জন্য সে আমাদের কাছে অনাদৃত। কাকসংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে কাকের প্রশংসা কোথাও করা হয়নি। সর্বত্রই তার বিরূপ সমালোচনা। কাকের মত চড়াইও আমাদের বহুল পরিচিত। কিন্তু কাকের তুলনায় চড়াই সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। অতএব বহুল পরিচিত পাখীরাই বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছে, কিংবা পরিচিতি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ পাখীকে নিয়ে রচিত প্রবাদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে এরকম ভাবা যথার্থ হবে না। পাখী বিশেষকে নিয়ে যেমন প্রবাদ রচিত হয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে পাখী সংক্রান্ত প্রবাদও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তুলনামূলকভাবে শেষোক্ত ধরণের প্রবাদের সংখ্যা খুবই কম।

পাখী যে ক্ষীণজীবী, সামান্য আঘাত কিংবা প্রতিকূলতাতেই যে তার মৃত্যু ঘটে একটি প্রবাদে তা বলা হয়েছে—

পাখীর প্রাণ অল্পেই যান্।

এক্ষেত্রেও পাখী উপলক্ষ্য, লক্ষ্য কিন্তু ক্ষীণজীবী মানুষ।
পাখীর প্রতি আমাদের যতই দুর্বলতা থাকুক আর তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতটা কেন চেষ্টা করা হোক, তবু পাখীর মন পড়ে থাকে বনে, সর্বদাই তার মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা। একটি প্রবাদে সুন্দর করে বলা হয়েছে—

খায় দায় পাখীটি, বনের পানে আঁখিটি।

কিংবা, উড়ো পাখীকে পোষ মানানো।

আর একটি প্রবাদে জঙলা পাখীর আনুগত্যহীনতার কথা বর্ণিত হয়েছে—

জঙ্গলা কভু পোষ না মানে, মন সদা তার কেওড়া বনে।

যে মানুষ সহজে বাঁধাধরা জীবনকে স্বীকার করে নেয় না, কিংবা যার স্থিতিতে তেমন আকর্ষণ নেই তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে প্রবাদটিতে। অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

জঙলা পাখীর ডিমও লাভ।

অর্থাৎ যার কাছ থেকে কিছু পাবার আশা থাকে না, তার কাছ থেকে যৎসামান্য যা কিছু পাওয়া যাক না কেন, তাই আশাতিরিক্ত হয়। একটি মাত্র প্রয়াসে মানুষ যখন দুটি কার্য সিদ্ধির অধিকারী হয়, তখন বলা হয়,

এক ঢিলে দুই পাখী।

প্রবাদটির বাচ্যার্থ হল একটি ঢিলে এক সঙ্গে দুটি পাখীকে মারা।

দুই বিপরীত মানসিকতার মধ্যে সচরাচর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, যদি তা কখনও বাস্তবায়িত হয়, তবে সেক্ষেত্রে বলা হয়—

এক ডালে দুই পাখী, গায়ে গায়ে মেশামেশি।

একসঙ্গে একাধিক কার্য সম্পাদন অবিধেয়, কারণ তাতে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। এই সম্পর্কিত উপদেশটি প্রদত্ত হয়েছে একটি প্রবাদে এইভাবে—

পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।

রাত্রির অবসানে দিবালোকের আত্মপ্রকাশই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে প্রভাতী পাখীর কল-কাকলিরও একটা ভূমিকা থাকে। যাত্রা সম্পর্কিত একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা,
সেই জানিবে আসল উষা॥

অর্থাৎ পাখী যখন তার বাসায় অবস্থান করে কলরব করতে থাকে, তখনই হল প্রকৃত উষা, আর এই সময়েই যাত্রা করা বিধেয়। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, যখন মানুষকে সাধারণত এক স্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে হাঁটার ওপরেই নির্ভর করতে হত, সেই সময়েই প্রবাদটি রচিত।

পাখীর মুখের কথা শুনতে আমাদের অনেকেরই বিশেষ বাসনা থাকে, আর তাই অক্লান্ত প্রয়াসে পাখীকে নানা বুলি শেখান হয়। এইজন্যই বলা হয়—

পাখী পড়ার মত শেখান।

বলাবাহুল্য প্রবাদটি মানুষের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যেখানে অনেক পরিশ্রম করে একই বিষয় শিক্ষার্থীকে বারংবার শেখান হয়, সেখানেই প্রযুক্ত হয় প্রবাদটি।

পাখীর আহার্যের পরিমাণ খুবই কম। তাই যে ব্যক্তি স্বল্পাহারী তার প্রসঙ্গে বলা হয়—

পাখীর মত খাওয়া।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নানা কারণেই, তন্মধ্যে একটি হল উড়ন্ত পাখীর পাখার সংখ্যা গণনায় তার পটুত্ব।

মানুষ বড় সহজ নয়, ওড়া পাখীর পাখা গুণে কয়।

প্রায় অনুরূপ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আর একটি প্রবাদে—

উড়ে যায় পাখী তার ডানা গুণে রাখি।

স্বভাবশঠতা বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

আদা আর কাঁচকলা, পাখী আর সাভনলা।

পাখী সংক্রান্ত আর কয়েকটি প্রবাদ হল—

ক. ওই আকাশে ওড়ে, পাখীতে খায় ধরে।

খ. হাতের ডিম ফেলে ঝাড়ের পাখী।

গ. মানুষ নয় পক্ষী, পেটের দায়ে দুঃখী।

এইবার কাক সংক্রান্ত প্রবাদগুলির সন্ধান নেওয়া যেতে পারে।

কাক এবং কোকিল—এই দুটি পাখীই কৃষ্ণবর্ণের অথচ কণ্ঠস্বরে উভয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য। কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের তুলনায় কাকের কর্কশ স্বর বড়ই পীড়াদায়ক। তাইতো একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।

মানুষের অসম্ভব প্রয়াসকে একটি প্রবাদে ব্যক্ত করে বলা হয়েছে—

কাক হলেন কোকিল পাখী শেয়াল হলেন চন্দ্রমুখী,
স্বর্গের বলি রাজা হলেন বেঙ।
বামনের হাত হতে পুচ করলেন চেঙ ॥

কিংবা, কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালে দশা ॥

কেউ যখন তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণের পরিবর্তে ভিন্নতর আচরণ করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তখন বলা হয়—

কাকের মুখে কোকিলের রা।

কাকের সর্বদা চুরি করে খাওয়া অভ্যাস। সেই কাক যদি পরম বৈষ্ণব হয়ে গলায় তুলসীমালা পরে পরম ভক্তে পরিণত হয়, তাহলে তা বাস্তবিকই বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে ওঠে। কারণ কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে'। অতএব সেই স্বভাব যদি কাক পরিবর্তন করে তাহলে তা নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্যের বিষয় বলে পরিগণিত হবে—

একি বিধির লীলা খেলা
কাকের গলায় তুলসী মালা।

আর একটি প্রবাদে একই বক্তব্য আরও সহজ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

কাক এক বিচিত্র প্রাণী। সে সকলের মাংস খায় কিন্তু মৃত কাকের মাংস অন্য কোন প্রাণী খেলে তার সহ্য হয় না। তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে তখন

দলবদ্ধ হয়ে। আর তাইতো কাকের মাংস কেউ খায় না। একটি প্রবাদেও বলা হয়েছে—

কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না।

যে ব্যক্তি সকলের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে কিন্তু অন্য কেউ তার কাছ থেকে সামান্যতম সুবিধাও পায় না, তার ক্ষেত্রেই এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

কাক সংক্রান্ত একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হল—

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।

মূল অর্থ হল—লোভনীয় বস্তুর বিনিময়ে অনায়াসে অনেককেই আকৃষ্ট করা যায়। অনুরূপ আর একটি জনপ্রিয় প্রবাদ—

বেল পাকলে কাকের কি, ঠোকরালে আর পাবে কি।

অর্থাৎ কিনা যা নাগালের বাইরে, সাধ্যের অতীত, তার ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন।

কোকিল নিজে বাসা তৈরী করে না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে আর কাক সেই ডিম নিজের মনে করে তা দিয়ে তা থেকে বাচ্চা ফুটোয়। তারপর সেই বাচ্চা একটু বড় হয়ে ওড়বার ক্ষমতার অধিকারী হলেই উড়ে পালায়। বেচারী কাকের খাটুনিই সার। চতুর কোকিল নির্বোধ কাককে এইভাবে খাটিয়ে নেয়। তাই কাক সম্পর্কে যতই ধূর্ততার কথা বলা হোক,—

'কাক মনে করে আমি বড় সেয়ানা' তবু শেষ পর্যন্ত সে যে চরম নির্বোধ তাতে সন্দেহ নেই। একটি প্রবাদে কাকের এই নির্বুদ্ধিতার কথাও স্থান পেয়েছে—

কাকের বাসায় কোকিল হল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল।

'বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা'র মত 'কাকের মুখে সিঁদুরে আম' প্রবাদটিও প্রচলিত আছে।

কাকের ছোঁ মারা প্রবৃত্তি একটি প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে—

ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে।

এক্ষেত্রে লোভনীয় বস্তু অনায়াস লভ্য বা সহজ লভ্য হলে, তার প্রতি যে সকলেরই আকর্ষণ জন্মে—সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

চরম ক্ষতিগ্রস্তের যে আর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না, সেই সত্য বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মরা কাকের আবার মড়কের ভয়।

পাখীদের রাজত্বে কাক যে কতখানি অবহেলিত, বেশ কয়েকটি প্রবাদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই ধরণের প্রবাদে কাককে উপলক্ষ্য করে সমালোচনা করা হয়েছে—দুর্লভ বা মূল্যবান বস্তুকে অবজ্ঞা করে অতি সাধারণ বস্তুকে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দেওয়ার অর্থহীন আচরণকে—

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষে কাক।

কিংবা, সোনার দাঁড়ে কাক বসানো।

একের দোষের কারণে অন্যের শাস্তিভোগ সমাজে প্রায়ই ঘটে থাকে। এই অবিচারকেই সূত্র করে তোলা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটিতে—

ধান খায় কাকে, বেঙের পায়ে দড়ি।

'মশা মারতে কামান দাগা'র মত আর একটি প্রবাদ রচিত হয়েছে কাককে নিয়ে—

কাকের উপর কামানের চোট।

এখানেও সামান্য কারণে নিযুক্ত অসামান্য প্রয়াসকে সমালোচনা করা হয়েছে। অন্যের কথায় ভেজা বা প্ররোচিত হওয়া বেশ কিছু কান-পাতলা লোকের স্বভাব। এইসব মানুষকে নিয়েই বলা হয়েছে—

কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান।

অনেক সময়ই আমাদের আশানুরূপ ফললাভ ঘটে না। বিদ্বান ব্যক্তির ছেলে বিদ্বান হবে এটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে পণ্ডিতের ছেলেকে মূর্খ হতেও দেখা যায়। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত প্রবাদটি হল—

কাকের ডিম সাদা হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়।

একটি প্রবাদে কাকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হতে দেখা গেছে—

কাকের মাংস কাকে খায় না।

কাকের ডাকেই সকাল হয়। কাকের চীৎকারে মানুষের ঘুম ভাঙে। কিন্তু তাই বলে রাত পোহানোর সঙ্গে কাকের কোন যে সম্পর্ক নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

যে দেশে কাক নেই, সে দেশে কি রাত পোহায় না।

আপাতদৃষ্টিতে অপরিহার্য বলে যাকে মনে হয়, তাকে ছাড়াও কিন্তু সংসার দিব্বি চলে, সেই সত্যই প্রবাদটিতে প্রতিফলিত।

সামান্য জিনিসকে নিয়ে বহু সংখ্যক মানুষ যদি মাথা ঘামায় কিংবা সেই বস্তুটি লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, তবে ব্যাপারটি খুব শোভন হয় না, আর এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় যে প্রবাদটি, সেটি হল—

আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল।

ধূর্ততায় কাক অদ্বিতীয়, প্রবাদে তার ধূর্ততার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে নাপিতের ধূর্ততার—

মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখীর মধ্যে কাওয়া।

অন্য একটি প্রবাদেও বলা হয়েছে—

কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত।

দুটি ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে ভেদজ্ঞান বোঝাতে বলা হয়—

কাক কঁাকুড় জ্ঞান।

অযৌক্তিক আচরণকে ব্যঙ্গ করতে বলা হয়—

কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার।

উচ্ছৃঙ্খলভাবে এখানে এক খাবলা, ওখানে এক খাবলা—এইভাবে যে খাওয়া তাকে সমালোচনা করা হয়েছে প্রবাদে। বলা হয়েছে—

কাগা বগা করে খাওয়া।

কাককে যদিও বলা হয় ঝাড়ুদার পাখী, আমাদের নানা উপকারে সে প্রবৃত্ত, নানা আবর্জনা সে পরিষ্কার করে দেয়, তবু তাই বলে কাকের প্রতি সোহাগ বশতঃ কেউ ভাত রাখে না। উদ্বৃত্ত ভাত যা ফেলে দেওয়া হয়, তাই-ই হল কাকের ভাত। প্রবাদে একে বলা হয়েছে—

কাকের ভাত রাখা।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে কৃত কোন কাজ করা উপলক্ষ্যে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাক সম্পর্কিত একটি প্রবাদে অসৎ চরিত্রের নারী সমালোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, রাত্রে নদীপার হয়।

কাক সংক্রান্ত অপর কয়েকটি প্রবাদ হল—

ক. শহুরে কাক বড় চালাক।

খ. শাওন মাসের ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে।

গ. কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে।

ঘ. কাক এলে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।

ঙ. কাকের ছা বকের ছা।

চ. কাকের পিছে ফিঙে লাগা।

ছ. কপালে থাকলে গু কাকে এনে দেয়।

জ. কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা।

ঝ. গাছে বসে কাক হাসে, বলে—দেখেনি।

কাকের পরেই কোকিলের প্রসঙ্গ। পাখীর রাজ্যে কোকিল হল তানসেন পাখী। কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাকে পাখীর রাজ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কোকিল সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, কাকের মত নয়। সীমিত সংখ্যক প্রবাদে কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আর তার চতুরতার সঙ্গে কাকের বাসায় বাচ্চা প্রতিপালিত করিয়ে নেবার কৌশলের কথাই স্থান পেয়েছে। গান গাওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও বৃথা গান করার চেষ্টাকে একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশে বলা হয়েছে—

কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া।

অপর একটি প্রবাদে অন্যের গুণে অক্ষমের হিংসাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে—

রাজসভা দেখলে পরে কোঁচ বাগ্‌লো চরে।
কোকিলের ধ্বনি শুনে পেচা ডেকে মরে॥

অন্যের বিরল ক্ষমতা কিংবা দুর্লভ গুণের প্রশংসা করা দূরে থাক, তা নিয়ে ব্যঙ্গ করে মানুষ যখন তার গুণগ্রাহিতার পরিচয় রাখতে ব্যর্থ হয়, তখন বলা হয়—

কোকিলের রব শুনে পেঁচার হল হাসি।
ঘুরঘুরে বলে আমি উলটে দেব ফাঁসি॥

এইবার কোকিল যে নিজে বাসা করে না, কাকের বাসাতেই ডিম পাড়ে এবং কাককে দিয়ে তার শাবক প্রতিপালন করিয়ে নেয় সেই সংক্রান্ত প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে—

ক. কোকিলের বউ ছেলে ধরতে জানে না।

খ. কোকিল করয়ে বাস কাকে করে বাসা।

কাকতালীয় ঘটনায় কোন চতুর ব্যক্তির সুনাম বৃদ্ধির প্রয়াস যুক্ত হলে বলা হয়—

কাক মরে ঝড়ে, কোকিলের কেরামতি বাড়ে।

মহার্ঘ বস্তুকে অবহেলা করার মূঢ়তাকে সমালোচনা করতে গিয়েও কোকিলের প্রসঙ্গ এসেছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ।
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বানরের নাট॥

শালিক বাংলাদেশের এক বহুল পরিচিত পাখী। শালিকের কণ্ঠস্বর কিন্তু কোকিলের মত মিষ্ট নয়। একটি প্রবাদে শালিকের সেই কর্কশ স্বরের কথা বলা হয়েছে—

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন॥

উদ্ধৃত প্রবাদটির মূল প্রসঙ্গ অবশ্য বউ। উপমান হিসেবে শালিকের প্রসঙ্গ এসেছে মাত্র। বউ সম্পর্কে আমাদের সমাজে সাধারণভাবে এক বিরূপ মানসিকতা প্রচলিত আছে। অবশ্যই এই মানসিকতা ননদ, শাশুড়ীর। বাড়ীর বউয়ের প্রতি এঁরা সাধারণত প্রসন্ন হন না। তাই নানা কারণে-অকারণে বাড়ীর বউকে হেনস্তা কিংবা অপদস্থ করতে এদের প্রবল উৎসাহ। আলোচ্য প্রবাদটিতেও দেখা যায় বউয়ের চলনকে তুর্কী ঘোড়ার চলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাতেই শেষ নয়, বউয়ের গলার স্বরও যে কতখানি পীড়াদায়ক তা বোঝাতে সেই কণ্ঠস্বরকে শালিক পাখির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শালিক খুব পোষ মানে তবে তা বাচ্চা বেলায়। বড় হয়ে গেলে তা আর সহজে আনুগত্য স্বীকার করে না। একটি প্রবাদে তাই বলা হল—

বুড়ো শালিক পোষ মানে না।

আসলে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলে মানুষ যত সহজে অনুগত হয়, বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেই আনুগত্য যে সহজে লাভ করা যায় না, সেই সত্যটিই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

শুধু আনুগত্যই বা কেন, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ছেলেবেলাতেই শেখাতে হয়। কারণ তখন তা গ্রহণের ক্ষমতা যেমন থাকে, তেমনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্তেও এসে যায়। পরিণত বয়সে সে তুলনায় কিছু শেখা বড়ই কঠিন। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

বুড়ো শালিকের রাম-নাম শেখানো।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি বহুল পরিচিত প্রবাদের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়—

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

দুষ্ট বৃদ্ধকে কিছু শেখানো যে অর্থহীন তারই ইঙ্গিত রয়েছে এই প্রবাদটিতে। শালিক সংক্রান্ত আর দুটি প্রবাদ—

ক. শুক মলো মুখের দোষে, শালিক মলো সেই তরাসে।

খ. বুড়োর মাথায় শালিক নাচে, আর কি বুড়োর বয়স আছে।

শকুনির মৃত জীবজন্তুর প্রতি বড় লোভ। তাই তার প্রিয় স্থান হল ভাগাড়, যেখানে মৃত জীবজন্তু ফেলা হয়। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—

যেখানে মড়া সেখানে শকুনি।

শকুনি যেহেতু তার খাদ্যদ্রব্য ভাগাড় থেকে সংগ্রহ করে, তাই ভাগাড়ে ছাড়া অন্যত্র তার দৃষ্টি থাকে না। অন্যত্র তার যাতায়াতও বিরল। তাইতো বলা হয়েছে—

গো ভাগাড়েই শকুনি পড়ে।

শকুনি কেউ মারে না। কারণ প্রকারান্তরে মৃত জীবজন্তু ভক্ষণ করে শকুনি আমাদের উপকারই করে—

উকুন মারি, শকুন মারি না।

তাই বলে শখ করে কেউ শকুনি পোষেও না। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।

অর্থাৎ কিনা শকুনির যেহেতু গো মাংসে বড় লোভ, তাই শকুনি পুষলে তার নজরে গরুর মৃত্যু ঘটে। আসলে এটি একটি সংস্কার। যার যে বিষয়ে লোভ, সে যদি সেই লোভনীয় বস্তুলাভে বঞ্চিত থাকে, তাহলে স্বভাবতই তার সেই বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে। পরিণামে নাকি সেই লোভনীয় বস্তুর অধিকারী তা হারায়।

শকুনি সংক্রান্ত একটি সংস্কার হল যে মৃত্যুর প্রতীক সে। শকুনি ওড়ার অর্থ হল মৃত্যু আসন্ন। তাই শকুনি ওড়াকে অশুভ সঙ্কেত বলে গণ্য করা হয়। বলা হয় শকুনি আগে থেকেই মৃত্যু যে আসন্ন তা বুঝতে পারে। এই সংক্রান্ত প্রবাদটি হল—

মাথার ওপরে শকুনি ওড়া।

শকুনি সংক্রান্ত একটি বড় প্রবাদ হল—

বড় করলে বামন শকুনি উদোম করে ঠোঁট।
হাড়গিলেতে হাঁ করছে, চড়ুয়ের দেখ চোট॥

সেই চড়াইয়ের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল, তখন চড়াই সংক্রান্ত প্রবাদ ক'টির উল্লেখ করা যেতে পারে। চড়াইকে প্রবাদে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জীব বলে বলা হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

চড়ুইয়ের পেটে জন্মাবে নর, দেবতা হবে বনের বানর।

সামান্য চড়াইয়ের পেটে মানুষের জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব, কিন্তু তবু সেই অসম্ভব ব্যাপারই যদি সম্ভব হয়, তাহলে স্বর্গের দেবতাও বনের বানর রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পাবেন।

চড়াইয়ের অন্যতম বাসস্থান হল চণ্ডীমণ্ডপ। সামান্য চড়াই যে বৃহৎ স্থানের বাসিন্দা—এই অসঙ্গতি একটি প্রবাদের বিষয় রূপে ধরা দিয়েছে—

চার কড়ার চড়ুই চণ্ডীমণ্ডপে বাস।

সামান্য ব্যক্তির যদি অসামান্য প্রযাস লক্ষিত হয়, তখনই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

চড়াই পাখী হলেও কেউ একে পোষে না। কারণ প্রথমতঃ এর সৌন্দর্যের কোন বালাই নেই। আর দ্বিতীয়ত চড়াই সুলভও বটে। সাধারণত যা দুর্লভ, তার প্রতিই মানুষের আগ্রহ অধিক হয়। সর্বোপরি, চড়াইয়ের মাংস মানুষ ভক্ষণও করে না। তাই একটি প্রবাদ রচিত হয়েছে—

পাকমারার ঘরে চড়ুইয়ের বাসা।

'পাকমারা'র অর্থ পাখী মারে যে। এরকম লোকের বাড়িতেও চড়াই দিব্বি নিশ্চিন্তে বাস করে। কারণ তার কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

যার যা ক্ষমতা নেই, অপরের দেখে যদি সেই ক্ষমতা জাহির করতে যায় তাহলে তা এক হাস্যকর প্রয়াসরূপেই পরিগণিত হয়। এই বিষয়টিই ব্যক্ত হয়েছে একটি প্রবাদে—

খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ।

প্রবাদের রাজ্যে যে পাখী চরম দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, সে হল কাদাখোঁচা।

পাখীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।

বাংলাদেশে অন্যান্য নানা পাখীর মধ্যে চিলও আছে, একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

শঙ্খচিলের ঘটিবাটি, গোদাচিলের মুখে লাথি।

শঙ্খচিল আমাদের সমাজে শুভসূচক, কিন্তু গোদা চিল অশুভের প্রতীক, তাই তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে।

সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরার কথা যেমন হয়, তেমনি সব চিল উড়ে গেলেও বেঁড়ে চিলের ধরা পড়ার কথা একটি প্রবাদ থেকে জানা যায়—

যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়ল।

চিলের প্রয়াস সহজে ব্যর্থ হবার নয়, পুরো সাফল্যের অধিকারী না হোক কিছু সাফল্য সে জোর করেই ছিনিয়ে নেবে—

চিলটা পড়লে কুটোটা নিয়ে ওঠে।

যে মানুষের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত না হোক আংশিক ভাবেও সাফল্যমণ্ডিত হয়, অর্থাৎ সাফল্যের মুখ না দেখে যে ব্যক্তি ছাড়েনা, তার প্রসঙ্গেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'র মত 'বিলের মধ্যে চিলের বাসা'র কথাও প্রবাদে বলা হয়েছে। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ--

উড়ে এল চিল, জুড়ে বসল বিল।

চিলের প্রসঙ্গে মাছ অনুল্লিখিত থাকতে পারে না, কারণ চিল মৎস্য-বিলাসী। সুযোগ পেলেই সে মৎস্য শিকার করে আর তারই ফলশ্রুতিতে আমরা পাই এই প্রবাদটি—

চিলের মুখে মাছ।

চিল সংক্রান্ত আর দুটি প্রবাদ—

ক. চিলের ডরে বিলে গেলাম, বিলে মাছরাঙাকে পেলাম।

খ. আকাশে গুড়গুড়ে পাখী, উড়লেই চিল হয় নাকি।

বাংলা লোককথায় টুনটুনি পাখির বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু সে তুলনায় বাংলা প্রবাদে বেচারী বড়ই অবহেলিত। একটি প্রবাদে টুনটুনির স্থান হয়েছে, তাও তার ক্ষুদ্রতাকেই বড় করে দেখান হয়েছে—

টুনটুনির হয় না গরুড়ের পাখা।

ক্ষুদ্র চেষ্টা করেও যে বৃহৎ হতে পারে না, তারই ইঙ্গিত রয়েছে প্রবাদটিতে। একটি প্রবাদে বেশি কথা বলে এমন যে ছেলে, তার সঙ্গে তোতাপাখীর তুলনা করা হয়েছে—

ছেলে আমার তোতাপাখী।

কথা বলা পাখীদের অন্যতম হল ময়না। কিন্তু প্রবাদে তার এই গুণটির কথা

উল্লিখিত হয়নি। বরং ময়নার চতুরালিই প্রবাদের উপজীব্য হয়ে উঠেছে—

উত্তর থেকে এল ময়না পাখা নাড়ি নাড়ি।
ফুলগাছে বসে ময়না করে চতুরালি॥

বকের পক্ষে কোনদিনও ময়নার গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, তার যা কাজ, মাছ শিকারের জন্য অবিরাম দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে থাকা—তাছাড়া তার আর কোন গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়—

বক কি কখনো ময়না হয়, জলের দিকে চেয়ে রয়।

কয়েকটি প্রবাদে ময়নার নাম উল্লিখিত হলেও সেগুলিতে ময়নার কোন বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়নি। নিছক ছন্দের প্রয়োজনেই 'ময়না'র নামটি উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—

ক. আমার নাম ময়না, তবুও ত হয়না।
খ. ময়না, ময়না, ময়না, সতীন যেন হয়না॥

শেষোক্ত প্রবাদটিতে দীর্ঘদিনের প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সতীন-বিরোধিতা প্রকাশিত।

নৃত্যের জন্য বিখ্যাত হল ময়ূর। বোধ করি পক্ষী সাম্রাজ্যের সম্রাট সে। ময়না সংক্রান্ত আর একটি প্রবাদ—

টাকার নাম ময়নার ছা, মিছায় করে সাচার রা।

মেঘাবৃত আকাশের পটভূমিকায় পেখম তুলে তার নাচ বাস্তবিকই অনবদ্য। প্রবাদেও নৃত্যকুশল ময়ূরের গুণের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—

ময়ূরের নৃত্য দেখি, লেজনাড়া দেয় ছাতারে পাখী।

অন্য একটি প্রবাদে আবার বাংলাদেশের অপর এক পরিচিত পাখী ছাতারের প্রসঙ্গেও পরোক্ষে ময়ূরের নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি জানান হয়েছে—

ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ূর পাখী হাসে।

ছাতারের প্রসঙ্গ অপর একটি প্রবাদেও এসেছে, তবে সেখানেও তাকে বেশ ছোট করেই দেখান হয়েছে। অনেকটা সেই 'হাতী গেল রসাতল, মশা বলে কত জলে'র মত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকির পোঁদে বাতি।
ময়ূর গেল, ছাতারে এল, ফুলিয়ে বুকের ছাতি॥

'ছাতারে' কে নিয়ে রচিত অন্যান্য কয়েকটি প্রবাদ—

ক. ছাতারের মুখে ভাতারের আধা জলপান।

খ. ছাতার বলে গাঁ আমার।

গ. ছাতারে পাখী নৃত্য করে ডুমুর গাছে বসে।
কালো পেঁচা রাজা হবে, লোকে মরে হেসে॥

এবারে ঘুঘুর প্রসঙ্গ। ঘুঘুও গ্রাম বাংলার এক অতি পরিচিত পাখী। ঘুঘুর প্রসঙ্গে মনে পড়বেই সেই প্রবাদটি, যেখানে ফাঁদ এবং ঘুঘুকে প্রায় একাত্ম করে নেওয়া হয়েছে—

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

অর্থাৎ ঘুঘু যেখানে, ফাঁদও সেখানে। তাই এককে দেখলে অপরও দৃষ্টিগোচর হবে অনিবার্যভাবে। আসলে প্রবাদটির মধ্য দিয়ে লোভনীয় বস্তুর সঙ্গে বিপদও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। আবার সহজে যে ফাঁদে ধরা পড়ে না, সেই রকম চতুরকেও সেয়ানা ঘুঘুর শাবকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

সেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা।

ঘুঘুর সঙ্গে রিক্ততার সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই কল্পিত হয়ে আসছে। একটি প্রবাদে স্বভাবতঃই খড়ের চালে আগুন লাগলে পরিণাম কি হবে সেই সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে এইভাবে—

আগুনের ফুলকি
যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।

যার উপস্থিতি ভিটাতে ঘুঘু চরায় সেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়—

বাস্তু ঘুঘু।

যে ব্যক্তি উপকারীর সর্বনাশে প্রবৃত্ত, তার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

যার পরে তার খায়, তারই ভিটে ঘুঘু চরায়।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাহুল্যও যে মানুষকে নিঃস্ব করে, সেই সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে—

দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে।

ঘুঘুকে নিয়ে রচিত আর দুটি প্রবাদ—

ক. অযোধ্যার রঘু, বাঁশ বনের ঘুঘু।

খ. আমার নাম রণঘুঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু।

আমাদের পরিচিত পাখীদের অন্যতম হল পায়রা। অন্যান্য পাখীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের বাসস্থান থেকে দূরে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে পায়রা আমাদের

অতি নিকটেই অবস্থান করে, অবস্থান করে আমাদেরই গৃহে। সখ করেও অনেকে পায়রা পোষে। কিন্তু প্রবাদে এ হেন পায়রাকে মোটেই সুনজরে দেখা হয়নি। বলা হয়েছে—

পাখীর ওঁছা পায়রা, জাতের ওঁছা ময়রা।

অন্যত্র, ছেলেদের ভবিষ্যৎ মাটি করার অন্যতম কারণ হিসাবেও পায়রাকে দায়ী করা হয়েছে—

পাখ পায়রা পাঁচালী, তিনে ছেলে মজালি।

পায়রা সংক্রান্ত আর একটি প্রবাদ—

কতই না কবুতর, কতই না মন্তর।

সাধ্যের অতীত বোঝাতে একটি প্রবাদে বুলবুলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে—

বুলবুলের সাধ্য নেই বটফল গেলা।

প্রয়োজনীয় উপকরণের অধিকারী হয়েও মানুষ যখন দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়, তখন কথিত হয়—

ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।

বাবুই পাখী 'শিল্পী-পাখী' নামে সমধিক পরিচিত, আর এ শিল্প নৈপুণ্য তার নির্মিত বাসাতেই প্রতিফলিত। অথচ এ হেন বাবুইকেই বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, তার বাসা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

মানুষের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা যাই হোক, সামর্থ্য অনুযায়ীই তার সাফল্য নির্দিষ্ট। টিয়া পাখীকে নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে উক্ত হয়েছে—

ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে, যার যা আধার সে তা ধরে।

প্রবাদের রাজ্য থেকে হাঁস-মুরগীও বাদ যায়নি। রাজ হাঁসের তুলনায় বকের পা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, তাই তার অহং বোধও প্রবল—

রাজহাঁসের পা দেখে বকের নেঙা-পেঙা।
তোর পা যেমন তেমন, আমার পা ঢেঙা॥

আচারনিষ্ঠ হিন্দু, মুরগীর মাংস ভক্ষণ করেনা। কিন্তু ধর্মান্তরিত হলে তার তখন রুচিরও পরিবর্তন ঘটে, পরিণামে মুরগীর মাংস ভক্ষণে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হয়—

হিঁদু যদি মুসলমান হয়, মুরগী খেতে কম নয়।

অন্যান্য পাখীদের সঙ্গে মাছরাঙাও মাছ খায়, তবু একারণে শুধু তারই শিরে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে—

সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক।

অন্যত্র বলা হয়েছে, মাছরাঙা পাখীর কলঙ্ক যায় না।

সীমিত সামর্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ বৃহত্তর কর্মে যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে তাকে পরিহাস করে বলা হয়—

টিটির পাখী চায় গাঙ শুকাতে।

বৃহৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রে রূপান্তরিত হলে সেই হতভাগ্যকে তুগ্‌গো টুনটুনির সঙ্গে অভেদ কল্পনা করা হয়—

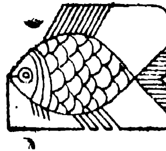
বড় পাখী ছিলেন, তুগ্‌গো টুনটুনি হলেন।

অতএব পাখী সংক্রান্ত প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন পাখীর মোটামুটি একটা পরিচয় জানতে পারি। তবে প্রথমেই যা বলা হয়েছে, এর সবশেষেও সেই একই সত্যের পুনরাবৃত্তি—পাখীর রূপকে আমাদের সামাজিক মানুষের বিভিন্ন রূপকেই চিত্রিত করা হয়েছে। যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে ফলের মাধ্যমে, কিংবা ফুল অথবা মাছের মাধ্যমে, সেই একই সত্যের প্রকাশ পাখী সংক্রান্ত প্রবাদেও, কেবল সত্য পরিবেষণের আধার পরিবর্তিত হয়েছে এইমাত্র।

বাংলা প্রবাদে মাছ

কায়েত মরে সেয়ানে, বেনে মরে দেয়ানে, জোলা মরে তাঁতে
কাঙালী বাঙালী মরে মাছে আর ভাতে॥

—বাস্তবিক, মাছ আর ভাত বাঙ্গালীর প্রধান আর প্রিয় খাদ্য। এই দুই খাদ্যোপকরণে আমাদের রসনার যে পরিমাণ পরিতৃপ্তি, এদের থেকে শতগুণ আকর্ষণীয় ও মূল্যবান আহার্যেও সেই পরিমাণ তৃপ্তি হয় না। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, সাধভক্ষণের মত সর্ববিধ শুভ ও আনন্দদায়ক সামাজিক অনুষ্ঠানে মাছ না হলেই নয়। বাড়ীতে জামাই এলে মাছের মুড়ো দিয়ে আপ্যায়নের আয়োজন কোন বাঙ্গালীর বাড়ীতে না হয়? শুধু জামাই কেন, মাননীয় ও প্রীতিভাজন যে কোন অতিথিকে মাছ দিয়ে আপ্যায়নের রীতি আমাদের। নিমন্ত্রণ বাড়ীতেও মাংস কিংবা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের তুলনায় মাছের চাহিদাই অধিক হতে দেখা যায়। মোটের ওপর, বাঙ্গালীর আনন্দের সঙ্গে মাছের এক অতি গভীর সম্পর্ক।



নেতিভাবেও আমাদের জীবনে মাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি উল্লিখিত হতে পারে। দুঃখের দিনে আমাদের আহার্য তালিকায় মাছ অনুপস্থিত থাকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত ভোজের তালিকায় মাছ থাকে না। কিংবা অশৌচ পালনের সময় নিরামিষ আহার গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রেও বাঙ্গালী হিন্দুর বাড়ীতে মাছ ঢোকে না। আবার হতভাগ্য হিন্দু রমণীর যখন বৈধব্যদশা ঘটে, তখন তার আহার্য তালিকা থেকে চিরতরে মাছ বাদ যায়। কারণ, মাছ সৌভাগ্যের প্রতীক, মাছ আনন্দানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ।

খাদ্য হিসাবেও মাছ অতি উচ্চাঙ্গের। মাছের মধ্যে থাকে আমাদের শরীরের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিন। বাংলাদেশের সর্বত্রই খাল, বিল,

পুকুর এবং জলা। তাই এখানে মাছ চাষের সুযোগও অফুরন্ত। অবশ্য এখন প্রয়োজনের তুলনায় মাছের সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত কম। আর বাঙ্গালীর রসনা পরিতৃপ্তিতে যে মাছের অদ্বিতীয় ভূমিকা, সেই মাছ প্রায় অদৃশ্য হতে বসেছে। যেটুকু লভ্য, তাও এমনই মহার্ঘ যে সাধারণের নাগালের বাইরে। বাঙ্গালীর জীবনে এটা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার সন্দেহ নেই। তবু ভোজন-রসিক বাঙ্গালীর পরিচয় দানে মাছের উল্লেখ অনিবার্য। বর্তমান নিবন্ধে বাংলা প্রবাদে সেই বহু অভিলষিত মাছের স্থান কতখানি, সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হবে। প্রবাদ যে কেবল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বাঙ্ময়রূপ তাই নয়, সেইসঙ্গে প্রবাদ যে একটা জাতির জীবনের দর্পণস্বরূপ, একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম, বাংলা প্রবাদে মাছের প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা সেই সত্যটিকেই নতুন করে উপলব্ধি করবো।

আমাদের দেশে কত অসংখ্য রকমেরই না মাছ পাওয়া যায়, আমাদের প্রবাদে কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাছকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ মাছই অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। ছোট মাছের মধ্যে খলসে, কই, টেংরা, চিংড়ি, মাগুর আর পুঁটি, অপরদিকে বৃহদায়তনের মধ্যে রুই, কাতলা, চিতল এবং ইলিশের মত কয়েকটি মাছের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে মাত্র। মাছ সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে বিশেষ বিশেষ মাছের আকৃতি, প্রকৃতি কিংবা আস্বাদন সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লিখিত হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমান হিসাবেই মাছের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

বেশ কয়েকটি বাংলা প্রবাদেই মাগুর মাছের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। আর এইসব প্রবাদে মাগুর মাছকে বেশ গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে। যেমন একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মাছ খাবে ত মাগুর, কি করবে ত ঠাকুর।

অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ওরে ভাই কালু।
কারো পাতে মাগুরমাছ,
কারো পাতে আলু।

কিংবা,

মাগুর মাছের ঝোল,
ভরা যুবতীর কোল,
হরি হরি বোল।

পরিশ্রমই যদি করতে হয় এবং সে পরিশ্রম যদি মৎস্যশিকারকে কেন্দ্র করে হয় তবে মাগুর মাছের জন্যই করা শ্রেয়ঃ, যেমন উপপতি হিসাবে যদি কাউকে মেনে নিতে হয় তবে কোন ব্রাহ্মণকেই নির্বাচন করা উচিত—

লাং ধরলে ঠাকুর, মাছ ধরলে মাগুর।

মাগুরের মত রুই মাছকেও অবশ্য বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রবাদে। এমন-কি মৎস্যসাম্রাজ্যে রুইকেই সম্রাটের মুকুট পরান হয়েছে—

মাছের মধ্যে রুই, মানুষের মধ্যে মুই।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

রুইয়ের মুড়ো কেটো মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো দাও জামাইয়ের পাতে॥

বক্তব্যটি শ্বশুর বা ঐরূপ গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বলে অনুমান করায় কোন বাধা নেই। বক্তা এক্ষেত্রে যেই হোন তিনি ভোজন রসিক, তাই জামাইকে প্রতারিত করতে আড় মাছের মুড়োকে প্রশংসা করে সেটি তাঁকে না দিয়ে জামাইকে দিতে বলেছেন। আর রুইমাছের মুড়োর নিন্দা করে সেটি নিজের পাতে পেতে চেয়েছেন। আপাতভাবে জামাইয়ের প্রতি সোহাগ দেখিয়ে বক্তা রুই মাছের উৎকৃষ্ট মাথাটি ভোজন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রুইমাছের গুরুত্ব ভিন্নতর ভাবেও প্রবাদে প্রকাশিত হয়েছে—

পুকুরের রুই মাছ জালে পড়ে কাঁদে।
না জানি গেরস্থের বউ কেমন করে রাঁধে॥

কিংবা—

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী মোরে কেমন করে রাঁধে॥

—এক্ষেত্রে রুইমাছ আসলে উপলক্ষ্য, লক্ষ্য বাঞ্ছিত মর্যাদালাভে বঞ্চিত সম্মানিত ব্যক্তির দুর্ভাগ্য।

আদর্শ ব্যঞ্জন তথা ভোজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনিবার্য ভাবে রুই মাছকে তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে—

পলতা শাক রুহি মাছ, ডাক বলে ব্যঞ্জন সাচ।

ইলিশ মাছ মাত্র একটি প্রবাদে স্থান পেয়েছে, তাও সেক্ষেত্রে প্রচলিত মর্যাদালাভ থেকে ইলিশকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বরং বিপরীতক্রমে তার

নিন্দাই করা হয়েছে যে পেটের পক্ষে এই মাছ ভাল নয়। তাই উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

ইলিশ কাঁচকলা দিয়ে গিলিস।

কইমাছ একাধিক প্রবাদের বিষয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কই মাছ সংক্রান্ত প্রবাদে বিশেষভাবে কইমাছের প্রকৃতি সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে। অধিকাংশ মাছ জল থেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়, মুষ্টিমেয় যে ক'টি মাছের জলে ও ডাঙ্গায় উভয়ক্ষেত্রেই অক্সিজেন নেবার ক্ষমতা আছে, আর তার ফলে তারা জল থেকে ডাঙ্গায় তোলার পরও দীর্ঘসময় বেঁচে থাকে, কই মাছ তাদেরই অন্যতম। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান।

এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অবশ্য কই মাছ নয়, শত দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগ এবং অত্যাচার-অনাচারেও যে মানুষ দীর্ঘজীবী, তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়।

কইমাছকে সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে থাকতেই দেখা যায়। তবে এই প্রবাদটিতে দলছুট ব্যক্তি যে পুনরায় দলে মিশে তার ব্যক্তি সত্তার বিলোপ ঘটায় সেই সত্যকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্ষাকালে পুকুর বা জলা ভেসে গেলে পুকুরের অন্যান্য অনেক মাছের সঙ্গে কই মাছও ডাঙ্গার ওপরে উঠে আসে। এদের বলা হয়—

উজানের কই।

কুৎসিত বা নির্গুণ ব্যক্তির ধৃষ্টতার পরিচয় দান প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কানকাটা কই মাছ তাল গাছে বায়;
পোচরা মুখ নিয়ে দরবারেতে যায়।

এখানে 'কানকাটা কই' মাছকে নির্গুণ ব্যক্তির উপমান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কইমাছ সংক্রান্ত আর একটি প্রবাদ—

পানা ভিজল যার, বড় কই তার।

বড় পুরস্কার লাভ করার জন্য বড় ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, এই সত্যই প্রবাদটিতে বিধৃত।

ছোট মাছের মধ্যে পুঁটি সর্বাধিক প্রবাদে স্থান পেয়েছে। সব ক'টি প্রবাদেই পুঁটি মাছকে অত্যন্ত হেয় করা হয়েছে। একটি প্রবাদে ত পুঁটিকে মাছ বলেই স্বীকার করা হয়নি—

এরণ্ডও মাছ, পুঁটিও মাছ।

অন্য প্রবাদে পুঁটির সীমিত প্রাণশক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে—

পুঁটি মাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান।

এক্ষেত্রেও অবশ্য পুঁটি মাছ উপমান মাত্র, উপমেয় অনুল্লিখিত, কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে না যে সীমিত শক্তির অধিকারী মানুষই এক্ষেত্রে লক্ষ্য। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

পুঁটি মাছও জাল ছিঁড়তে চায়।

কিংবা—

অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছটফটি।

সামান্য আহার্য লাভেরও সুযোগ নেই যে হতভাগ্যের, তার যদি মহার্ঘ এবং দুর্লভ আহার্য্যের জন্য ব্যাকুলতা জন্মায়, তবে তা স্বাভাবিক কারণেই সমালোচনার সম্মুখীন হয়, আর সেক্ষেত্রে যে প্রবাদ বাক্যের সহায়তা নেওয়া হয় তা হল—

পান না ক্ষুদে পুঁটি, বলে খাব দুধ-রুটি।

দুর্বল সর্বদা সবলের দ্বারা পীড়িত হয়, লাঞ্ছিত হয়, যেমন—

চুনো পুঁটি রাঘব বোয়ালের খাদ্য।

একেবারেই বৃহৎ কিছু হওয়া বা লাভের আশা কিছুটা অস্বাভাবিক বৈকি, আর এই মানসিকতা যে সমালোচনাকে আহ্বান করে তা হল—

চুনো পুঁটি নয়, একেবারে কাতলা।

স্বদেশী যা কিছু তা যত সামান্যই হোক, তবু স্বদেশ প্রেমিকের কাছে বিদেশী মহার্ঘ বস্তুর তুলনায় অনেক অনেক বেশি মূল্যবান বলে বিবেচিত। অনেকটা সেই বিদেশের ঠাকুর অপেক্ষা স্বদেশের কুকুর শ্রেয়ঃ মত—

বিদেশের রুই, দেশের পুঁটি।

আশাই সর্বনাশা, তা-না হলে অল্প কিছু লাভের জন্য যে মানুষ ব্যাকুল, তা লাভের পর তার তাতে আর মন ভরেনা, অধিকতর কিছু লাভের জন্য ব্যাকুল হয় কেন? প্রবাদের ভাষায় বললে দাঁড়ায়—

পুঁটি মাছ মেরে শোলে দৃষ্টি।

পুঁটিমাছ নিয়ে রচিত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. অ দে খলায় দেখছে, পুঁটিমাছ লেখছে।

খ. পুঁটি মাছের আবার পিটুলি।

গ. অল্প জলে পুঁটি মাছ ফরফর করে।

শেষোক্ত প্রবাদটিকে 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী' প্রবাদটির রূপান্তরিত রূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

টেংরা মাছ একাধিক প্রবাদে স্থান পেয়েছে, কিন্তু স্বভাবতঃই রুই কিংবা মাগুরের মত কৌলীন্য তার কপালে জোটেনি। বরং পুঁটির মত তাচ্ছিল্যই প্রকাশিত হয়েছে—

চেঙড়া বৈদ্য, লেঙড়া গাই,
টেঙরা মাছ ভেঙরা ভাই।

খলসে মাছ আকৃতিতে ছোট, কিন্তু বেশ কয়েকটি প্রবাদ তাকে নিয়েই রচিত—

ক. তুই খল্‌সে মুই খল্‌সে একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধরে নাচ॥

একই দুর্ভাগ্যের অধীন যারা, তারা পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল হয়।

খ. মাছ খায় না যতিনী পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি কবে না যতিনী, কোণে তিনটে মিনসে॥

গ. অ্যাং যায়, চ্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই।

ঘ. খলসে মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের কোল।

বাণ, ল্যাটা, শিঙ্গি ইত্যাদি মাছ বাংলা প্রবাদে স্থান না পেলেও শোলমাছ কিন্তু তার উপযুক্ত স্থানটুকু অধিকার করে নিয়েছে—

ক. শোল মাছ লেজ নাড়ে,
মেছুনীর কড়ি বাড়ে।

ওজনের সময় মাছ নড়লে মাছের ওজন বেশি হয়, ফলে বিক্রেতার অধিক লাভ হয়।

খ. শোলের ঘাড় ভাঙতে পারে না,
মাগুরের ঘাড় ভাঙ্গে।

অল্প কাজে পারদর্শিতার অধিকারী না হয়েই বৃহৎ কাজে প্রয়াসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গ. যে শোলটি পালিয়ে যায় সেই টি কি মস্ত নয়।

মানুষের প্রকৃতিই হল নিজের ক্ষতিকে বড়ো করে দেখান।

ঘ. শোল খেলাম, বোয়ল খেলাম, চিংড়ি খেয়ে দাঁত ভাঙলাম।

বৃহৎ কাজে অনায়াস সাফল্যের পর তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র কাজে ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়াটা শুধু দুঃখের নয়, অপমানকরও বটে।

ঙ. শোল-গজালের পোনা
যার কাছে যা তাই শোনা।

নিজের সামান্য সম্পদকে সকলেই মূল্যবান বলে বিবেচনা করে থাকে।
শোল মাছ সংক্রান্ত আরও দুটি প্রবাদ—

চ. শোল ধায় বোয়াল ধায়, তার পিছে খলসে পুঁটিও ধায়।

ছ. শোল চেঙও সেজেনা, পোনা চেঙও সেজেনা।

অন্যান্য মাছের তুলনায় তপসে মাছ কিছুটা স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্য তার গোঁফ-দাড়ির জন্য। সেকথা বলাও হয়েছে একটি প্রবাদে—

ঋষ্যা চিনি মোছে, বামুন চিনি গোছে।

পুঁটি মাছের প্রসঙ্গে ইতঃ পূর্বেই বোয়াল এবং কাতলা মাছ উল্লিখিত হয়েছে। পরস্বাপহারীকে বোয়ালের সঙ্গে তুলনা করে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

পরের হাতে ধন রেখে যে কয় আছে,
তার ধন তো খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে।

সামান্য উপায়ে বৃহৎ কাজ করা বোঝাতে কাতলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।

অনুরূপভাবে, চেঙ দিয়ে চিতলমাছ ধরা।

একটি প্রবাদে ইঁচলাকে মাছের মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত করে বলা হয়েছে—

ঘাসও আবার মাছ, ইঁচলাও আবার মাছ।

অন্য একটি প্রবাদে চিংড়ি মাছকেও মাছের মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—

গোসাপ আবার সাপ হলো, আরশোলা সে পাখী,
চিংড়ি আবার মাছ হলো, বদ্যি বামুন নাকি ?

এ হেন মাছের চাষ কিন্তু ভুলেও অন্যের পুকুরে করতে নেই। কারণ তাহলে পুকুরের মালিক যে, সেই সব পরিশ্রমের ফসল আত্মসাৎ করবে। এইজন্যেই একটি প্রবাদে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে দেয় মাছ।

পুকুর কিংবা জলাশয় ছাড়া মাছ বাঁচতে পারে না। কারণ অধিকাংশ মাছ কেবল জল থেকেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। একটি প্রবাদে এই সত্যটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে—

গাঁ ছাড়ে না কুকুর, মাছ ছাড়ে না পুকুর।

গ্রীষ্মে মাছের মড়ক লাগে। কারণ প্রচণ্ড তাপে পুকুর, খাল-বিলের জল যত শুকোয় ততই মাছের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাই তো বলা হয়েছে—

শিকড় কাটলে গাছ পড়ে, জল মরলে মাছ মরে।

এমনকি পুকুরের জল যদি খুব ঘোলাটে হয়ে যায়, তাহলেও তা মাছের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়—

পুকুর গাবালে হয় মাছের মরণ।

মাছ জলের প্রাণী, তাই স্বভাবতঃই, 'মাছের নেই জলে ডোবার ভয়'।

মাছ ধরতে গেলে, বিশেষত ছিপে টোপ ফেলতে হয়। অবশ্য টোপ ফেললেই যে মাছ ধরা সম্ভব হয়, তা নয়—

চার ফেললেই মাছ আসে ?

—প্রবাদে সেই সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল আমরা কার্যসিদ্ধির জন্য অন্যকে লোভ দেখাই। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে লোভ দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি হয়, তা কিন্তু নয়।

মাছ যতই উপাদেয় খাদ্য হোক, তবু তা দীর্ঘস্থায়ী নয়, নির্দিষ্ট সময়ের পরে এই উপাদেয় খাদ্যোপকরণটিই পরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে। কারণ—

মাছ আর অতিথি দু'দিন পরেই বিষ।

আবার পেট যদি ভরা থাকে, তাহলেও অমন যে উপাদেয় মাছ তা খেতে তেমন আগ্রহ থাকে না। এমন কি যে ভাজা মাছের গন্ধে অথবা কথায় জিভে জল আসে, সেই ভাজা মাছও বিস্বাদ লাগে—

পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে।

মাছের পচন ক্রিয়া শুরু হয় মাথা থেকে। তাই সর্বাগ্রে মাছের দেহ থেকে মাথাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়। নতুবা সমগ্র মাছটিই খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা—

মাছ মাথা থেকে পচে।

মাছ যেহেতু জলে এবং কাদায় থাকে, তাই ভাল করে মাছকে ধুতে হয়, নতুবা একটা বিশ্রী গন্ধ মাছ রান্নার পরও থেকে যায়। তাছাড়া মাছে মাটিও লেগে

থাকতে পারে সেইজন্যেই বলা হয়েছে –

মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিঠে।

মাছ ধরতে গেলে কাদা লাগবেই। তাই 'স্নান করবো কিন্তু চুল ভেজাবোনা', মাছ ধরবো অথচ কাদা লাগবে না – এরকমটা হয় না। কিন্তু যদি এরকম হয় যে হাতে পায়ে কাদাও লাগলো অথচ যে জন্যে কাদা লাগা তাই সার্থক হলো না, অর্থাৎ মাছ ধরা গেল না, তাহলে তা বড়ই দুঃখের ব্যাপার হয় নিঃসন্দেহে। একটি প্রবাদে তাই তো বলা হয়েছে –

কাদা মাখা সার হল, মাছ ধরা হল না।

যে উদ্দেশ্যে পরিশ্রম, তা যখন ব্যর্থ হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, তখনই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যে কাজের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ থাকে না, অথচ তার পরিণামের বিশেষ করে কুফলের ভাগী হতে হয়, সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি --

মাছ খাইনা তবু গলায় কাঁটা বেঁধে।

মাছ ধরার অন্যতম প্রধান উপাদান হল জাল। জালে মাছ একবার ধরা পড়লে আর তার নিস্তার নেই। একটি প্রবাদে তাই সুন্দর করে বলা হয়েছে –

আক্কেলে সকল বন্দী, জলে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥

কিন্তু জাল যদি ছেঁড়া হয়, তাহলে তা দিয়ে মাছধরা এক রীতিমত শক্ত কাজ। কারণ ছেঁড়া জাল থেকে মাছ সহজেই আবার বেরিয়ে যেতে পারে –

জাল ছেঁড়া পলোভাঙা, এ মাছ শক্ত তুলতে ডাঙ্গা।

প্রবাদটির ব্যঙ্গার্থ হল, যে লোকের কোন বিপদের মধ্যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাকে আয়ত্তে আনা খুবই কষ্ট সাধ্য।

এক্ষেত্রে 'এ মাছ' লক্ষণীয়। জাল ছেঁড়া, পলো ভাঙা, মাছের গুণবাচক শব্দ।

পুকুরের আকৃতির তুলনায় যদি মাছ আকারে বড় হয়, তাহলে বলা হয় –

বারহাত পুকুরেও তের হাত মাছ।
ধরলেও ধরে যায় আড়াআড়ি ধাঁচ॥

তুলনীয়—বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

পরিশ্রম করবে একজন, আর তার ফল ভোগ করে যদি অন্যরা, তবে তা খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—

উদবিড়াল মাছ ধরে, খট্টাসে তিন ভাগ করে।

উদবিড়াল জলচর নেউলের আকৃতি বিশিষ্ট মৎস্যপ্রিয়, অপর পক্ষে খট্টাস হল বিড়াল জাতীয় ভাম, উদবিড়াল জলে ডুবে মাছ ধরে আনার পর প্রবলতর খট্টাস তাতে ভাগ বসায়। বিনা পরিশ্রমেই ফলভোগ করে।

একটি প্রবাদে আদর্শ বঁড়শীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অবশ্যই এক্ষেত্রে বঁড়শী উপলক্ষ্য, লক্ষ্য আদর্শ পড়শীর আচরণ। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

এক খেঁচেতে মাছ গাঁথেনা, সেই বা কেমন বঁড়শী,
এক ডাকেতে সাড়া দেয়না, সেই বা কেমন পড়শী।

সংসারে থেকেও যে ব্যক্তি সংসারের আবিলতায় আচ্ছন্ন হয় না, তার প্রসঙ্গে বলা হয়—

পাঁকাল মাছে পাঁক লাগেনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী মানুষকে পাঁকাল মাছের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' যেমন অর্থহীন, তেমনি অর্থহীন—

মাছকে সাঁতার শেখানো।

'গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজা'র মত বলা হয়—

মাছের তেলে মাছ ভাজা।

গঙ্গা পুজার জন্য প্রয়োজনীয় গঙ্গা জল যেমন গঙ্গা থেকেই সংগৃহীত হয়, অনুরূপ ভাবে মাছ ভাজার তেল মাছ থেকেই সংগৃহীত হলে প্রবাদটি বলা হয়। আসলে এক্ষেত্রে কোন কাজ যখন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থত্যাগে সম্পন্ন করতে হয় না, তখনই প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি।

একের পক্ষে যা প্রয়োজনীয়, অন্যের পক্ষে তাই হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, গলগ্রহ। যেমন—

মাছের কাঁটা গলার বালাই।

যে যাতে অভ্যস্ত, তার তাতে কোন ভয় থাকেনা। তাই—

মাছের নেই জলে ডোবার ভয়।

একের কর্মফলের জন্য যখন অন্যকে অভিযুক্ত হতে হয়, তখন বলা হয়—

মাছ খেলো মেছো কুমীরে, চড়ক গাছের দোষ।

মাছ সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল—

ক. ভোঁদড়ের গন্ধে মাছের গায়ে জ্বর।

খ. ঘরে চাল যার, দোয়াড়ে মাছ তার।

গ. মাছের মায়ের পুত্রশোক।

ঘ. মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

ঙ. গভীর জলের মাছ।

চ. মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে, শান্ত করলে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চোখে॥

ছ. মাছ চেনে গভীর জল, পাখী চেনে ডাল।
মায়ে জানে পুতের মায়া, জীয়ে যত কাল॥

জ. আশায় জল সিঁচে মরি, রুই কাতলা কি পুঁটি ধরি।

ঝ. মাছ মেরে এল তিওর,
কোন্ দিক পাশতলা, কোন্ দিক শিয়র।

ঞ. ছিপে মাছ খেলিয়ে তোলা।

মাছের প্রসঙ্গ কখনও জেলেকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। কারণ জলা থেকে কষ্ট করে মাছ সংগ্রহ করে এনে দেয় এই জেলেরাই। তাই মৎস্য-প্রেমিক মাত্রই এদের কাছে ঋণী। বাংলা প্রবাদে শুধু যে মাছের প্রসঙ্গই স্থান পেয়েছে তা নয়, সেইসঙ্গে জেলেরাও বেশ কয়েকটি প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

হালে গেলে হেলে, জালে গেলে জেলে।

অপর একটি প্রবাদের বক্তব্য—

জাহাজের মাস্তলের ভর কি জেলের ডিঙিতে সয়।

—আক্ষরিক অর্থ কিন্তু এখানে প্রধান নয়, গৌণ; মুখ্য অর্থ হল 'গরীবের ঘোড়া রোগ'। অন্য আর একটি প্রবাদের মূল বক্তব্য হল—'যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে'। কিন্তু এই বক্তব্যকেই একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করতে গিয়ে জেলের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, বলা হয়েছে—

আগে ভাল ছিল জেলে জাল দড়া বুনে।
কি কাল করিল জেলে এঁড়ে বাছুর কিনে॥

জেলে সম্পর্কে একটি প্রবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রবাদটিতে আমাদের দেশের জেলেদের বাস্তব অবস্থা বড় সততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। যে জেলে সীমাহীন পরিশ্রম করে মাছের চাষ করে, তার কপালে কিন্তু জোটে চিরন্তন দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে অন্যে—

জেলের পোঁদে টেনা, নিকারির কানে সোনা।

সবশেষে পুকুর সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে।

পুকুর ছাড়া মাছ বাঁচেনা, তাই মাছের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। একটি প্রবাদে পুকুর কিভাবে খারাপ হয়, সেই বিষয়ে বলা হয়েছে—

গাঁ নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়।

অন্য একটি প্রবাদে পুকুর সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে—

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।

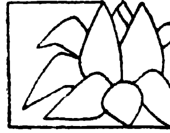
—অর্থাৎ এক্ষেত্রে বৃহৎ যে ক্ষুদ্রেরই সমষ্টি তাই বোঝান হয়েছে।

বাসস্থানের সঙ্গে পুকুরেরও প্রয়োজন, তবে তার সংখ্যা সীমিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।

বাংলা প্রবাদে ফুল

বাংলাদেশকে উৎসবের দেশ বলে অভিহিত করা একটা প্রচলিত রীতি। এই রীতিকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি 'গানেরও দেশ' বাংলা দেশ, আবার একে যদি 'ফুলের দেশ' বলি, তাহলেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। হরেক রকম গানের মত, হরেক রকম ফুল এখানে সহজেই যে কারও চোখে পড়বে। প্রকৃতির অকৃপণ দানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন অভাব নেই, তেমনিই সেই সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নানা সময়ে ফোটা হরেক রকম ফুলের ভূমিকাও নেহাৎ কম নয় বাংলাদেশের প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে। বাংলা দেশে যে সব ফুল ফোটে সেগুলির রমণীয় বর্ণবৈচিত্র্য যেমন রসিকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে, তেমনি মনোমুগ্ধকর সুবাস রসিকজনের অন্তরকে করে পরিতৃপ্ত। রূপে, রসে, গন্ধে ভরা আমাদের বাংলাদেশের প্রকৃতির সাজিতে সাজানো ফুলগুলি বাস্তবিকই আমাদের গর্বের কারণ।



ইদানীং সচেতন কুসুমবিলাসিতার প্রভাবে আমরা নানা নয়নমুগ্ধকর বাহারী ফুলের সঙ্গে পরিচিত। বহুজনের উদ্যানে ডালিয়া, জিনিয়া, খসমস ইত্যাদির সমাবেশ লক্ষ্য করি, কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব কুসুম সম্ভারের বৈচিত্র্যও যে কম নয়, সে সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই কারো।

আমরা মল্লিকা, গন্ধরাজ, জুঁই, কদম্ব, বেল, চামেলি, টগর, জবা, হাসনুহানা, কৃষ্ণচূড়া, কলকে, রমণী, দোপাটি, রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, কৃষ্ণকলি, চন্দ্রমল্লিকা, এবং এরকম আরও কত অসংখ্য ফুলই না এখানে ফুটতে দেখি। কোনটি আকৃতিতে ক্ষুদ্র কিন্তু গন্ধে অতুলনীয়, কোনটির রূপের বাহার, কোনটি রূপে গুণে দুয়েই অনবদ্য। বাংলা প্রবাদে কিন্তু আমরা অন্যান্য উপকরণের মত ফুলের তেমন আধিপত্য লক্ষ্য করিনা। অবশ্য ফুল সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যাল্পতা সেজন্য ঘটেনি, আসলে আমাদের প্রবাদে আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত বহু ফুল আমন্ত্রিত হয়নি। যেসব ফুল আমন্ত্রিত হয়নি, তাদের প্রসঙ্গ আপাতত

মুলতুবি রেখে যে সব সৌভাগ্যবান ফুল উল্লিখিত হয়েছে, তাদের নিয়ে রচিত প্রবাদগুলিকেই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় করা গেল।

গোলাপকে যদিও ফুলের সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য দিয়ে থাকেন অনেকেই, কিন্তু বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে তার সেই আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পদ্ম। শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠতাতেই নয়, কমল বা পদ্ম সংক্রান্ত প্রবাদগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যের বৈচিত্র্যেও আমরা সহজেই আকৃষ্ট হই। এইসব প্রবাদে পদ্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং সেই আকর্ষণ জনিত দুর্বলতা কখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে, আবার কখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। নিকৃষ্ট বস্তুর সমাদর ও শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনাদর প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

শতদল ভাসিয়ে জলে, শালুক মালা পরেছি গলে।

নিকৃষ্ট এবং অবাঞ্ছিত পরিবেশে যদি কোন দুর্লভ গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে, সেক্ষেত্রে বলা হয়—

গোবরে পদ্মফুল

অথবা, গোবর-কুড়ে পদ্মফুল।

প্রবলের অত্যাচার বর্ণনা করতে যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয় সচরাচর সেটি হল—

কমল বনে করী।

পদ্মফুলের মনোহরণ ক্ষমতা যতই থাক, সেইসঙ্গে তা যে কণ্টকময়, এ সত্য প্রবাদে অমুক্ত থাকেনি। অবিমিশ্র গুণের আধারের সন্ধান লাভ যে সম্ভব নয়, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কাঁটা বিনা কমল নাই, কলংক বিনা চাঁদ নাই।

এই একই বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ এইরকম—

কমলে কণ্টক।

প্রিয়জনের কাছে মানুষ শুধু বাঞ্ছিত আচরণই প্রত্যাশা করে, এক্ষেত্রে সামান্যতম অন্যথা ঘটলে আমরা অন্তরে আঘাত পাই, প্রকাশ পায় অভিমান। প্রবাদের ভাষায় বললে দাঁড়ায়—

সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটলো কাঁটা।
সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হলো কানা॥

পদ্মের শুধু রূপই নেই, গুণও আছে পূর্ণমাত্রায়। পদ্ম সুগন্ধী। কিন্তু বেরসিক যদি সেই সুমিষ্ট গন্ধের সন্ধান না পায়, সেজন্য পদ্মকে অভিযুক্ত করা যায় না,

বরং অভিযুক্ত করতে হয় আস্বাদনে অকৃতকার্য হতভাগ্যটিকে—

কান থাকতে কালা, চোখ থাকতে অন্ধ।
ঘুরে ঘুরে ভেবেই সারা পদ্মের নাহি গন্ধ॥

শালুক ফুল দেখতে পদ্মের মত না হোক, পদ্মের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। বেশ কয়েকটি প্রবাদেই এই ফুলটি তার স্থান করে নিয়েছে। সব প্রয়াসই যে সফল হয় না. এই সত্য প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

প্রতি ডুবে কি শালুক ওঠে ?

শালুক সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রবাদটি হল—

শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

পরিচিত বিষয়ে অভাবনীয় অজ্ঞতা প্রদর্শিত হলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

শালুক জলের ওপর সামান্য বাতাসেই আন্দোলিত হয়, তার ওপর যদি জলাশয়ে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ত আর কথাই নেই, প্রবাদের ভাষায়—

একে শালুক তায় তরঙ্গ।

ব্যঙ্গার্থের দিক দিয়ে 'একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ' প্রবাদটির সঙ্গে এর বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান।

স্বার্থপর মানুষ অন্যের ক্ষতির বিনিময়েও নিজের স্বার্থ সিদ্ধিতে স্থিরচিত্ত, একটি প্রবাদে এই ধরণের মানুষের মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে শালুক ফুলকে উপলক্ষ্য করে—

তোরে মেনে খাক কুমীরে, আমার শালুক তুলে দেরে।

শালুক সম্পর্কিত আর একটি প্রবাদ—

লোকে বলে আছে ভালো, শালুক খেয়ে দাঁতে কালো।

এইবার গোলাপের প্রসঙ্গ। কয়েকটি মাত্র প্রবাদে এই বহুল পরিচিত এবং সমাদৃত ফুলটি উল্লিখিত হয়েছে। 'কাঁটা বিনা কমল নাই' প্রবাদটির মত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

চাঁদের কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক।

অস্বাভাবিক বিলাসিতা বোঝাতে যে প্রবাদটির প্রয়োগ চলিত আছে, সেটি হল—

গোলাপজল দিয়ে ছোঁচানো।

গোলাপ সম্পর্কিত অপর দুটি প্রবাদ –

ক. গোলাপ বাগে কুকুর হাগে।

খ. গোলাপ বাগে কুকুর শোঁকা।

ফুলের রাজ্যে চাঁপা ফুলের মর্যাদার আসন – রূপে এবং গুণে ফুলটি সত্যই আকর্ষণীয়। একটি প্রবাদে এ হেন চাঁপার সুমিষ্ট গন্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে –

চাঁপা ফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

বাচ্যার্থে যা চাঁপা ফুলের গন্ধ, ব্যঙ্গার্থে তাই তরুণী পত্নীর আকর্ষণকে বুঝিয়েছে। আসলে তরুণী পত্নীর আকর্ষণে জামাতার শ্বশুরালয়ে উপস্থিতিকে বোঝান হয়েছে। প্রবাদটির মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে এককালে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়। কুলীন যারা তারা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হলে ত কথাই নেই, বহুবিবাহ করতেন। বিবাহ করাই ছিল এদের পেশা। আর শতাধিক পত্নীদের তালিকা মিলিয়ে দেখা করতে এইসব বিবাহ ব্যবসায়ীরা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়েই একজনের সঙ্গে বৎসর মধ্যে এক বা একাধিক-বার মাত্র সাক্ষাৎ ঘটত। বহু পত্নীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণী পত্নীর প্রতি এইসব বিবাহ পারদর্শীদের একটু বিশেষ নজর থাকত। তাই অন্যদের তুলনায় তরুণী ভার্যার সান্নিধ্য লাভ করতে শ্বশুরালয়ে একটু ঘনঘন যাতায়াত ঘটত। অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

বরের মাথায় চাঁপাফুল, কনের মাথায় টাকা।
এমন বরের বিয়ে দেব, যার গোঁফ জোড়াটি পাকা॥

এখানে অল্প বয়সী কন্যার সঙ্গে বয়স্ক পাত্রের বিবাহদানের কৌতুকটি (?) প্রকাশিত। বর বয়স্ক হলেও সে যে রসিক তার পরিচয় দান প্রসঙ্গেই তার মাথায় চাঁপাফুল থাকার কথা বলা হয়েছে। যেক্ষেত্রে কন্যার পক্ষে মাথার খোঁপায় চাঁপাফুল গোঁজা স্বাভাবিক ছিল, সেক্ষেত্রে পাকা গোঁফ জোড়ার অধিকারী বর তরুণী ভার্যার মনোরঞ্জনের জন্য মাথায় চাঁপাফুলকে স্থান দিয়েছে বলে স্নিগ্ধ কৌতুক করা হয়েছে।

বকুল ফুলের আকৃতি যতই ক্ষুদ্র হোক, গন্ধেতে যে সে বন্যা আনতে পারে সে অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকের আছে। তবু প্রবাদে বক এবং চাঁপার সঙ্গে বকুল গাছ পুঁততে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

বক, বকুল চাঁপা, তিন পুঁতো না বাপা।

নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি প্রবাদে বকুলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

মাসীমার বকুল ফুলের বোন পো বউয়ের বোনঝি জামাই।

আগেকার দিনে একে অন্যের সঙ্গে সখিত্ব পাতাতে নানা ফুলের নাম ব্যবহার করা হত। সেই রকমই এখানে বকুল ফুল নাম্নী এক সখীর উল্লেখ করা হয়েছে। বকুল ফুলকে নিয়ে রচিত অপর একটি প্রবাদ—

ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলের মালা গাঁথা।

ধুতরা ফুল তেমন কোন লোভনীয় ফুল নয়। এর না আছে রঙের বাহার, না আছে আকর্ষণীয় গন্ধ। একমাত্র শিবপূজাতেই এর প্রয়োজন। তথাপি একাধিক প্রবাদ এই ফুলটিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে—

ক. কালা কাজলের মাটি, তার লাগি ছ'মাস খাটি
রাঙা ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়া মূল॥

খ. গোবরে ধুতুরা ফুল, হাটে নে গেলে তিন কড়া মূল।

দুটি প্রবাদেই ধুতরা ফুল যে মূল্যহীন সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদটিতে ধুতরা ফুলের যে মূল্যের কথা বলা হয়েছে, তা যে পরিহাস প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত, বোধকরি তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

শরৎ ঋতুর সঙ্গে কাশফুলের সম্পর্ক সুগভীর। বৈচিত্র্যহীন বর্ষার অবসানে একদিকে যেমন শরৎ ঋতুর আত্মপ্রকাশ ঘটে, তেমনি সেইসঙ্গে আত্মপ্রকাশ ঘটে কাশফুলের; ঘোষিত হয় আনন্দময়ীর আগমন বার্তা। একটি প্রবাদে তাই কাশফুলকে বর্ষার অবসান ঘোষণাকারী রূপে অভিহিত করা হয়েছে, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে 'শরৎ ঋতুর অগ্রদূত'—

ফুটল কাশে, ফুরল বার্ষে।

যা অসম্ভব এবং আশাতীত, যদি কোনও ভাবে তা বাস্তবায়িত হয়,—তবে সেক্ষেত্রে অকল্পনীয় আনন্দলাভের সুযোগ ঘটে। কি রকম?

মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠল চুল।

এক্ষেত্রে যে মালঞ্চ গাছটি মারা গিয়েছিল বলে তাতে আর কোনদিন ফুল ফুটবেনা ভাবা গেছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত ফুল ফুটে, কিংবা যে টাক মাথায় আর কোনদিনও কেশরাজি আত্মপ্রকাশ করবে না সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত চুল বেরোবার মত চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঘটনা বলে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

অনেক মানুষ আছে যাদের দেখতে সুন্দর কিন্তু গুণহীন, তেমনি অনেক ফুল আছে যাদের শুধুই রূপের বাহার কিন্তু গন্ধের বা গুণের লেশমাত্র নেই। প্রবাদে এই ধরণের গুণহীন অথচ রূপবান মানুষকে শিমুল ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ শিমুল ফুল দেখতে রমণীয় হলেও তার গন্ধ নেই।

এত রূপসী মানুষটি, কিন্তুক শিমুল ফুল।

এক্ষেত্রে শিমুল ফুলকে রূপসী অথচ গুণহীন মানুষের উপমান রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছে কাজের কথা বলা ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়, এমন কি অধ্যাত্ম সংক্রান্ত সদুপদেশ বা কীর্তনও এক্ষেত্রে অর্থহীন—

মন আছে যার কেয়াবনে, কি করবে তার কেওনে।

আকন্দ ফুলও প্রবাদের বিষয় হয়েছে—

আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।

বিভিন্ন শাক-সবজির ফুলও প্রবাদে স্থান পেয়েছে দেখা যায়। নির্লজ্জতার আচরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে ঝিঙে ফুলের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে—

বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে ঝিঞে ফুল।

অপর একটি প্রবাদে এক দুঃস্থা রমণী তার পিসীকে দিয়ে মার কাছে তার সুখের অবস্থা জানাতে বলে দিয়েছে এইভাবে—

মাকে গিয়ে বলো পিসী, বড়ো সুখে আছি,
ঝিঞের ফুল ফুটলে তবে ভোজনেতে বসি।

সরষে বা সরষে ফুলের সঙ্গে বিপদের কোন সম্পর্ক নেই, তবু বিপন্ন বোধ করা অর্থে বলা হয়—

চোখে সরষে ফুল দেখা।

সরষে ফুল দেখা অর্থে অপর যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি প্রযুক্ত হয়, তা হল—

ধুতুরা ফুল দেখা।

যা চোখে দেখা যায় না, এই অর্থে প্রযুক্ত হয় নিম্নোক্ত প্রবাদটি—

ডুমুরের ফুল, সাপের পা ॥

ডুমুরের ফুল বাইরে ফোটে না, বীজের সঙ্গে তা ভেতরেই থাকে, তাই তা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। এইজন্য যে ব্যক্তিকে সহজে দেখা যায় না, তার প্রসঙ্গে ডুমুরের ফুল বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

ঘরের শোভা বৃদ্ধিতে যেমন ছেলে-বউয়ের ভূমিকা, তেমনি বনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তিল ফুলের ভূমিকা—

বনে ফুটে তিল ফুল বনকে করে আলা,
ঘরের সাফা ঝিউরী ছেলে ঘরকে করে আলা ॥

শুধু ফুল নিয়েও বেশ কিছু প্রবাদ রচিত হয়েছে। এইসব প্রবাদে বাচ্যার্থে ফুলের কথা উল্লিখিত হলেও ব্যঙ্গার্থে ভিন্নতর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয়েছে—

ক. এক বৃন্তে দুটি ফুল।
খ. একুশ কোড়া (চাবুক) গণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান।
গ. গাছে ফুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
ঘ. ফুলের সোহাগে ছোটার আদর।
ঙ. মগডালের ফুল দেবতাকে দান।
চ. ফুলের সোহাগে সটার আদর।
ছ. ফুলের শোভা ভোমরা, গাইয়ের শোভা চোমরা।
জ. গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে।
ঝ. হাটবাজারে লজ্জা নেই, ঘরে ফুলের কুঁড়ি।
ঞ. ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি, বুড়ী শণের নুড়ি।
ট. চড়ের ঘায়ে তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা।

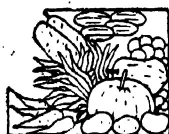
সূত্র বা উৎসের অভিন্নতা বোঝাতে প্রথম প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় প্রবাদটিতে এবং শেষ প্রবাদটিতে পারাবার পার হয়ে গোষ্পদে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে বিদ্রূপ করা হয়েছে। নবম প্রবাদটিতেও প্রায় একই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে—আপাত লজ্জাশীলের অন্তরালে যে নির্লজ্জ সত্তা গোপন থাকে তাকেই রূঢ়ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় এবং পঞ্চম প্রবাদে অনিবার্যভাবে সংঘটিত কাজের সঙ্গে শুভেচ্ছাকে যুক্ত করার অর্থহীন প্রয়াসকে উপহাস করা হয়েছে। চতুর্থ প্রবাদটিতে বলা হয়েছে সৎ সংসর্গে হীন বস্তুও কেমন করে সমাদৃত হয়। ফুলের মর্যাদা সকল ক্ষেত্রেই, সেই সঙ্গে ছোটা, অর্থাৎ কলাগাছের পেটো চিরে যে সূত্র বের করে মালা গ্রথিত হয়, তাও ফুলেরই তুল্য মর্যাদা লাভ করে। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাসে' ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছে প্রবাদটিতে। ষষ্ঠ প্রবাদটিতেও প্রায় একই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। 'সটা' অর্থে ফুলের কেশর। বলা হয়েছে ফুলকে যেমন সোহাগ

করা হয়, তেমনি সোহাগ করা হয় তার কেশরকেও। পরবর্তী অর্থাৎ সপ্তম প্রবাদে সার্থক পরিপূরকের কথা বলা হয়েছে। ভোমরার উপস্থিতিতে কুসুমেরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, যেমন বৃদ্ধি পায় গাইয়ের সৌন্দর্য তার পুচ্ছলোমের চামরে। অষ্টম প্রবাদে উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে গুণীর মর্যাদা যে স্বীকৃতি পায়না সেই সত্য প্রকাশিত। দশম প্রবাদে ফুলের কুঁড়ি উপমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এক্ষেত্রে উপমেয় বালিকা। বালিকা এবং কোরকের সৌন্দর্যের সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাদটি রচিত হয়েছে—উভয়েরই সৌন্দর্য অর্ধপরিস্ফুট অবস্থায় থাকে।

আমরা এ পর্যন্ত আলোচনায় এই সত্য উপলব্ধি করি যে প্রবাদে বাংলা দেশের পরিচিত অধিকাংশ ফুলই অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। আসলে প্রবাদে লক্ষ্য হল মূলতঃ মানব চরিত্রের সমালোচনা, আর ফুল কিংবা অন্য সব উপকরণই হল এক্ষেত্রে উপলক্ষ্য, তাই সেই অভিলষিত কাজটি যখন অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে ভালভাবেই সম্পন্ন করা গেছে, সেক্ষেত্রে ফুলকে এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন প্রবাদের রচয়িতারা বোধ হয় বোধ করেন নি। নতুবা প্রবাদের স্রষ্টারা বেরসিক কিংবা সৌন্দর্য চেতনা থেকে মুক্ত ছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত করলে বোধকরি তাঁদের ওপর অবিচার করারই সম্ভাবনা থেকে যায়।

বাংলা প্রবাদে শাক-সবজি

বাংলা দেশের মাটিতে শাক-সবজির বৈচিত্র্য উল্লেখ করার মত। বাঙ্গালীকে বলা হয় ভোজন-রসিক, বলা হয় ভোজন-বিলাসী। এই ভোজন বিলাসিতার মূলে কাজ করছে বাংলা দেশের মাটি, যে মাটি শুধু ফল, ফুল ফলায় না, ফলায় হরেক রকমের তরি-তরকারি। বাঙ্গালী সেইসব সুলভে প্রাপ্ত তরি-তরকারি সহযোগে প্রস্তুত করে নানা উপাদেয় পদ। অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙ্গালী তাই নানাবিধ ব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন গ্রহণে অভ্যস্ত। উৎসব উপলক্ষে প্রথমেই তাই বাঙ্গালী উদ্যোগী হয় আকর্ষণীয় ভোজের সুবন্দোবস্তে।



তরি-তরকারির মধ্যে যেমন রয়েছে বৈচিত্র্য, তেমনি বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় আমাদের ঘর গৃহস্থালীতে প্রস্তুত হয় যে সব ব্যঞ্জন তাতে। তেতো, ঝাল, ঝোল, পোড়া, চচ্চড়ি, ডালনা, টক, মিষ্টি আরও কত ধরণের আস্বাদন যুক্ত পদই না তৈরী করেন আমাদের মা-বোনেরা।

আমাদের সমাজে আদর্শ গৃহিণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল রন্ধন কার্যে পারদর্শিতার অধিকারিণী হওয়া। এখনও বিবাহের জন্য বধূ নির্বাচনের সময় কন্যাকে যে সব প্রশ্ন করা হয় তার যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য, তার প্রথমটিই হল রন্ধন সংক্রান্ত। অবশ্য বর্তমানে দুর্মূল্যের বাজারে বাঙ্গালী আর আগের মত তার রসনা পরিতৃপ্তির সুযোগ পায়না, বহু ব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন গ্রহণের সাধ থাকলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে ওঠায় ক্রমেই আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত শুকতো, ঘণ্ট, চচ্চড়ি কিংবা ডালনার পাট উঠে যেতে বসেছে, তবু বাংলা প্রবাদে উল্লিখিত বিভিন্ন শাক-সবজির পরিচয় গ্রহণে আমরা দুধের সাধ অন্ততঃ ঘোলে মেটাবার কিছুটা সুযোগ পাব।

আমাদের এক অতি পরিচিত আনাজ হল বেগুন। বেগুনকে বলা হয় নির্গুণ, তবু প্রতিদিনের রান্নায় কোন না কোন ভাবে এই উপাদানটি স্থান

করে নেয়। প্রবাদের রাজ্যে এ হেন বেগুন কিন্তু কোন ক্রমে স্থান করে নেওয়ার পরিবর্তে বরং বেশ জাঁকিয়ে বসেছে দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বেগুনকে নিয়ে এত বেশি প্রবাদ রচিত হয়েছে, যে সে তুলনায় অনেক মর্যাদাসম্পন্ন আনাজ অবহেলিত, এমনকি অনুল্লিখিত থেকে গেছে বিস্ময়কর ভাবে। তেলে বেগুন দিলেই ভীষণ ভাবে শব্দ হতে থাকে। এই থেকেই সৃষ্ট হয়েছে 'তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা' প্রবাদটি। এমনকি একটি প্রবাদে তেলের পরীক্ষার জন্য বেগুনের ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করে বলা হয়েছে—

তেলের পরীক্ষা বেগুনে
সোনার পরীক্ষা আগুনে।

পরিবারে একজনের পরিবর্তে অনেকে যদি কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে তাদের সকলের পীড়নে পরিবারের সকলের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

এক বাড়ীতে সাত কর্তা করে কেবল বেগুন ভর্তা।

'বেগুন ভর্তা' বলতে বেগুন পোড়াকে বোঝান হয়েছে। কর্তৃত্বের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষদের অবস্থাকে বেগুন পোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
দরিদ্র ব্যক্তির ধনবান বলে পরিচিত হবার অলীক আকাঙ্ক্ষাকে ব্যঙ্গ করে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

পান্তা ভাতে নুন জোটেনা, বেগুন পোড়ায় ঘি।

বেগুন পোড়া তেল দিয়ে মাখা হয়ে থাকে। দুঃস্থ ব্যক্তি তার পরিবর্তে ঘি দিতে উদ্যোগী, তাই তার এই হাস্যকর উদ্যোগ সমালোচিত হয়েছে।
প্রায় অনুরূপ বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে রূপান্তরিত এক বাক্যে—

ওরে আমার ষোল কড়া
ঘরে ভাত নেই বেগুন পোড়া।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবীকে শুধু গদ্যময় দেখেন নি, দেখেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি রূপে। একটি প্রবাদে ক্ষুধার আগুনে বেগুন পোড়ার কথা বলা হয়েছে—

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

ধাঁধায় যেমন মূল সমস্যাকে জটিলতর করার জটিল অভিপ্রায়ে মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন অংশকে যুক্ত করা হয়, তেমনি প্রবাদেও কখন-সখন নিছক

পাদ পূরণের কারণে মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন অংশ সংযোজিত হতে দেখা যায়। যেমন—

নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কি।
পরের ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥

দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদি ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তাকে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলেই মানুষ বিবেচনা করবে স্বাভাবিক কারণে। বেগুনের সঙ্গে হাড়ের কোনই সম্পর্ক নেই, তাই বেগুন পোড়ায় যদি হাড়ের সন্ধান লাভ ঘটে তবে সেক্ষেত্রে সেই বিরল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়কারীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে এইভাবে—

এতকালে এত খেনু, বেগুন পোড়ায় হাড় পেনু।

নিজের স্বার্থকে অবিকৃত রেখে তবেই মানুষ অন্যের কাজে ব্রতী হয়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

খাবার বেগুন আর বেচবার বেগুন।

বিক্রেতা নিজের খাবার জন্য যে বেগুনগুলি সরিয়ে রাখবে তা স্বভাবতঃই বিক্রয়ের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হবে, এই বাস্তব বুদ্ধির কথাই এখানে প্রকাশিত। নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে নিকৃষ্ট বস্তুর ভাল মিল বোঝাতে বলা হয়—

যার সঙ্গে যেমন, শুঁটকি মাছ আর বাইগন।

বেগুন গাছ দৈর্ঘ্যে খুবই ছোট হয়, তাই তাতে আর আঁকশি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবু যদি কেউ আঁকশির সাহায্যে বেগুন পাড়তে চায় তবে তা হাস্যকর আচরণ বলে বিবেচিত হয়, অপ্রয়োজনে অহেতুক প্রয়াস নিয়োগের কারণে। প্রবাদের ভাষায় একেই বলা হয়েছে—

বেগুন গাছে আঁকশি দেওয়া।

মূলো শীতকালের ফসল। ফলার পর ক্ষেত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, কিন্তু বেগুন মূলতঃ শীতকালের ফসল হলেও সম্বৎসরই তা কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাই বেগুনের ক্ষেত অধিকতর লাভজনক। প্রবাদে এই বিষয়কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

বেগুন ক্ষেত আর মূলো ক্ষেত।

মূলো গাছ একেবারে উৎপাটন করে তবে ফল সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু বেগুন গাছকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখে বাড়িয়ে তুলে তার ফল লাভ করার প্রয়োজন হয়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

এত মূলোবাড়ী নয়, এ যে বেগুনবাড়ী।

বেগুন সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. অবাক করলে বেগুনে,
ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।

খ. নিত্য চাষার ঝি,
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কি ?

গ. কায়েতের হাড়া বেগুনের খাড়া।

ঘ. আঁটকুড়ে বেগুন, আর দরবেশে খদ্দের।

ঙ. বেগুন তোর পোঁদ কেন খাড়া, না মোর বংশাবলীর ধারা।

চ. ডাল নেই বেগুন ভাজা খায়, বউ নেই শ্বশুর বাড়ী যায়।

ছ. ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে।

বেগুনের পর আসা যাক লাউয়ের প্রসঙ্গে। লাউয়ের বৈশিষ্ট্য হল এটি পাকলে সমস্তটাই একসঙ্গে পাকে, এর ব্যতিক্রমে বোঝায় অস্বাভাবিকতা। তেমনি একটি পরিবারের সদস্যদের সচরাচর একইরূপে লক্ষিত হয়—

এক লাউয়ের বিচি—কেউবা করে কচর মচর, কেউবা আছে কচি।

'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি' অর্থে প্রচলিত অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।

সহজ কাজ করতে প্রস্তুত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত দুরূহ কাজকে এড়িয়ে যেতে চায় আর এই প্রসঙ্গে বলা হয়—

ওউ কুটতে বউ দড়ো, লাউ কুটতে বউ পাতাল গেল।

এখানে 'ওউ' বলতে বেগুনকে বোঝান হয়েছে। লাউ কোটা সহজ ব্যাপার। তাই নিষ্কর্মা বা কুঁড়ে বউকে লাউ কুটতে শুধু উৎসাহীই নয়, বেশ দড় দেখা যায়। আসলে কঠিন কাজের পরিবর্তে সহজ কাজে উদ্যোগীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদ—

অকর্মা বউড়ি বড়ো, লাউ কুটতে বিষম দড়ো।

অন্য একটি প্রবাদেও অন্য কাজে তেমন যে পারদর্শী নয়, তাকে লাউ কুটতে উদ্যোগী হবার কথা বলা হয়েছে—

আর কাজে নয়কো দড়, লাউ কুটতে ফালা দেন।

অনুমানের ওপর নির্ভর করে কার্যে ব্রতী হলে বলা হয়—

অন্ধকারে লাউ কোটা।

স্বার্থপর ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে বিপরীত কথা বোঝাতে সচেষ্ট হয়, আর সেই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় যে প্রবাদটি তা হল—

খর-কোটা বউ চালতা, মাটো-কোটা বউ লাউ,
তুমি কোটো বউ চালতা আমি কুটি বউ লাউ।

লাউয়ের তুলনায় চালতা কোটা কঠিন, কিন্তু বউকে তার গুরুজনস্থানীয় একজন বুঝিয়েছেন যে চালতা কোটা লাউ কোটার তুলনায় সহজতর। অতএব বধূ যেন চালতা কোটাতে মনোনিবেশ করে। হায়, আজকের দিনে এমন বধূ আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ!

চৈত্রমাসে প্রচুর লাউ ফলে, তাই তা আর একটি দুটি হিসাবে বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হয় থোক দরে। কারণ প্রাচুর্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ঘটায়।

চৈতের লাউ থোক বিক্রি।

প্রার্থীকে বিমুখ করার কৌশল বর্ণিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

ঢলা ঢলা লাউয়ের পাতা।
না, তোমার ভাইয়ের গণা গাঁথা॥

পরিত্যক্ত অথবা সহজলভ্য জিনিষ সংগ্রহে কোন প্রশংসা জোটেনা, বরং জোটে নিন্দা, জোটে বিরূপ সমালোচনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি লক্ষ্য করার—

হাটে বিকায়না যে লাউ
তারে এনেছে নন্দা সাউ।

লাউ সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. ঝোলের লাউ, অম্বলের কাদু।
খ. ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ।
গ. লাউয়ের নামই কদু, ঘাড়ের নামই গর্দান।

লাউয়ের পর স্বভাবতঃই যে আনাজটির কথা মনে আসে, সেটি হল কুষ্মাণ্ড বা কুমড়ো। যে কুমড়ো অসময়ে জন্মায়, তাকে বলা হয়—

অকাল কুষ্মাণ্ড।

অসময়ে হওয়া কুমড়ো ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তিটি নির্গুণ, কোন কাজেই লাগেনা তার ক্ষেত্রে এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি প্রযুক্ত হয়। যে বিষয়ের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, সেই রকম সংস্রবহীন বিষয়ের

সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কল্পনা প্রসঙ্গে বলা হয়—

চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মার গলগণ্ড।

বলিদানের কুমড়ো রান্না হয় না, সেজন্য অকর্মণ্য ব্যক্তি যে কোন কাজে লাগে না, তার প্রসঙ্গে বলা হয়—

দায়ে কাটা কুমড়ো যেন।

লক্ষ্মীশ্রীর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে কথিত হয়—

চাল ভরা কুমড়ো পাতা, লক্ষ্মী বলেন আমি তথা।

অকল্পনীয় ভাবে কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ কোণ গুণের অধিকারী হয়, তবে আমাদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকেনা, যেমন থাকেনা সরষের মধ্যে তেলের অবস্থান দেখে—

লাউ থাকতে কুমড়ো থাকতে সরষের মধ্যে তেল।

বাইরের সাজসজ্জা যে কাউকে মহত্ব দান করেনা, সেই সত্য প্রকাশ পেয়েছে একটি প্রবাদে এই ভাবে—

ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, চাল কুমড়ো কেন বাকি রয়?

পটোল একটি অতি প্রয়োজনীয় তরকারি। কয়েকটি প্রবাদে পটোলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। একটি প্রবাদে এর দ্রব্যগুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

কয়া, পিত্ত, বাই, তিন নাশে পটোল ভাই।

কোন ভোজ্যটি কি অবস্থায় খেতে হয়, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

উচ্ছের কচি, পটোলের বিচি,
ছাগের ছা, মাছের মা—এইগুলো বেছে খা।

অর্থাৎ কচি অবস্থায় খেতে হয় উচ্ছে, কিন্তু পটোলের পুরুষ্ট বিচি না হলে পটোল উপাদেয় হয় না।

অন্য একটি প্রবাদে এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে—

উচ্ছে খাবে কচি, পটোলের খাবে বিচি।

দরিদ্রের বড়লোকি ইচ্ছাকে এবং আচরণকে বিদ্রূপ করা হয়েছে একটি প্রবাদে এই ভাবে—

ভাত পায়না শেখের বেটা, পটোল ভাজা খায়।

ঝিঙে নিয়েও কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে।

বর্তমানে কিছু না করে ভবিষ্যতে কিছু উপকার করার আশা দিয়ে তুষ্ট করলে বলা হয়—

থাকরে মন সয়ে, কার্তিক মাসে ভাত খাবি তুই ঝিঙের ঝোল দিয়ে।

মিথ্যাচারিতাকে সমালোচনা করতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ভাজে ঝিঙে তো বলে পটোল।

একদিনের অর্থহীন আড়ম্বরানুষ্ঠান দীর্ঘদিনের অভাবকে আহ্বান করে আনে বলতে বলা হয়েছে—

একদিন করে মজা, ছ মাস খায় ঝিঙে ভাজা।

ঝিঙেকে নিয়ে রচিত আর একটি প্রবাদ—

নিধের মায়ের চালে ঝিঙে, বউকে মেরে বাজায় শিঙে।

মূলো সংক্রান্ত একটি প্রবাদে, ভবিতব্য মানুষকে যে তার অজ্ঞাতসারেই পরিচালিত করে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

খেয়ে দেয়ে যায় শুতে, বিধাতা নিয়ে যায় মূলো চুরি করাতে।

কুকর্মের যে কুফল ভোগ করতে হয়, সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে।

গুণহীন অথচ প্রিয়দর্শন ব্যক্তি বোঝাতে বলা হয়—

রাঙা মূলো।

আভিজাত্য প্রকাশের কৃত্রিম প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করতে বলা হয়েছে একটি প্রবাদে—

বার বাড়ীতে বসে শুনি সম্বরার ঠাট,
ভিতর বাড়ী গিয়ে দেখি মূলো চচ্চড়ি ভাত।

প্রতিকূল কারণে মনের ইচ্ছা অনেক সময়ই আর বাস্তবায়িত হয় না, সেই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে—

খেতে আনলাম মূলো
পোঁদে হলো শূলো॥

এখানে 'শূলো' বলতে শূল বেদনার কথা বলা হয়েছে।

পরিণতির পূর্বাভাস প্রসঙ্গে একটিতে বলা হয়েছে—

উঠন্তি মূলো, পত্তনেই চেনা যায়।

মূলো সংক্রান্ত আর একটি প্রাবাদ—

শাক কে শাক, উপরি মূলো।

উচ্ছে এবং করলাও প্রবাদের রাজ্য থেকে বাদ পড়েনি। দুইই তেতো, তাই এ দুটিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, নিন্দা অর্থেই এদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। বংশগত দোষ সমস্ত পরিজনদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, একটি প্রবাদের বক্তব্য তাই—

ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তিতো তার।

পেটুকের মিথ্যা বিনয়কে ব্যঙ্গ করে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে--

খাবোনা, খাবোনা, অনিচ্ছে, এক কাঠা চাল একটা উচ্ছে।

পটোলের প্রসঙ্গেই আমরা একাধিকবার উচ্ছের উল্লেখ আগেই করেছি। কচি অবস্থায় উচ্ছে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রবাদে—

উচ্ছে খাবে কচি, পটোলের খাবে বিচি।

মন্দের ওপর মন্দ বোঝাতে বলা হয়—

অদৃষ্টে করলা ভাতে, বিচি কচ্‌কচ্‌ করে তাতে,
পড়ল বিচি বুড়োর পাতে।

কচু, ওল, মান—এগুলি নিকৃষ্ট ধরণের তরকারি হলেও প্রবাদে কিন্তু এদের বেশ আধিপত্য, অবশ্যই কোনটির কপালেই প্রশংসা জোটেনি লক্ষ্য করা যায়।

কচু যে পুঁই প্রভৃতির মত আমাশা রোগের কারণ, একটি প্রবাদে সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

পুঁই, কচু ঘেসো, তিন আমাশার মেসো।

একই জাতীয় হীন বস্তু বা ব্যক্তিদের মধ্যে তেমন কোনো ইতর বিশেষ পার্থক্য থাকেনা বোঝাতে বলা হয়—

ওল কচু মান—তিনই সমান।

বলাবাহুল্য, ওল কচু ও মানের আকৃতিতে কিছু প্রভেদ থাকলেও তিনটিরই প্রকৃতিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

হীন ব্যক্তির অধিক উন্নতি অসম্ভব বোঝাতে বলা হয়—

কচুর বেটা ঘেঁচু বড়ো বাড়েন তো মান।

দোষী ব্যক্তি যখন অন্যের ছিদ্রান্বেষণে রত হয় তখন বলা হয়—

ওল বলে, মানকচু ভায়া তুমি নাকি লাগ্।

ওল খেলেও গলা কুটকুট করে, মানকচুতেও সেই একই প্রতিক্রিয়া হয়, অথচ ওল মানকচুর সমালোচনায় নির্লজ্জ ভাবে প্রবৃত্ত হয়েছে এখানে।

ওল খেয়ে গলা কুটকুট করলে প্রতিষেধক হিসাবে টক খেতে হয়। একটি

প্রবাদে বলা হয়েছে—

ওল খেয়ে করেছি গোল, ঠাকুরঝি তুই তেঁতুল গোল।

ওল, কচু সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু।

খ. লুভল বামুন কচু খেয়ে, আবার এল কোদাল লয়ে।

গ. ওলে আর ঘোলে, প্রত্যয় যেওনা রমণীর বোলে।

ঘ. ওল ধরেছে নিজ গুণ।

ঙ. কচু পোড়া খাওয়া।

চ. মা জানে না কচু পাতা কুটতে, ঝি চায় লবণী রাঁধতে।

ছ. এক তোলো কচুশাক, একতোলা পানি।
বাপে পুতে সলা করে পেয়েছ রাঁধুনী।

জ. ভাদ্র মাসে কচুর লতি, বুড়া হলে সবাই সতী।

ঝ. কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত।

ঞ. কচুর নামেই গলা চুলকোয়।

ট. ওল খেয়ে গোল।

ঠ. চোদ্দশাকের মধ্যে ওল পরামানিক।

কলার থোড় ব্যঞ্জন হিসাবে খুব আদর্শের বা উচ্চাঙ্গের না হতে পারে, কিন্তু গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে এটি খুবই পরিচিত। বিশেষতঃ দুঃস্থ মানুষের কাছে। বাড়ীতে কুটুম এলে তাকে ভাল-মন্দ খাওয়ানো রীতি। সেক্ষেত্রে তার পাতে যদি থোড়ের ব্যঞ্জন দেওয়া হয়, তবে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে বিসদৃশ দাঁড়ায়। একটি প্রবাদে এমন এক আত্মীয়ের করুণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

আদরের কুটুম থোড়ের ব্যঞ্জন, না-না করতে পাতে ঢালন।

স্পষ্টতঃই আত্মীয়কে বিতাড়িত করার এটা যে নিপুণ চক্রান্ত তা বেশ বোঝা যায়।

কড়াইশুঁটি মূল্যবান এবং উপাদেয় তরকারি, কিন্তু প্রবাদে তার ঠাঁই মিলেছে যৎসামান্য, তাও আবার তাকে মোটেই গৌরবের আসন দেওয়া হয়নি। ঝগড়াটের সাথে কড়াইশুঁটির তুলনা করা হয়েছে—

কুঁদুলে কড়াইশুটি, চুলে নেইকো দড়ির ঝুঁটি।

ডুমুরের মত নগণ্য বস্তুও প্রবাদে স্থান পেয়েছে। অপদার্থ বস্তু যে সহজেই বিনষ্ট হয় সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

এই ডুমুর গুমর করে, পাকলে ডুমুর খসে পড়ে।

অসম্ভব প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করতে বলা হয়—

টিকটিকি হয়ে ডুমুর গিলতে যাওয়া।

কচুর মুখীকে নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মামীর মা বড় সুখী, পান্তা ভাতে কচুর মুখী।

স্পষ্টতঃই এখানে মামীর মার ভাগ্য নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে।

কাঁচকলাকে নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে এক দোষীর অন্য দোষীর সমালোচনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোমার বড় খোসা।

শূন্যতা বা নৈপুণ্যের অভাব বোঝাতে অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

লেখাপড়ায় কাঁচকলা, তবুও ত টাকাওয়ালা।

কাঁচকলা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ, কাঁচকলাটা ভাতে দিস্।

খ. নুন লঙ্কা দিয়ে ভাত খাই, বেরালকে কাঁচকলা দেখাই।

গ. যেমন মতি, তেমন গতি, কাঁচকলাটা ভগবতী।

ঘ. আদায়—কাঁচকলায়।

ঙ. কাক এলে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।

এ পর্যন্ত গেল সবজি সংক্রান্ত আলোচনা। আর এই আলোচনায় দেখা গেল অভিজাত বহু সবজিই প্রবাদে বাদ গেছে—যেমন আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, লেট্যুস, শালগম, বিন, টমাটো, চিচিঙ্গে এবং আরও অন্যান্য তরি-তরকারি। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এই বাদ যাওয়ার পেছনে কোন মানসিকতা কাজ করেছে।

আমাদের অনুমান যদিও বাংলাদেশে নানা সবজি ফলে, তবু বাংলাদেশের দুঃস্থ মানুষদের অধিকাংশ এসব সবজির দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত। আর্থিক অসচ্ছলতাই এর কারণ। প্রবাদগুলি রচিত হয়েছে গ্রামের সংহত সমাজের দ্বারা। তাই তারা নিত্যদিন যেসব আনাজ ব্যবহারে অভ্যস্ত, যেমন ওল, কচু, মান, কচুরমুখী, কাঁচকলা, থোড়, লাউ ইত্যাদিকেই বেশি করে প্রবাদে স্থান দিয়েছেন।

সবজির পর শাকের প্রসঙ্গ প্রবাদে কিভাবে কতখানি এসেছে দেখা যাক। বাংলা দেশে বহু রকমের শাক হয়। গরীব-দুঃস্থ মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে

শাক পাতার ওপরেই নির্ভর করতে হয় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য।

রাজার রাজ্যপাট, গরীবের শাক ভাত।

তাই বাংলা প্রবাদে শাকের উল্লেখ অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বিশেষ বিশেষ শাকের প্রসঙ্গে আসার আগে সাধারণভাবে শাক সম্পর্কে প্রবাদে কি ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, তার কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। কারো সুখের ওপর সুখ, বিপরীত ক্রমে কারো দুঃখের ওপর দুঃখ—এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে একটি প্রবাদে এইভাবে—

কারও দুধে চিনি, কারও শাকে বালি।

মানুষ নিজেদের অবস্থা অনুযায়ীই ব্যবস্থা করে। তাছাড়া ধনীরা একত্রিত হলে যেখানে মাংস ভক্ষণ করে, গরীবেরা সেক্ষেত্রে শাক সিদ্ধ করে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে—

গেরস্তে গেরস্তে মেলা, খাসি কেটে ফেলা,
গরীবে গরীবে মেলা, শাক সিজিয়ে গেলা।

একটি প্রবাদে শাক ভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলা হয়েছে—

দুধে কান্তি, ঘিয়ে বল, শাক পাতাড়ে বাড়ায় মল।

একটি প্রবাদে কোষ্টা শাককে ভাতের দ্বিগুণ বলা হয়েছে। অনুমিত হয় ভাতের সংস্থান করতে অসমর্থ হতভাগ্য ব্যক্তি সুলভ কোষ্টা শাকের খাদ্য গুণ অধিক চিন্তা করে অন্ততঃ সাময়িক তৃপ্তি পেতে চেয়েছে এই ভাবে—

ভাতের দ্বিগুণ কোষ্টা শাক।

দরিদ্রের ধনী হবার ব্যর্থ প্রয়াসকে উদ্দেশ করে রচিত হয়েছে—

খেতে পায়না শাক সজিনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন্‌না।

লোভী ব্যক্তিকে সামান্য প্রশ্রয় দিলে তার লোভ বেড়ে যায়, একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কাঙালীকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই।

বেগার ঠেলা কাজ বোঝাতে একটি প্রবাদে বড়ো সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে ভাদ্দর বউয়ের প্রতিক্রিয়া—

ভাসুর মেগেছে ভাত, সেই চেষ্টায় আছি,
সকাল বেলায় তুলে শাক সন্ধ্যেবেলায় বাছি।

মহা বিপর্যয় ঘটানো অর্থে বলা হয়—

শাকে মাছে এক করা।

অনিবার্যতা বোঝাতে যে প্রবাদটির প্রচলন—

শাকের বালি আর অন্তরের কালি।

শাক সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. শাক শাক শাক
তবু মিনসে করে রাগ।

খ. শাকে এত নাড়া,
ভাল হলে ভাঙত হাঁড়ি, ভাসত পাড়া পাড়া।

গ. শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, ভুতুড়িতেও আছেন।

ঘ. শাকে ভাতে ছিলাম ভাল, মাছ কিনে জ্বালা হল।

ঙ. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

চ. গব্য থাকলে আগে পাছে, কি করবে শাকে মাছে।

এইবার বিভিন্ন শাকের উল্লেখ কেমন ঘটেছে দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় পুঁই শাকের কথা। কারণ প্রবাদে পুঁইশাককেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে—

শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই, মানুষের মধ্যে মুই।

অতএব এ হেন পুঁইশাক যদি কেউ পরের চালে তোলে, তবে তাকে 'আহাম্মক' বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ লোভনীয় পুঁইশাক যার মাচায় থাকে, সেই তা ভোগ করে ইচ্ছামত। তাই প্রবাদে বলা হয়েছে—

আহাম্মক তুই, যে পরের চালে তোলে পুঁই।

অবশ্য যতই কেন পুঁইকে শ্রেষ্ঠ শাক বলা হোক, তবু তা যে প্রথম শ্রেণীর ভোজ্যোপকরণ নয়, তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে একটি প্রবাদে—

আপনার বেলা কাঁঠালে আর ক্ষীরে,
ঠাকরুণ খায় পুঁইডাঁটা আলুনি,
তায় ভাঙা পাতরে বেড়ে।

একটি প্রবাদে আবার বন পুঁইশাকের প্রসঙ্গ এসেছে—

যেমন নেড়া তেমনি নেড়ী, বন পুঁইশাক ছড়া হাঁড়ি।

নিকৃষ্ট বস্তু যে অনায়াসে অন্যকে দান করা যায় সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

টক পালঙের শাক, দুভাগ করে রাখ।

কলমীলতা একাধিক প্রবাদেই উল্লিখিত হয়েছে। স্ত্রীলোক স্বামী পুত্রাদির ওপরই নির্ভরশীল, আশ্রয়দাতার অভাবে তার কিরকম দুরবস্থা ঘটে সেই সম্পর্কে

বলা হয়েছে—

ওগো ও কলমীলতা, জল শুখালে থাকবি কোথা?

কলমী শাক বহুদূর পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, অনুরূপভাবে যে পরিবারের নানাস্থানে বহু আত্মীয়-স্বজন আছে, সেই পরিবারের প্রসঙ্গে বলা হয়—

কলমীর ঝাড়।

হতভাগ্য চাষার যে একান্ত নির্ভরতা কলমীলতার ওপর, একটি প্রবাদে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

চাষার কুটুম কলমীলতা।

সজনে শাককে নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে টানাটানির সময়ে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে—

সজনে শাক বলে, আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

দরিদ্রের ধনবান পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষাকে পরিহাস করা হয়েছে এইভাবে একটি প্রবাদে—

সজনে শাকে নুন জোটেনা, মশুর ডালে ঘি।

ধনী সাজার অপপ্রয়াসকে অন্যত্রও ব্যঙ্গ করতে দেখা গেছে—

ঘরে শুধু শাক-সজনা, বাইরে তবু বাবুয়ানা।

উৎকৃষ্ট জিনিস সব সময়েই সুলভ—এবং তা সব সময়ে পাওয়া যায় না, অথচ নিকৃষ্ট জিনিস সব সময়েই সুলভ—একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নটে শাক আর সজনে শাকের কথা—

নটে খেটে আড়ায়ে, সজনে বারো মেসে।

অর্থাৎ নটে শাক মাত্র আড়াই মাস স্থায়ী হয়, কিন্তু সজনে শাক বারো মাসই সুলভ। অন্যত্রও নটে শাকের স্থায়িত্ব যে অল্প সে সম্পর্কে বলা হয়েছে—

নটের বৃদ্ধি হোক না যত, থাকবে না দুই ঘড়ি।

অন্যের সর্বনাশ করার জন্য দুর্বুদ্ধি দানের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে একটি প্রবাদ—

আমার বুদ্ধি শোন, ঘর দোর সব ফেলে দিয়ে নটে শাক বোন।

অমন যে বেথো শাক তা নিয়েও রচিত হয়েছে প্রবাদ—

লাজ নেই তোর বেথো শাকে,
নুন তেল নেই কেমন লাগে।

নালতে শাকও প্রবাদে স্থান করে নিয়েছে—

ক. কোন বা সুখের রাঁড়ী
তায় নালতা শাকে বড়ি।

খ. বড় সম্বন্ধে দাদা, তায় নালতে শাকে আদা।

গ. ছ' মাস আগে বন্ধুর নিতা, লালতা শাকে গিমা তিতা।

এবারে পলতা শাকের প্রসঙ্গ—

শুধু পলতা পায়না, ধনে-পলতা চায়।

আশা যখন নিরাশায় পরিণত হয় তখন বলা হয়—

শুসনি শাক রেঁধে হল মনে বড় খুশী
দৈবজ্ঞ এসে বলে আজ একাদশী।

অর্থাৎ শুসনি শাকও প্রবাদের বিষয় হয়েছে। শুধু শুসনি নয়, পাট শাকও বাদ যায়নি—

কি শাক রেঁধেছিল খেঁদী, পাটশাকের ঝোল।
খেঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি পাড়ায় গণ্ডগোল॥

কিংবা, যেমন পাগলা, তেমনি পাগলী,
পাটের শাক আর ভাঙ্গা লাকড়ি।

ঢেড়ো শাক এবং কচুশাকও বাংলা প্রবাদের বিষয় হয়েছে দেখা যায়—

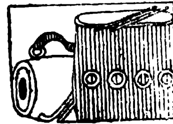
ক. ঢেড়ো শাক সিজাব কত, হাবা ভাতারকে বোঝাব কত?

খ. তেরি মেরি বাঙালী, কচুশাকের কাঙালী।

সবজির তুলনায় শাকের বৈচিত্র্য প্রবাদে বেশি ধরা পড়েছে। বাঙ্গালী প্রকৃতিতে শাকাহারী, এ সত্য এর থেকে যত না প্রতিপন্ন হয়, তার থেকে বেশি প্রতিপন্ন হয় বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতি যা বাঙ্গালীকে অধিক পরিমাণে শাকাহারী করেছে। ব্যঞ্জন বলতে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে শাকই প্রধান, এ নির্মম সত্য স্বাধীনতা লাভের তিন দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও অনস্বীকার্য।

বাংলা প্রবাদে বাজনা-বাদ্যি

উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালী; আমাদের বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। আমাদের কবিও গেয়েছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা'। আমাদের পূজা-পার্বণ-উৎসব মানেই বাজনা-বাদ্যির সমারোহ। কত বিচিত্র ধরণের বাজনারই না সমারোহ এখানে। আছে ঢাক, আছে ঢোল আর তার সঙ্গে কাঁসি, আছে সানাই, মৃদঙ্গ, শাঁখ, ঘণ্টা। এসবই বাংলার নিজস্ব সব বাদ্যযন্ত্র। বাজনার শব্দ আমাদের জানিয়ে দেয় উৎসবের অস্তিত্বের কথা। শুধু পূজা পার্বণেই নয়, আমাদের প্রায় সব ক'টি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও বাজনার গভীর সম্পর্ক। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন—এসবেতে বাজনা অপরিহার্য। অবশ্য দিনকালের পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালীর রুচিও পরিবর্তিত হচ্ছে, বাজনার ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তিত রুচির প্রতিফলন ঘটছে। সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত প্রবাদগুলিতে স্বভাবতঃই আমরা এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় পাই না। সে যাই হোক, দীর্ঘদিনের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে রচিত প্রবাদগুলিতে আমরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বাঙ্গালীর মানসিকতা, বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের জনপ্রিয়তা এবং সেগুলির সঙ্গে লোক চরিত্রের সাযুজ্যের যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।



মহাপ্রভুর সুবাদে বাংলাদেশে নাম সংকীর্তনের সূত্রপাত। কীর্তন গানে মৃদঙ্গের সঙ্গত অনিবার্য। কিন্তু কীর্তন গান খুব জমে ওঠার সময় যদি মৃদঙ্গ ভেঙ্গে যায়, স্বভাবতঃই তাতে কীর্তনের যেন অনেকখানি অঙ্গহানি ঘটে। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে, 'ভরা কীর্তনে মৃদঙ্গ ভাঙ্গা'।

আসলে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যখন পুরোদমে চলতে থাকে, সেই সময় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন উল্লেখযোগ্য উপাদান যদি বিকল হয়ে পড়ে

কাজের অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তখন যে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হয় তা বোঝাতেই প্রবাদটির উৎপত্তি। মৃদঙ্গকে নিয়ে আর একটি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যার অর্থ 'সোনায় সোহাগা'। প্রবাদটি হ'ল—একে ত নাচুনী কালী, তাতে মৃদঙ্গের তালি।

বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাদ্যযন্ত্র হল যথাক্রমে ঢাক আর ঢোল। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই দুটি বাদ্যযন্ত্রকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রবাদ। যেমন—

কালা শুনে কাড়ার বাদ্যি
বলে আমার বিয়ের বাদ্যি।

বিবাহে বাজনা না হলেই নয়, আসলে সব শুভ কাজের সঙ্গেই বাজনার যোগ. বাজনার শব্দে পাড়া প্রতিবেশী, দূরস্থিত মানুষজন বুঝতে পারে কোন শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের গৃহে। অকারণে কোন কাজ করা বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঢাকে ঢোলে বিয়ে তার উলু দিতে বাধা।

কিংবা, ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাস্তে বাঁধা দিয়ে।

এক্ষেত্রে অর্থহীন অপচয় বোঝাতে এই প্রবাদটির উৎপত্তি।

যা সত্য তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়—কোন কিছুই শেষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। তাই বলা হয়েছে, 'ধর্মের ঢাক আপনি বাজে'।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে, ধর্মের ঢাকে কাঠি দেওয়া।

পুরোদমে কীর্তন চলাকালীন অবস্থায় মৃদঙ্গ ভেঙ্গে গেলে যেমন কীর্তন গানের রসহানি ঘটে, ঠিক তেমনি গাজনের সময় যদি ঢাক ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তখনও খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় গাজনের সন্ন্যাসীদের। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে—

ভরা গাজনে ঢাক ছেঁড়া।

ঢাকের শব্দ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বহুদূর থেকেই তা শ্রুতিগোচর হয়, সে তুলনায় অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র বিশেষত 'টেমটেমি'-র শব্দ প্রায় কানেই লাগেনা। ঢাকের শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে তাই বলা হয়েছে :

চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা, ঢাকের কাছে টেমটেমি।

অর্থাৎ চাঁদ যেমন আলোর রাজ্যে, তেমনি বাজনার রাজ্যে ঢাক।

যেহেতু চড়কের সঙ্গে ঢাকের সম্পর্ক নিবিড়, তাই গাজনের সন্ন্যাসীর ঢাকের শব্দে কিরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা বোঝাতে বলা হয়েছে—

চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে
পিঠফোঁড়া সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকোয়।

মনস্তত্ত্বের 'Laws of Association' এরই সার্থক প্রমাণ এখানে বিধৃত। বাসনা, প্রয়োজন এবং সর্বোপরি প্রয়াসের ওপরই নির্ভর করে ফললাভ। একটি প্রবাদে এই সত্যটি বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—

যার যেমন কামনা, তেমনি ঢাকী বাজনা।

যে কাজটি গোপনে করা প্রয়োজন, তা যদি পাড়া জানিয়ে করা হয়, তবে ফললাভ যে আশানুরূপ হয় না, তা বোঝাতে বলা হয়েছে—

ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা।

কাড়া নাকাড়া বা চড়চড়ি কিংবা ধামসার দুটি পিঠই বাজাবার সময় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঢাকের বেলায় যে দিকটি বাজান হয়, তার বিপরীত দিকটি অব্যবহৃত থেকে যায়। তাই কাজের লোকের সঙ্গে অকাজের লোকের সান্নিধ্য ঘটলে বলা হয়—

ঢাকের পিঠে বাঁয়া।

উপলক্ষ্য যদি মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার ফলে লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায়, তবে তার পরিণাম মোটেই শুভ হয় না। মনসা পূজায় ঢাকের তেমন প্রয়োজন নেই, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরের তাগিদে আয়োজনকারী যদি ঢাকী-ঢুলীকে আহ্বান জানায়, দেখা যাবে পরিণামে হয়ত খোদ মনসা ঠাকুরকেই বিক্রী করে দিতে হল বিক্রয়লব্ধ অর্থে ঢাকী ঢুলীদের পারিশ্রমিক মেটাতে। প্রবাদের ভাষায়—

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকায়।

যা ত্যাগ করার কথা নয়, মুগ্ধতা বা মূঢ়তা বশতঃ যদি তাকেও ত্যাগ করা হয়, তবে পরবর্তীকালে সেজন্য অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। পূজায় ঢাকী ঢুলীর আনা হয় বাজনা বাজাবার জন্য। পূজা শেষে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার রীতি, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি ঢাকীকেও বিসর্জন দেওয়া হয়, তবে সেজন্য আয়োজককেই তার পরিণাম ভোগ করতে হয় স্বাভাবিক কারণে। এতদসম্পর্কিত প্রবাদটি খুবই পরিচিত—

ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন।

প্রতিকূলতা কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন কেউ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার অভ্যস্ত কাজ থেকে সরে গিয়ে অনভ্যস্ত কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখনই বলা হয়—

ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত।

নাসিকার সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিরা কত সব অনবদ্য অলঙ্কারের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু নাসিকাকে উপমেয় করে ঢাককে উপমান করার কথা একমাত্র প্রবাদের স্রষ্টাদের মাথাতেই এসে থাকবে।

ঢাকের মতন নাকের গড়ন।

এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য নাসিকার সৌন্দর্য হানি বোঝাতেই এবংবিধ উপমানের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যে ঢাক এবং ঢাকের শব্দ আমাদের এত পরিচিত এবং জনপ্রিয়, একাধিক প্রবাদেই কিন্তু তার সম্পর্কে বিদ্রূপ করা হয়েছে, শ্লেষ করা হয়েছে তীব্রভাবে। বলা হয়েছে ঢাকের শব্দ যত না মধুর, তদপেক্ষা অনেক বেশি মাধুর্য এবং স্তব্ধতায়—

ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।

ঢাক নিয়ে আরও কয়েকটি প্রবাদ হল—

ক. ঢাক ঢোল বেজে গেল কুলোর ডুগডুগি।

খ. ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

—কোথায় ঢাকীর ভূমিকায় ছিল ব্যক্তিটি, সে জায়গায় পাঠকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাও যে সে বিষয়ে পাঠ নয়, একেবারে চণ্ডীপাঠ। অতি সাধারণ কর্ম থেকে অ-সাধারণ কর্মে প্রবৃত্ত হলে এই ধরণের প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

গ. ঢাক থো, পাছাড় লাগ।

ঘ. কালা বলে হাত পা নাড়ে ঢাকী তো বাজায় না।

এক্ষেত্রে কালা ব্যক্তি সত্য সত্যই ঢাকের শব্দ শুনতে না পেয়ে এই ধরণের মন্তব্য করে, নাকি ঢাকের শব্দে ইতিমধ্যেই ক্ষুব্ধ প্রতিবেশীদের ওপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে তার এই ধরণের রসিকতা, সে সম্পর্কে কিন্তু এককথায় বলা সম্ভব নয়!

ঙ. ঢাক বাজানী।

ঢাকের পরই ঢোলের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই এসে পড়ে।

কোনো গোপন তথ্য সর্বসমক্ষে ফাঁস করলে বলা হয়—

হাটের মাঝে ঢোল পেটা।

ঢোলের শব্দ যেমন বহুদূর থেকে শোনা যায়, তেমনি হাটের মাঝখানে বা বহুজনের সামনে কোনও গোপন কথা বললে নিমেষে তা বহুজনের কানে চলে যায়, তার আর কোনো গোপনীয়তা থাকে না।

কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিত কোন বিষয়কে বোঝাতে প্রবাদে বলা হয়েছে—

এক গাঁয়ে ঢোল বাজে, আর গাঁয়ে বিয়ে।

প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারে মানুষ সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে লাভ করতে পারে। সেই কারণে বলা হয়—

গলায়ে পড়েছে ঢোল, বাজালে সিদ্ধি।

ঢাকের মতন ঢোলেরও বাঁ দিকটি একেবারে অব্যবহৃত না থাকলেও তুলনামূলক ভাবে ডানদিক অপেক্ষা অনেক কমই ব্যবহৃত হয়। অন্ততঃপক্ষে বাঁদিকে ঢুলীর কাঠির সাহায্য নিতে হয় না। অথচ বাঁ দিকটি যদি ফুটো থাকে তাহলেও ঢোল বাজেনা। এই কারণে যার তেমন প্রয়োজন নেই, অথচ উপস্থিতি না হলেও চলেনা, সেক্ষেত্রে বলা হয়—

ঢোলের পাছে ফাঁকি।

ঢোল হোক আর ঢাকই হোক, সঙ্গে কাঁসি না থাকলেই নয়। ক্ষুদ্র অথচ অনিবার্য এমন যা, তার প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয় তাই এই প্রবাদটি—

ঢোলের পাছে কাঁসি।

ঢোলের তীক্ষ্ণ শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শ্রুতিগম্য, বৃহৎ পুষ্করিণী বোঝাতে তাই বলা হয়—

'ঢোল সমুদ্র'।

বাংলার বার ভুঁইয়াদের অন্যতম কেদার রায়ের দীঘির এই নাম ছিল। কারণ দীঘিটির একপারে ঢোল বাজালে অন্যপারে নাকি তার শব্দ অশ্রুত থাকত, দীঘিটি ছিল এতই বিশাল।

প্রয়োজনে উপযুক্ত দায়িত্ব পালন না করে অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত দায়িত্ব বোধের পরিচয় দান স্বভাবতঃই মানুষের কাছে সমালোচিত হয়ে থাকে। প্রবাদের ভাষায় বলতে গেলে—

দুর্গা পুজায় শাঁখ বাজেনা ষষ্ঠী পূজায় ঢোল।

কিংবা অন্য একটি প্রবাদের ভাষায়:

ঘেঁটু পুজোতে ঢোল সানাই

বেদেরা বিভিন্ন প্রকার আকর্ষণীয় খেলা দেখিয়ে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। সঙ্গে থাকে তাদের ঢোল, শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য। বৃষ্টি বাদলার সময় স্বভাবতঃই তাদের পক্ষে খেলা দেখানো সম্ভব হয় না, তখন তারা তাদের তাঁবুতে অবস্থানকালে অকারণেই ঢোল বাজিয়ে অবকাশ যাপন করে—

আমরা বেদের জাত, মাঠে ফেলি টোল,
বৃষ্টি বাদল হলে পরে বসে বাজাই ঢোল॥

ঢোলের বাজনা যতই পরিচিত হোক, তবু ঢাকের মত তার শব্দেরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে, ধ্বনি মাধুর্যকে স্বীকার করা হয়নি। বলা হয়েছে,

ঢোল বাজে পোঁদ ফাটে, লোকে বলে বিয়ে।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা হয়ত এর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পেতে পারেন।

ঢোল নিয়ে রচিত অপর দুটি প্রবাদ হল—

ক. ভাঙা ঢোল, তালকানা যন্ত্রী, শনি রাজা কুঁজ মন্ত্রী।
খ. ঢোলের বাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা।

বড় পূজায় অথবা বিবাহ প্রভৃতির মত সামাজিক অনুষ্ঠানে ঢাক-ঢোল প্রভৃতির মত বাজনার আয়োজন হলেও নিত্যকার পূজার্চনায় কিংবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পূজানুষ্ঠানে ঘণ্টা বাজিয়েই কাজ চালান হয়। ঘণ্টা নিয়ে খুব বেশী প্রবাদ রচিত না হলেও দু' একটি যা রচিত হয়েছে তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ত আয়োজন না করে, সাধারণ ব্যাপারে গুরুতর আয়োজন হলে তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—

ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।

ঘণ্টার শব্দটি খুব শ্রুতিসুখকর নয়,কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তার ব্যবহার না হলেই নয়। তবে ঘণ্টার শব্দ যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এ সত্য অনস্বীকার্য। একটি প্রবাদে ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে তাই ঘণ্টার ধ্বনির তুলনা করে বলা হয়েছে:

কায়েতের বুদ্ধি ঘণ্টার বাদ্যি।

কাঁসি এমনি বাজেনা, বাজে ঢাক-ঢোলের সঙ্গে। শুধু ঢাক-ঢোলের শব্দ যেন খানিকটা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। তাই বলা হয়,—

ঢাকের সাথে কাঁসি।

নিষ্কর্মার জীবন যাপন বোঝাতে প্রযুক্ত হয় যে প্রবাদটি সেটি হ'ল —

খাই দাই কাঁসি বাজাই।

অনুরূপ অর্থে প্রযুক্ত অন্য একটি প্রবাদ —

খাই দাই ডুগডুগি বাজাই।

ঘণ্টার মত আমাদের আর একটি পরিচিত বাদ্য হ'ল শঙ্খ। সকল প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই শঙ্খধ্বনি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। যে অনুষ্ঠান অন্তঃ-সারশূন্য, অথচ বাইরে অর্থহীন জমক দেখানো হয়, সেক্ষেত্রে পরিহাস করে বলা হয়—

ভোগ রাগ নেই, শাঁখের তুর তুরুণী।

অর্থাৎ শাঁখের গুরু গম্ভীর নিনাদের সকলে সচকিত হলেও দেখা যাবে পূজার্চনায় উপযুক্ত ভোজোপকরণের একান্তই অভাব। অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

দেখাদেখি শাঁখের নাচন।

শিঙাও অন্যতম বাদ্য, কিন্তু শিঙা নিয়ে রচিত প্রবাদ সংখ্যায় নিতান্তই অপ্রতুল। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে কেবল—

শিঙা হারিয়ে ফুঁ।

অর্থাৎ সময়ে কর্তব্যে অবহেলা করে পরে অসময়ে কর্তব্য পালনের ব্যর্থ চেষ্টা! আমাদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অপর একটি বাদ্যযন্ত্র হ'ল সানাই। বিশেষত বিবাহের সঙ্গে সানাইয়ের বড় অন্তরঙ্গ যোগ। সানাইয়ের মধুর ধ্বনিই আমাদের মধুর মিলনের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে —

সানায়ে ফুঁ পাড়তে বিয়ের লগন উতরে গেল।

কোনো কাজের তোড়জোড়েই যদি আসল কাজটি সম্পন্ন হবার সুযোগ না পায়, সেক্ষেত্রে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়। অপর একটি প্রবাদে অন্ধ ভাবে অন্যকে সমর্থন করার বিচিত্র মানসিকতা সমালোচিত হয়েছে এইভাবে—

'সানাইয়ের পোঁ ধরা।'

নহবৎ নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঘরে বাজে ফুটো তবলা, লোকে বলে লবদ বাজে

এক্ষেত্রে 'নহবৎ' অর্থে 'লবদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা—

চৌকিদারের ছেলের বিয়ে রোশন চৌকি বাজনা।
দেড় বুড়ি যার ঘরে নেই, তিন বুড়ি তার খাজনা॥

একজন যখন নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনকিছুর আয়োজন করে, তখন সেই দৃষ্টিকটু আয়োজনকে ব্যঙ্গ করতেই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়। বাঞ্ছিত বস্তু বা ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হলে যে ক্ষোভের উদ্ভব হয়, তাকেই প্রকাশ করা হয়েছে এইভাবে—

শব্দে শুনা যায় নববতের বাণী
বার বাড়ীতে গিয়া শুনি গাধার চেঁচানী।

এইবার বাজনা নিয়ে প্রচলিত প্রবাদগুলির বিষয়ে আসা যেতে পারে।
আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক বোঝাতে বলা হয়ে থাকে,

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

যেমন কার্য, তার তেমনি আয়োজন বোঝাতে যে প্রবাদটি প্রযুক্ত হয় সেটি হ'ল—

যেমন বিয়ে তেমনি বাদ্যি।

অসম্ভব ভবিষ্যৎ কল্পনা প্রসঙ্গে বলা হয়,—

বাঁজার ছেলেও হবেনা, বাজনাও বাজবে না।

জীবনে প্রতিটি মানুষেরই অনেক কিছু সাধ থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধ্য থাকেনা। ফলে মনের সাধ মনেই থেকে যায়, বাস্তবায়িত আর হয়ে ওঠেনা। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বড় সুন্দর করে বলা হয়েছে—

আদরমণি সাধের ঝি, বাজনা হল না।
তিন কাহারে তুলে নে গেল দেখতে পেলাম না।

বাজনা নিয়ে রচিত আরও কয়েকটি প্রবাদ হল—

ক. বাজনার সঙ্গে কথা কওয়া।
খ. বাজনা বাজিয়ে ধান ভানলেও তুষ ছাড়া হয়না।
গ. বিয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরোলে খাজনা।
ঘ. লাগে কড়ি বাজনা করি, তবে ত লোক শোনে।
ঙ. অলক্ষ্মীর হাটের বাজনা সার।

বাজনা সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রকে মূলতঃ উপলক্ষ্য রূপেই ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে আমাদের সামাজিক আচরণ তথা মানুষের চরিত্র-বিশ্লেষণই লক্ষ্য হয়েছে প্রবাদগুলিতে। আর একটি কথা, প্রবাদগুলিতে বীণা, সেতার, বেহালা, সরোদ, পাখোয়াজ বা পরবর্তীকালের Sophisticated পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রগুলি স্থান পায়নি। প্রবাদের স্রষ্টারা এসব বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলেই মনে হয়।

বাংলা-প্রবাদে বিলাসোপকরণ

বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে লোক সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রবাদের প্রাচুর্য যে বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমাদের সমাজজীবনের সব কিছুই প্রবাদের বিষয়বস্তু রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষ, বিশেষতঃ নারী ভূষণ প্রিয়। অঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নারী কত কিছুই না ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে পুরুষের স্থান নীচে হলেও একেবারে বিলাসহীন এমন কথা বলা যায় না। মোটের ওপর বিলাসোপকরণের ব্যবহারে পুরুষের তুলনায় নারীদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত। তাই বাংলা প্রবাদে যে সব বিলাসোপকরণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই নারীদের অধিকার ভুক্ত।



আলতা, কাজল, টিপ, হার, খাড়ু, বালা, দুল, দর্পণ, ঢাকাই শাড়ী ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণাদি অবলম্বনে প্রবাদগুলি রচিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সব উপকরণাদির সৌন্দর্য কিংবা ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ অনুপস্থিত। বরং সে তুলনায় এই সব উপকরণাদির উল্লেখের মাধ্যমে অন্যবিধ বক্তব্য উপস্থাপিত হতে দেখা গেছে। চরিত্র সমালোচনাই এসব ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ শ্লেষাত্মক মন্তব্য প্রকাশের গুণে প্রবাদগুলি অত্যন্ত সরস ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য সাজ-সজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় এবং নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণাদির পরিচয়ও যে আমরা সর্বোপরি লাভ করি এইসব প্রবাদগুলি থেকে, তাও অস্বীকার করা চলে না।

আলতা সধবা নারীর এক অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। শুধু মাত্র স্বামীর জীবদ্দশাই যে এর মাধ্যমে সূচিত হয় তাই নয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারকারিণীর পদযুগলের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পায় এর মাধ্যমে। কিন্তু বাংলা প্রবাদে এই দুয়ের কোনটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। ব্যক্তি বিশেষের অক্ষমতা এবং সৌন্দর্য-

হানি তথা হাস্যকর প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়োজনকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে—

ক. গোদা পায়ে আলতা, থাঁদা নাকে নথ।

খ. পান সাজতে জানে না, দু' পায়ে আলতা।

গ. বড় বিয়ে তার দু' পায়ে আলতা।

ঘ. যে না বিয়ে তার আবার দুই পায়ে আলতা।

ঙ. অশ্বথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি।

—এই প্রবাদটিতে নারীর সপত্নী বিদ্বেষ প্রকাশিত। হিন্দুদের কাছে অশ্বথ গাছ পবিত্র বৃক্ষ বলে বিবেচিত হয় আর তাই তার ছেদন নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও অসীম সাহসী ব্যক্তি যেমন অশ্বথ গাছ কেটে বসতি স্থাপন করে, তেমনি সতীনকে হত্যা করে তার রক্ত আলতা রূপে ব্যবহার করার সাহসিকতা প্রকাশিত হয়েছে এখানে।

চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে কাজল অতি ব্যবহৃত এক উপকরণ। কিন্তু না, প্রবাদে কাজল ব্যবহারকারিণীর নয়ন যুগলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সমালোচনার সুরই প্রকটিত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ক. কানা চোখে দিয়ে কাজল,
আপন রূপে আপনি পাগল।

খ. শুধু কাজল পরলে হয় না, চাউনি চাই।

গ. সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কানা।

ঘ. চোখের কাজল গালে হল।

ঙ. চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ পেট ভরিব কোণ।

মেয়েদের সাজ-সজ্জার বেলায় টিপ না হলে চলে না। কিন্তু আধেয় নয়, আধারের গুণেই যে আধেয় গৌরবান্বিত হয়, টিপ সংক্রান্ত প্রবাদটিতে সেই সত্যেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়—

এ না টিপ কে না পরে,
কপালের গুণে টিপ ঝলমল করে।

অঙ্গরাগের আর এক উল্লেখযোগ্য উপাদান, আজকের দিনের না হলেও অতীতের—চন্দন। একটি প্রবাদে বিকৃত রুচির প্রতি কটাক্ষ করে বলা হয়েছে—

অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ।

আমাদের প্রচলিত ধারণা সৎসঙ্গ গুণে অসৎ ব্যক্তিও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু একটি প্রবাদে এর বিরোধিতা করে বলা হয়েছে—

কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে
কথনো সুগন্ধি নয় চন্দনের গুণে।

উপযুক্ত বস্তুকে যদি সার্থক ভাবে ব্যবহার করা না হয়, তবে তা কিরকম ব্যর্থ হয়ে যায়, সেই প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কপাল থুয়ে পাছায় চন্দন।

মানসিকতার পরিবর্তন যদি ঘটে, বিশেষতঃ অনুরাগের ক্ষেত্রে, পরিণামে, অতি নিকৃষ্ট এবং পরিত্যাজ্য বিষয়ও অতি আদরণীয় হয়ে ওঠে। যথা—

ভাবে যদি মজে মন, বিষ্ঠা হয় চন্দন।

আতর মূলতঃ পুরুষের ব্যবহার্য উপকরণ। কিন্তু আতর সংক্রান্ত একটি প্রবাদে অযোগ্য ব্যক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে—

অবাক সৃষ্টি করলেন চুপে,
নাক নেই তার আতর গোঁপে।

বৌদির সঙ্গে দেওরের মধুর সম্পর্ক আমাদের সমাজে স্বীকৃত—এ সম্পর্ক বিশেষ করে রঙ্গ ও পরিহাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি প্রবাদে সেই মধুর পরিহাস রস প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ছোট জা-কে আতরের শিশির সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে—

ছোট বউ আতরের শিশি,
ছোট ঠাকুরের গোঁফে ঘসি।

এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যে আতর একান্তভাবে পুরুষের ব্যবহার্য, প্রবাদ দুটির মধ্যে সেই সচেতনতার প্রকাশ।

আতর সংক্রান্ত অন্য দুটি প্রবাদ—

ছুঁচো যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।

প্রবাদটির বক্তব্যের সঙ্গে 'কয়লা ধুলেও না যায় ময়লা'র গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

মাত্রাজ্ঞানের অভাব বোঝাতে বলা হয় যে প্রবাদটি, সেটি হল—

আতর কিনতে বকনো আনা।

'বকনো'র অর্থ হল পেতলের ছোট হাঁড়ি। আতর পরিমাণে এমন কিছু অধিক নয়, যার আধার হিসাবে বকনোর প্রয়োজন।

উল্কি—পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় লক্ষ্য করা যায়।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ধুলে যায় না উল্‌কির কালি।

এক্ষেত্রে প্রবাদটির বাচ্যার্থই সব নয়, ব্যঙ্গার্থে বোধ করি কলঙ্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত করার ব্যাপারটি শুধুমাত্র নেশার বিষয় নয়, দীর্ঘদিনের প্রচলিত এক বিলাসিতা। একটি প্রবাদে এ হেন তাম্বুল অভিব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

থাকত পান দিতাম হাতে, গুয়া খয়ের দিতাম সাথে।
একলা, পোড়া চুনের দায়, ভরম সরম সকল যায়॥

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, ঘরের শোভা ইদারা।
দাঁতের শোভা মাজন মিশি চোখের শোভা ইশারা॥

আগেকার দিনে বিলাসিতার অন্যতম উপকরণ ছিল মিশি। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ রানী পান খেয়েছে।

দন্তমূলে মাড়িতে মিশি রেখে তাকে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত করা হ'ত। একাধিক প্রবাদে এ হেন মিশি স্থান পেয়েছে। নিজ দোষে সখ করার উপায় নষ্ট হলে বলা হয়—

আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, মিশি দিবি কিসে?

আর একটি প্রবাদে অযোগ্য ব্যক্তির লোক দেখানো বিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে—

দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি বাড়ি কোথা, না, কুড়সন পলাশী।

বিলাসিতার ক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রবাদে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটিকেও যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

নিজের অবস্থা বিস্মৃত হয়ে কেউ যদি বিলাসিতায় সাধ্যাতিরিক্ত ভাবে মত্ত হয়, তবে সে ব্যাপারটি যে কেবল দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে তাই নয়, হাস্যকর ব্যাপারেও পরিণত হয়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

রাজার বাড়ীর চেড়ী, দিনে সাত খান শাড়ি।

নিঃসম্বল অবস্থাতেও কেউ যদি স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত প্রয়াস করে, তবে এই বিলাসিতাও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বলা হয়—

নেই ঘর, নেই বাড়ী, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

আর্থিক তথা সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি অশোভন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে সেও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায় না, প্রমাণ স্বরূপ একটি প্রবাদের উল্লেখ করা গেল এখানে—

ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা এল ধুতি-উড়ানি কিনতে ॥

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—

ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটা, ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল, উড়ুনি গায়ে।

জামাইরা সচরাচর কিঞ্চিৎ বিলাসপ্রিয় হয়েই থাকে, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণ ব্যতিরেকেই যদি বিলাসিতা দেখাবার প্রয়াস হয়, তবে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি খুবই হাস্যকর ঠেকে—

জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের, ডুবুড়ি কড়ি সুতোর ফের।

অসঙ্গত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিলাসিতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

চটি জুতার আবার ফিতে।

অনেকে কেশ বিলাসী হয়, কিন্তু এজন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হল কেশরাজি। বিরলকেশ ব্যক্তি যদি কেশ বিলাসী হয় তবে সে বিলাস শুধু অচরিতার্থ থাকে তাই নয়, কেশ বিলাস দৃষ্টিকটুও হয়ে ওঠে। যেমন—

চুল নেই তার টেরিকাটা।

কিংবা, ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা।

যার যা লাভ করার কথা নয়, সেই ব্যক্তি আশাতীত ভাবে তা লাভ করার পরেও যদি অন্য কিছু লাভের প্রত্যাশা করে, তবে সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি—

পতি পেলে সেই কতো নয়, কাঁচের চুড়ি চায়।

অর্থাৎ যার কপালে পতি জোটারও সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত, সেই রমণী বহু অভিলষিত পতি লাভ করার পর আবার হাতের শোভা বৃদ্ধির জন্য কাঁচের চুড়ি লাভের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা স্বভাবতঃই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

সংসারে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা চাক্ষুষ প্রমাণ পাবার পরও পরোক্ষ ভাবে জানার প্রয়োজন বোধ করে, এই অর্থহীন মানসিকতা উপহসিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখা।

অনাগত ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রস্তুতি উচিত নয়, কারণ যা সম্পূর্ণরূপে

অনিশ্চিত, তার জন্য পূর্ব থেকেই কোন প্রয়াস নিযুক্ত করলে শেষ পর্যন্ত তা অন্তহীন দুঃখের কারণ রূপে দেখা দিতে পারে—

হওয়া পুত মরে যায়, তবু পুতের মল গড়ায়।

অনায়াসে লোভনীয় বস্তু লাভের সুযোগ ঘটলে মানুষের পক্ষে তা. আত্মসাৎ করার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক সময়েই এর পরিণাম শুভ হয় না। তাই একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

পথে যদি পাই সোনা কানে দিতে কিবা মানা ?
পরের সোনা দিওনা কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে।

গহনা যতই আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় হোক, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে অত্যন্ত ভারী গহনা পরা ক্লেশকর—

ওদের বউ নথ পরেছে সাত সাঙাতে বয়,
নাকে কেমন সয় ? না, ওরাই শুধু কয়।

যার দ্বারা সুখের আশা করা হয়, তা অনিষ্টেরও কারণ হয়ে উঠতে পারে, প্রবাদের ভাষায়—

কানের সোনায় কান কাটে।

কথায় বলে, হীরের আংটি কি বাঁকা হয় ? হীরে মূল্যবান বস্তু, তাই হীরের তৈরী আংটি বাঁকা হলেও তা স্বীকার করা হয় না। মূল্যবান বস্তুর প্রকৃতিই সব, তার আকৃতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কথাটি মানুষের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। গুণবান ব্যক্তির গুণই বিবেচিত হয়, তার আকৃতি সর্বদাই সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকে।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—

পট্টবস্ত্রে গুঞ্জাফল মূল্য নাহি হয়,
ছিন্ন বস্ত্রে মোতির মূল্য ক্ষয় নাহি হয়।

এক্ষেত্রে আধারের অপেক্ষা আধেয়র গুরুত্বকেই স্বীকার করা হয়েছে।

দুঃস্থ ব্যক্তির সামর্থ্য না থাকায় যে তার সাধও অন্তর্হিত হয়ে যায় তা নয়। সাধ্য না থাকলেও সাধ থাকে, আর মানুষ সেই সাধ মেটাতে চেষ্টাও করে। কিরকম ?

কাঙালের রাঙই সোনা,
মাচা বেঁধে শোয় বালাখানা।

যে হতভাগ্যের দোতলা বাড়ীতে থাকার সামর্থ্য নেই, সেই ব্যক্তি মাচা বেঁধে তাতে থেকে দোতলায় থাকার সাধ মেটায়। ঠিক তেমনি ভাবে প্রকৃত সোনার অভাবে রাঙতা নিয়েই তাকে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। এর বিপরীত চিত্রও লক্ষিত হয়। সামান্য আশা করে মানুষ অসামান্য কিছু লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলে এক্ষেত্রে বলা হয়—

চাইলে জিরে পেলে হীরে।

উৎপাদনকারীর তুলনায় ব্যবসায়ীর আর্থিক লাভ হয় বোঝাতে বলা হয়—

জেলের পরনে টেনা, নিকারির কানে সোনা।

'নিকারির' অর্থ হল ফড়ে।

প্রবাদে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে গিয়ে যে বস্তুগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হলো পুঁই শাক্, রুই মাছ ইত্যাদি। অর্থাৎ অসংখ্য শাকের মধ্যে পুঁই নাকি হ'ল শ্রেষ্ঠ। আর মাছের মধ্যে রুই স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত। অনুরূপ-ভাবে আত্মীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জুটেছে "শালা"র। তেমনি গয়নার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়েছে বালাকে। এতদ্ সম্পর্কিত প্রবাদটি হল—

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।

গহনা প্রসঙ্গে বারংবার বিশেষ এক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে প্রবাদে। যে মা সর্বস্ব দিয়ে পুত্র সন্তানকে প্রতিপালন করেন, বিবাহের পর কিন্তু দেখা যায় সেই সন্তানই অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে জননীকে অবজ্ঞা করে স্ত্রীকে নানাবিধ গয়না উপহার দিয়ে তার মনোরঞ্জন করছে। হার সম্পর্কিত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মায়ের পেটে ভাত নেই বউয়ের গলে চন্দ্রহার।

লক্ষ্মীছাড়া স্ত্রৈণের লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

গরু হাল বেচে গড়ায় বউয়ের গলার হার।

বালা সংক্রান্ত একটি প্রবাদে অকৃতজ্ঞ সন্তানের সমালোচনা করে বলা হয়েছে—

গিন্নীর হাতে রাঙা পলা বউয়ের হাতে সোনার বালা।

আর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

একটি প্রবাদে তো বধূ শ্বশ্রূমাতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে—

হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি বাঁদী।
সে হল গিন্নী, আর আমি বসে রাঁধি।

অলংকার পরলেই হয় না, এজন্যে একদিকে যেমন প্রয়োজন হয় যোগ্যতার, তেমনি অপরদিকে প্রয়োজন হয় দৈহিক সৌন্দর্যের। এই দুইয়ের অভাব সত্ত্বেও গয়নার প্রতি আকর্ষণ অথবা ব্যবহারকে প্রবাদে নিদারুণভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। প্রথমে, সামর্থ্যের অভাব সত্ত্বেও গয়না ব্যবহার করলে তা যে কতখানি বেমানান হয়ে দাঁড়ায়, তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। আংটি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—

ক. নুন জুটে না ভাতে, ছাপার আংটি হাতে।
খ. পেট ভরে না ভাতে, সোনার আংটি হাতে।
গ. ভাত পায় না খেতে, সোনার আংটি হাতে।

মল সংক্রান্ত একটি প্রবাদে একই রূপ বক্তব্য উপস্থাপিত—

ভাত পায় না, মল পরে নাচে।

অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ভাত পায় না ভাতার চায়, থেকে থেকে গয়না চায়।

মল সংক্রান্ত আর একটি প্রবাদ হল—

কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে।

এখানে অসঙ্গত সাধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, কারণ মলের পরে সামান্য চুটকি পরার কোনও সার্থকতা নেই।

এইবার দৈহিক সৌন্দর্য ব্যতিরেকে গয়না ব্যবহারের মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধির অপচেষ্টাকে প্রবাদে কি নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা গেল।

থাঁদা নাকে যদি নথ পরা হয় কিংবা গোদা পায়ে মল, তবে তা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার হযে দাঁড়ায়। প্রবাদে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

থাঁদা নাকে নথ, গোদা পায়ে মল।

অপর একটি প্রবাদেও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি—

থাঁদা নাকে নোলক ঝোলান বা তিলক পরা।

কিংবা, নাক নেই বেটী বেশর পরে।

পাগড়ী[*] একান্তভাবে পুরুষের ব্যবহার্য সামগ্রী। পাগড়ী পরিধান করলে পৌরুষ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু তাই বলে এর ব্যবহার অপরিহার্য নয়। সামর্থ্য যদি না থাকে তা হলে পাগড়ী ব্যবহার বড় বেশী দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ায়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

ঘরে নাই গুটা বান্ধ, পাগড়ী বান্ধে তেড়া।

অপর একটি প্রবাদে পেয়াদার পাগড়ী নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে—

পেয়াদা বাবু পাগ বেঁধেছেন, যেন সরু ধানের চিঁড়ে।

অযোগ্য ব্যক্তিকে তার ক্ষমতার অধিক মর্যাদা দিলে কি হয় তা বলা হয়েছে এইভাবে—

বানরের গলায় মুক্তোর মালা।

যে ব্যক্তি সামান্য কাজ করতে অক্ষম, তার দ্বারা যে কোন বড় কাজ করা সম্ভব নয়, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

অবাক করলে নাকের নথে, কাজকি আমার কান বালাতে।

হীন ব্যক্তি আভিজাত্যের চাল চলন দেখালে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—

অবাক কলি অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

এমন অনেক নির্বোধ ব্যক্তি আছে, যারা নিজের অনিষ্ট করে সৌভাগ্য প্রচারের প্রয়াস করে। এদের অবস্থা হল—

ঘরে আগুন দিয়ে খাড়ু দেখানো।

যে অতি হীন, তার অহংকার কখনই শোভন হয় না—

খাটে মজুর, কাটে নাড়া, তার বউয়ের আবার নথ নাড়া।

যে রমণীর স্বামী অন্যের ক্ষেতে ধান কাটে, কাজ করে দিন-মজুরের, তার স্ত্রীর অত্যধিক গর্ব শোভা পায়না মোটেই।

যে পণ শেস পর্যন্ত রক্ষিত হবার নয়, সেরকম পণ করলে শেষে শুনতে হয়—

সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।

অতিরিক্ত বিলাসিতাকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়েছে—

সোনার খাটে গা, রুপোর খাটে পা

—এই প্রবাদটি।

সময়ে স্বাভাবিক ভাবে কর্তব্য পালন না করে ভবিষ্যতে গুরুতর কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার, এক কথায় মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়—

থাকতে দিলনা চুটকি, পুঁটী, মরলে দেবে শ্রী আঙুটি।

আভরণেই সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, এজন্য দৈহিক সৌন্দর্যেরও প্রয়োজন। এর আগে আমরা দৈহিক সৌন্দর্য ব্যতিরেকে আভরণের ব্যবহার প্রবাদে কিভাবে সমালোচিত হয়েছে দেখেছি, এবারে যেখানে এ ব্যাপারে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে, সে প্রসঙ্গে প্রবাদে কি বলা হয়েছে দেখা যাক—

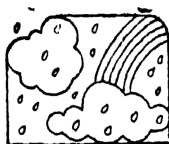
সোনার অঙ্গে দিলে সোনা, তবেই সোনা অতুলনা।

ক'জনই বা এ সত্য মনে রাখে? আসলে মানুষ অলংকারকে শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক বলেই মনে করেনা, মনে করে সৌন্দর্য হানির পরিপূরক রূপেও।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিলাসিতার প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানুষের সৌভাগ্য আর রয়েছে তার সৌন্দর্য বোধ। চরিত্র সমালোচনা মুখ্য স্থান নিলেও এই দুটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু বিলাসোপকরণ সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে পরিস্ফুট।

বাংলা প্রবাদে মাস

বারো মাসে তের-পার্বণের কথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু বারটি মাস নিয়ে যে কত অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে বাংলায়, সে বিষয়ে আমরা অনেকেই অবহিত নই। অবশ্য বিভিন্ন মাস অবলম্বনে রচিত প্রবাদের একটা বড় অংশ কৃষি, ভূমি, ফসল, আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত বক্তব্যেই নিবদ্ধ। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। এখানকার শতকরা সত্তর জন মানুষই কৃষির ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাই কৃষিই এখানকার মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সূচক। স্বভাবতঃই তাই মাস সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবাদে কৃষি এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত হয়েছে। প্রবাদে মুখ্যতঃ মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়ে থাকে, সমালোচিত হয় মানব চরিত্রের বিভিন্ন ত্রুটি ও দুর্বলতা। মাস সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে কিন্তু চরিত্র বিষয়ক আলোচনা তেমন গুরুত্ব পায়নি লক্ষিত হয়।



বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি নানা ফুলে-ফলে ভরে ওঠে। সেই সঙ্গে মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ নানা পূজা-পার্বণে, উৎসব-কলায়। খুব সীমিত সংখ্যক প্রবাদেই কিন্তু এইসব বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। গাজন, চড়ক, মনসাপূজা, ভাদুপূজা টুসুপূজার মত জনপ্রিয় পূজা-পার্বণের কথা মাস সংক্রান্ত প্রবাদে উল্লিখিত হয়নি। উল্লিখিত হয়েছে অম্বুবাচী, দুর্গাপূজার ন্যায় দুটি একটি পূজা-পার্বণের কথা। আর বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন শস্য এবং শাক-সবজির উল্লেখ প্রবাদগুলিতে যেমন ঘটেছে, তেমনটি কিন্তু ফল বা ফুল সম্পর্কে হয়নি।

বিভিন্ন মাস নিয়ে প্রবাদ রচিত হলেও বিশেষ করে পৌষ এবং মাঘ মাস অবলম্বনে রচিত প্রবাদের সংখ্যাধিক্য অন্যান্য মাসগুলি অবলম্বনে রচিত

প্রবাদের তুলনায় বেশ চোখে পড়ার মত। তারপরই অবশ্য উল্লেখ করতে হয় ভাদ্র মাস অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলির। স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে আশ্বিন ও কার্তিক মাস অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বার মাসের সব ক'টি মাসকেই কম-বেশী প্রবাদে স্থান দেওয়া হলেও এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম জ্যৈষ্ঠ। বাস্তবিক, প্রবাদের উদার রাজ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসকে যে কেন প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি তার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। এমন কি শ্রাবণ মাস অবলম্বনে তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য প্রবাদের সন্ধান পাওয়া না গেলেও, অন্ততঃপক্ষে শ্রাবণ মাসের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় একটি প্রবাদে। কিন্তু সেই উল্লিখিত হবার মর্যাদাটুকু থেকেও জ্যৈষ্ঠ বঞ্চিত হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, বেশ কয়েকটি খনার বচনে জ্যৈষ্ঠ মাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে সেই খনার বচনগুলিকে বর্তমান নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

বৈশাখ মাস যে কেবল বছরের প্রথম মাস তাই নয়, কৃষির ব্যাপারেও এই মাসটির গুরুত্ব অসাধারণ। আউস ধান বোনার সময় হল বৈশাখ। তাই কৃষকেরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে বৈশাখী বৃষ্টির জন্যে—

বৈশাখের প্রথম জলে, আউস ধান দ্বিগুণ ফলে।

একটি প্রবাদে কোন্ মাসে বীজ বুনতে হয় এবং কোন্ মাসে বা রুইতে হয় সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

বৈশাখী বোনা আষাঢ়ী রোয়া,
জায়গা হয় না ধান থোয়া।

বৈশাখ মাস ধান বোনার প্রশস্ত সময়, এই সময় মাটির অবস্থা কেমন থাকে সে সম্পর্কে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। এর উত্তর হল—

মাঘের মাটি হীরের কাঁঠি, ফাগুনের মাটি সোনা।
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা॥

বৈশাখ সংক্রান্ত আরও দুটি প্রবাদ—

ক. চৈত মাসে চৈত কামড়ি, বোশেখ মাসে ঝোঁতলা মুড়ি।
খ. চৈতের গীত বৈশাখে।

বৈশাখের পর আসা যেতে পারে জ্যৈষ্ঠ মাসের কথায়।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

তিন দলকে জ্যৈষ্ঠ কামাই।

'দলকে' শব্দটির অর্থ হল 'ঝলকে'। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে আদৌ বৃষ্টি হয় না। কিন্তু এ হেন জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি কয়েক পশলা বৃষ্টিপাত হয়, তবে নিয়মের ব্যতিক্রম হল বলে ধরা হয়।

জ্যৈষ্ঠের খরার কথাও প্রবাদে উল্লিখিত হয়েছে—

জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার সহেনা ধরা।

অপর একটিতে বর্ষার শুভাগমনের অনিবার্যতা বোঝাতে বলা হয়েছে—

চৈতে খর খর ; বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে ; তবে জানবে বর্ষা বটে।

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ যদি মেঘমুক্ত থাকে তবেই বর্ষার আগমন সুনিশ্চিত বলে ধরা যেতে পারে।

এইবারে আষাঢ়ের প্রসঙ্গে,—

আষাঢ় মাস, চাষার আশ।

আষাঢ় হল কৃষিজীবী মানুষের কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কারণ আষাঢ়ে শুরু হয় বর্ষা। আর এই বর্ষার জলে চলে পুরোদমে রোয়ার কাজ। সারা বছরের অন্ন সংস্থানকে নিশ্চিত করে তুলতে কৃষকেরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই সময়। তাই তো নিতান্ত নির্বোধ এবং অলস ব্যক্তি ছাড়া কেউই এই সময় বসে থাকে না—

আষাঢ়ে যে না খাটালে পর, মিছে তার ঘর দুয়ার।

অর্থাৎ কিনা এই সময় শুধু নিজে খাটলেই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে জনও লাগাতে হয়। কৃষিকর্মে হাত না দিলে সংসার জীবন চরম দুর্গতির সম্মুখীন হতে বাধ্য। প্রবাদটিতে এই সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই ঘটুক, তবু আমাদের দেশের কৃষিজীবী মানুষ আজও বিশেষ করে প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভর করতেই বাধ্য। কৃষির ব্যাপারে জলের অপরিহার্যতা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বিশেষ করে আষাঢ় থেকেই বর্ষার শুভাবির্ভাব কৃষকের মনকে মাতিয়ে তোলে। কারণ এই সময়ের বৃষ্টি-জল তার সারা বছরের অন্ন সংস্থানকে সুনিশ্চিত করে। তাই আষাঢ়ের বর্ষণ কৃষকের কাছে করুণা-ধারা হয়ে দেখা দেয়। একটি প্রবাদে বর্ষাকে রমণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রথমে জন্ম ও শৈশবাবস্থা, তারপর যুবতী, পরবর্তী কালে বিবাহাদির পর যুবতীই হয় গর্ভবতী, ক্রমে গর্ভ ধারণ ক্ষমতা লোপ

পায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। এরপর বার্ধক্য এবং শেষে অনিবার্য পরিণাম তার মৃত্যু এবং চিতাভস্মে রূপান্তরিত হওয়া—এই হল রমণী জীবন। অনুরূপভাবে বর্ষার ক্ষেত্রেও প্রথমে সূচনাকাল, তারপর ক্রমে ক্রমে তার ভরা যৌবনকাল, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পর জলকণার পরিমাণ হ্রাস হেতু মেঘের জলশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষিত হয়ে থাকে—

আষাঢ়ে উৎপত্তি, শ্রাবণে যুবতী, ভাদ্রে পোয়াতী।
আশ্বিনে বুড়া কার্তিকে দেয় উড়া॥

একটি প্রবাদে আষাঢ় মাসের মাটির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে চাষীর মেয়ের—

আষাঢ়ে মাটি, চাষাড়ে ঘরের বেটী।

গ্রীষ্মের তাপে শুষ্ক জমি আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির জল শুষে নেয় প্রবল ভাবে, দরিদ্র চাষীর ক্ষুধার্ত মেয়ে যেমন গোগ্রাসে আহার্য বস্তু গ্রহণ করে।

আষাঢ় মাসে প্রচুর পরিমাণে পান হয়। তাই পান এই সময় খুব সুলভ। যারা অন্যসময়ে পান খায় না, খাবার মত আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকে না, তারাও এই সময় পান খাওয়ার বিলাসিতায় মেতে ওঠে—

আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

আষাঢ় মাসের দীর্ঘবেলা সুতা কাটার পক্ষে খুব প্রশস্ত। তাই কাটনীরা এই সময়কে খুব কাজে লাগায়। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে যে—

আষাঢ়ে না হল সুত, হা সুত যো সুত।
যোলতে না হল পুত, হা পুত যো পুত॥

আষাঢ়ে পালিত হয় অম্বুবাচী। অম্বুবাচীর দিনটি নির্দিষ্ট—সাতই আষাঢ়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

নাইক পাজি নাইক পুঁথি
সাতুই আষাঢ় অম্বুবাচী।

অবিশ্বাস্য কাহিনী বোঝাতে বলা হয়—

আষাঢ়ে গল্প।

কথায় বলে পচা ভাদ্র। আষাঢ় মাসে যে বর্ষার সূচনা, ভাদ্রে তার ভরা যৌবন, কিংবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করলে বলা চলে পূর্ণ গর্ভবতী। সব সময় বৃষ্টি লেগেই থাকে। তাই আষাঢ় কৃষিজীবী মানুষের কাছে যদি সৌভাগ্যের সূচক হয়, তাহলে দুর্ভাগ্যের প্রতীক নিঃসন্দেহে ভাদ্র। এই সময় দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করাই কঠিন হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের চরম দুরবস্থা

দেখা দেয় এই সময়। তাই তো বলা হয়েছে—

অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে।
ভাগ্যবানের বাপ মরে পৌষ মাসে॥

অশৌচকালে আমিষ, তেল, জুতো, ছাতা, শয্যা, মশারি ইত্যাদি অব্যবহৃত থাকে। বর্ষায় বলাবাহুল্য এগুলির অভাবে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু শীতকালে তা হয় না।

ভাদ্র মাস যে অভাবের মাস, তা আরও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে অন্যত্র—

কি করব কার্তিকের চাষে, ভাত পাই না ভাদ্রমাসে।

অনেক সময় ভাদ্রে আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত দেখা দেয় ভয়ঙ্কর বন্যা। মানুষের দুর্গতির আর অন্ত থাকে না তখন। কত মানুষের জীবন যে তখন বিপন্ন হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটে, তার আর ইয়ত্তা নেই—

চৈতে কুয়া, ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

ভাদ্র মাসের রৌদ্র তাই বিপদমুক্তির বার্তা নিয়ে আসে বিপন্ন মানুষের কাছে, সূর্যালোক তখন আশার আলোকে রূপান্তরিত হয়। একটি প্রবাদে তাই সোদরের কথার মতই ভাদ্রের রৌদ্রকে রমণীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে—

ভাদরের রোদ আর সোদরের কথা।

ভাদ্র মাসে সহজে রোদের দেখা মেলে না। কিন্তু যদি দেখা মেলে, তাহলে চাষের মাটি আবার শক্ত হয়ে ওঠে। সেই কারণে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ভাদ্রে বিপদ ভাদ্রে ছাড়ে।

ভাদ্র মাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাল। এই সময়ে তাল খুব মিষ্টিও হয়। তাল থেকে প্রস্তুত হয় নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী। সময়ে সবকিছু ভাল হয় বোঝাতে তাই বলা হয়ে থাকে—

ভাদরে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শুয়া মিঠা।

'শুয়া' বলতে এখানে শশার কথা বলা হয়েছে।

ভাদ্রের তাল যদি কারো গায়ে পড়ে, তাহলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এই আঘাতের তীব্রতা একটি উপমার দ্বারা চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—

বেতালের ওপর মারে তাল, ভাদ্রমাসের যেন তাল।

তালহীন গানে তাল দিলে তা যেমন অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়, তেমনি ভাদ্রমাসের তাল গায়ে পড়লে তীব্র আঘাত করে। প্রবাদটিতে 'তাল' শব্দটিকে দ্বিবিধ অর্থে

ব্যবহার করে যমক অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম 'তাল' শব্দটির অর্থ ছন্দ, দ্বিতীয় 'তাল' শব্দটির অর্থ ফলবিশেষ।

ভাদ্রমাসে সব কচুর লতিই অন্যতম উপভোগ্য আহার্য হয়ে ওঠে। ঠিক যেমনটি অল্প বয়সে কিংবা যুবতীকালে চারিত্রিক শৈথিল্য যাই ঘটুক না কেন, বার্ধক্যে সকল নারীই সতীরূপে প্রতিভাত হয়—

ভাদ্র মাসে কচুর লতি, বুড়া হলে সবাই সতী।

ভাদ্রমাসের কচি শশা যতই আকর্ষণীয় হোক, তবু স্বাস্থ্যের কারণে তা গ্রহণ করা অনুচিত। কারণ এই সময়ের কচিশশা খেলে পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়—

লোক দেখানো ভালবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা।
দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ ॥

ভাদ্র সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রবাদ—

ক. ধোয়া ভাদ্রে ধুয়ে নেওয়া।

খ. ভাদ্র মাসের তাল।

গ. যাবে আগে পচা ভাদুরী, তবে আসবে পৌষ আদুরী।

ভাদ্রের পরই আসে আশ্বিন। আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজায় বলিদানের জন্য পাঁঠার খুব চাহিদা। তাই এই সময়ে ত্রুটিযুক্ত পাঁঠাও সহজেই বিক্রয় হয়ে যায়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

আশ্বিন মাসে কুটে পাঁঠাতেও কড়ি।

আশ্বিন মাসে দিনের বেলায় রোদ থাকলেও রাত্রের দিকে বেশ শীতের আমেজ দেখা দেয়। শীত যে আসছে তা এই সময় থেকেই বেশ অনুভূত হতে থাকে—

আশ্বিন মাইসা রীত। দিনে রইদ রাতে শীত।

আশ্বিন মাস সংক্রান্ত অপর একটি প্রবাদে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

সমস্ত আশ্বিন, কার্তিকের আট, যে বাঁচে সে খয়ের কাট।

সচরাচর আশ্বিন মাসেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আশ্বিন মাস তাই দুর্গাপূজার জন্যই বিশেষভাবে খ্যাত। কিন্তু কোন কোন বছর আবার এর ব্যতিক্রম ঘটতেও দেখা যায়। আশ্বিনের পরিবর্তে কার্তিক মাসে দুর্গাপূজার দিন নির্দিষ্ট হয়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে পাঁজির হিসাব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—

পাঁজি হয়েছে উজন সুজন, কার্তিক মাসে দুর্গাপূজন।

আর একটি প্রবাদে কার্তিক মাসে ঝিঙের ঝোল দিয়ে ভাত খাবার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে—

থাকরে মন স'য়ে,
কার্তিক মাসে ভাত খাবি তুই ঝিঙের ঝোল দিয়ে।

গীতায় বলা হয়েছে :

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতূণাম কুসুমাকরঃ

অনুরূপ বাংলা প্রবাদটি হল—

দূর্বাতুল্য ঘাস, অঘ্রানতুল্য মাস।

অগ্রহায়ণ মাসে শীতের সামান্য আমেজ থাকে, তাই এই সময়টা বড়ই রমণীয়। এই কারণেই ঘাসের মধ্যে দূর্বার শ্রেষ্ঠত্বকে যেমন স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের গুরুত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছে। অগ্রহায়ণ মাস যে খামারের মাস, একটি প্রবাদে সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বার মাস ব্রহ্মোত্তর, অঘ্রান মাসে খামার।
ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার॥

ভবানন্দ নামক গোমস্তা নানা অজুহাতে যে চাষের সমস্তই আত্মসাৎ করেন তাই বোঝান হয়েছে। দুর্বলের সম্পত্তি প্রবলে ভোগ করার পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট।

অগ্রহায়ণ মাসে মানুষের কিছুটাও যে স্বাচ্ছন্দ্য আসে, একটি প্রবাদে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—

থাকরে কুকুর মাড়ের আশে,
মাড় দিব তোকে অঘ্রান মাসে।

আপাত অর্থে বোঝান হয়েছে যে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন চাল ঘরে উঠলে তখন সেই চালের তৈরী ভাতের মাড় ক্ষুধার্ত কুকুরকে দেওয়া হবে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে, তাই ক্ষুধার্ত কুকুর এখন যেন খাবার আশা না করে অপেক্ষা করে থাকে অগ্রহায়ণ মাস আসা পর্যন্ত। প্রকৃত অর্থে, বিশেষ কোন বস্তুর প্রার্থনাকারীর প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্য অনিশ্চিতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে বোঝান হয়েছে।

অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টিপাত হলে দেশে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। সেই সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে একটি প্ররাদে—

যদি বর্ষে আগনে
রাজা যায় মাগনে।

বর্ষা ঋতু এবং আষাঢ় মাসকে যদি দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়, তাহলে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে অভিহিত করতে হবে পৌষ মাসকে। পৌষ মাসটি বিখ্যাত দ্বিবিধ কারণে—এই সময়ে শীতের প্রকোপ খুব, অপরদিকে কৃষিজীবী বাঙ্গালী তার সারা বছরের ফসল এই সময়ে ঘরে তোলে। চাষ শেষ হওয়ায় এই সময়ে কৃষিজীবী মানুষ কিছুটা অবকাশও পায়। তার ওপর ফসলের কারণে হাতেও কিছু নগদ অর্থ আসে। এই সময়ে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় মানুষের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল থাকে। তাই সবমিলিয়ে পৌষ হল সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অপর নাম। একটি প্রবাদে তো এমন কথা বলা হয়েছে যে পৌষ মাসে যার পিতৃবিয়োগ হয়, বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান—

অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে।
ভাগ্যবন্তের বাপ মরে পৌষ মাসে ॥

প্রবাদটির বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভাদ্র মাসের অঝোর বর্ষণে পিতার শেষ কৃত্য সম্পাদন যেমন কষ্টকর, ততোধিক কষ্টকর মহাগুরু নিপাতের কারণে অশৌচ পালন, তার ওপর শ্রাদ্ধাদির আয়োজনে অসুবিধা, নানা প্রতিকূলতা—সে তো আছেই। কিন্তু সে তুলনায় পৌষ মাসে নানা দিক দিয়েই অনেক সুবিধা। অঝোর বর্ষণের কারণে এই সময়ে শেষকৃত্য সম্পাদনে দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় না। যাতায়াতের জন্যেও কষ্ট করতে হয় না। কারণ পথঘাট বর্ষাকালের মত কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল থাকে না। সর্বোপরি এই সময়ে চাষের কাজ ত থাকেই না, উপরন্তু সদ্য সদ্য ফসল ঘরে তোলায় আর্থিক দিক দিয়েও মানুষের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। এর ফলে পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মাদি স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বছরের অন্যান্য সময়ে যাই হোক, অন্তত পক্ষে পৌষ মাষে সদ্য চাষ ওঠার জন্য দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে। তাই একটা প্রবাদে ক্ষুধার্ত কুকুরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এই বলে—

থাকরে কুকুর আমার পাশে, ভাত দেব তোরে পৌষ মাসে।

কিংবা, থাকরে বেরাল আমার আশে, ভাত দেবো তোকে পোষ মাসে।

একটি প্রবাদে ত স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, পৌষ মাসেও যার কপালে দুমুঠো জুটলো না, বুঝতে হবে তার ভাগ্য সত্যিই বড় মন্দ—

পৌষে যার নাহি ক ভাত, তার কভু নাহি সোয়াথ।

কিন্তু এও তো ঠিক যে, সকলেরই পৌষ মাস সৌভাগ্য সুখ নিয়ে আসে না—

কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

পৌষ মাসে নতুন চাল ঘরে ওঠায় কেবল যে কৃষিজীবী মানুষেরই সুখ হয় তা নয়, সেই সঙ্গে মহোৎসব শুরু হয়ে যায় ইঁদুরদেরও। কারণ অফুরন্ত ধান, চাল থাকার ফলে তাদেরও এ সময়ে খাবার কষ্ট থাকে না। আর তাইত বলা হয়েছে—

পৌষ মাসে ইঁদুরের সাত মাগ।

পৌষ মাস আর সৌভাগ্য সুখ কিরকম সমার্থক হয়ে গেছে, একটি প্রবাদে বিপরীত ভাবে তা বোঝান হয়েছে—

ভাতারের কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের দুখ।

সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। দুঃখ-যামিনীর অবসানে সৌভাগ্য-সূর্যের ঘটে আত্মপ্রকাশ। একটি প্রবাদে এই সত্যটিকেই মাসের রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে—

যাবে আগে পচা ভাদুরী, আসবে পরে পৌষ আদুরী।

এতক্ষণ পর্যন্ত মুখ্যতঃ ফসলের কথা বলা হয়েছে, এইবার পৌষ মাসের শীতের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। শীতকাল বলতে যে দুটি মাসকে বিশেষভাবে বোঝায়, তাদের একটি হল পৌষ, আর অপরটি হল মাঘ। পৌষে শীতের তীব্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

পৌষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়।

মোষের মতন প্রাণীও যে পৌষের শীতে কাবু হয়, সে হেন পৌষ মাসে মানুষের অঙ্গ থেকে কাপড় ছিনিয়ে নিলে তা যে তার পক্ষে মর্মান্তিক ব্যাপার হয় এবং এই নির্দয় আচরণ যে কোনমতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না, তা আর বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। তাইত একটি প্রবাদে বলা হল—

সকল কথা আছে চিতে।
কাপড়টি ছিনিয়ে নেছ পোষ মাসের শীতে॥

প্রয়োজনে, দুঃখের দিনে লব্ধ প্রতিকূল আচরণ যে কোনমতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না, সেই সত্যের প্রতিফলন প্রবাদটিতে ঘটেছে।

পৌষ মাসে দিনের তুলনায় রাত্রির অবস্থানকাল অনেক বেশি। রাত্রের আহার্য গ্রহণের পর সুদীর্ঘকাল অনাহারে থাকতে হয়। তারপর দীর্ঘ রাত্রির অবসানে তবে আবার সকালে খাদ্যগ্রহণের সুযোগ ঘটে। সেইজন্তেই বলা হয়েছে—

পৌষে রাত উপোসী।

পৌষের পর মাঘ। পৌষ মাস নিয়ে যেমন বেশ কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে, তেমনি মাঘ মাসও বেশ কয়েকটি প্রবাদে স্থান পেয়েছে। পৌষ এবং মাঘ মাস নিয়ে যদিও শীতকাল, তবু মাঘ মাসেই শীতের প্রকোপ সর্বাধিক। মাঘ মাস সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রবাদেই এই প্রকোপের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। শীতের প্রকোপ এই সময় এত তীব্র হয় যে, মানুষ তো কোন ছার, স্বয়ং বাঘ পর্যন্ত কাবু হয়ে পড়ে—একাধিক প্রবাদেই তাই বলা হয়েছে—

মাঘের শীতে বাঘের ডর।

কিংবা, মাঘের শীতে বাঘ পালায়।

অথবা— মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়।

মাঘমাস এবং জলকণাপূর্ণ মেঘের চরিত্রগত সাদৃশ্য এক—

মাঘে মেঘে একই রীত, যত্র বায় তত্র শীত।

আর তাইতো বলা হয়েছে—

মেঘের শীত না মাঘের শীত।

মাঘমাসের শীতে যেখানে বাঘের মত দোর্দণ্ড প্রতাপের প্রাণী কাবু হয়, সেখানে অন্যান্য জীব-জন্তুদের অবস্থা যে কিরকম শোচনীয় হয় তা সহজেই অনুমেয়। একটি প্রবাদে মোষের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

মাঘের জাড়ে, মোষের শিঙ নড়ে।

বছরে একবারই মাত্র মাঘ মাসের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বছরে একবার মাত্র আবির্ভূত হলেই তো আর মাঘ মাসের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যায় না। প্রতি বছরই সে ঘুরে ফিরে এসে হাজির হয়। তাই ত বলা হল—

এক মাঘে জাড় পালায় না।

অনুরূপ বক্তব্য সমন্বিত অপর একটি প্রবাদ—

একা মাঘে শীত যায় না।

সাধারণভাবে মানুষ বিপদাপন্ন হলে অপরের অনুগ্রহ লাভের জন্য হাজির হয়, কিন্তু বিপদ চলে গেলে তখন আর তার টিকির দেখা মেলে না, অনেক সময়ে তার কৃতজ্ঞতাবোধও থাকে না। মানুষ ভেবে দেখে না যে একটি বিপদ অতিক্রম করে গেলেও পরবর্তীকালে আবার বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা, আর তখন পুনরায় অন্যের সাহায্যলাভের প্রত্যাশী হতে হবে—এই সত্যটিই এই প্রবাদটিতে ধরা পড়েছে।

মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে তা কৃষির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়। যদিও শীতের

তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তবু—

মাঘের জলে সোনা ফলে।

অন্য একটি প্রবাদেও মাঘ মাসের বর্ষণকে স্বাগত জানান হয়েছে—

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

অবশ্য আর একটি প্রবাদে মাঘ মাসে বৃষ্টিপাত হলে জনসাধারণের সীমাহীন দুর্ভোগ, বিশেষত শারীরিক অসুস্থতার কথা বর্ণিত হয়েছে—

মাঘ মাসে ঝরে দেওয়া,
রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা।

অর্থাৎ প্রজার দুর্ভোগ, দুঃখ-কষ্ট বৃষ্টির কারণে এমনই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে, ফলে রাজশক্তিকে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে নিযুক্ত হতে হয়। তবু সবদিক বিবেচনা করলে মাঘ মাস এক আদর্শ সময়। আর তাই নতুন গৃহ-নির্মাণে কিংবা সংসার জীবনে প্রবেশে মাঘ মাসকেই আদর্শ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ঘর আর বর, মাঘ ফাগুনে কর।

বসন্তকে 'ঋতুরাজ' বলে স্বীকার করা হয়েছে। বসন্তকাল ফাল্গুন আর চৈত্র এই দুটি মাসকে নিয়েই গঠিত। কোকিলের সুমিষ্ট কূজন, মলয় সমীরণ, বকুলের সুমিষ্ট সুবাস, পলাশের মনোরঞ্জনকারী রূপের বাহার—এইসব মিলিয়ে বসন্ত যথার্থ প্রেমের ঋতু, ভোগের ঋতু। ঋতুরাজের যথার্থ আভিজাত্যপূর্ণ রূপের প্রকাশে সকলেই এই সময়ে মোহিত না হয়ে পারে না। কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাস অবলম্বনে রচিত প্রবাদে প্রকৃতির এই সময়কার মনোহর রূপ ধরা পড়ে নি। বরং ফাল্গুন মাসে মাটির অবস্থা কেমন থাকে, এই সময়ে বর্ষণ হলে কি হয়, ফাল্গুন মাসে করণীয় কি—এই সবই ব্যক্ত হয়েছে।

ফাল্গুন মাসে গাছের শুষ্ক পাতাগুলিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিতে হয়। এই পোড়া পাতাগুলি পরে সারের কাজ করে। এছাড়া, গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে গাছের কোঁড়কে ঘিরে দিতে হয়—

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি,
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামকে কাটি॥

পরিণত বাঁশ কাটারও এটাই প্রশস্ত সময়।

ফাল্গুন মাসে চাষের জমির মাটির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

মাঘের মাটি হীরের কাঁঠি, ফাল্গুনের মাটি সোনা।

চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা ॥

ফাল্গুন মাস বৃষ্টি পাতের সময় নয়। তবু যদি এই সময়ে বর্ষণ হয়ই, তাহলে তা বৃথা যায় না। কারণ—

যদি বর্ষে ফাল্গুনে, চিনা কাউনি দ্বিগুণে।

শীতে দেহের চামড়া ফেটে যায়। যতই চেষ্টা করা যাক, তবু গা-ফাটার হাত থেকে এই সময় পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ফাল্গুন মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই গা-ফাটা আর থাকে না—

মাজো ঘষো যাবো না, ফাগুন এলে রব না।

যে বারটি ফুল দিয়ে বৎসর রূপ মালিকা রচিত হয়, সেই মালিকার শেষ কুসুমটি হল চৈত্র। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, চৈত্র বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত, বসন্তের শেষার্ধ কাল। চৈত্র মাস থেকেই গরম অনুভূত হতে থাকে। বুঝতে বাকি থাকে না যে, গ্রীষ্মের আত্মপ্রকাশের আর বিলম্ব নেই। তাই এই সময়ে কেউ যদি কাঁথা ব্যবহার করে, তাহলে বুঝতে হবে শারীরিক দিক দিয়ে সেই ব্যক্তি অসুস্থ—

ঘরের কথা পরকে কয় তারে কয় পর।
চৈত্র মাসে কাঁথা গায়, তারে কয় জ্বর ॥

চৈত্রের রোদে শিশুকে ভাল করে তেল মাখিয়ে রোদে দিতে হয়। ভাদ্রের রোদ দেহের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু চৈত্রের রোদ মঙ্গলকর—

চৈতের রোদ পুতকে, ভাদরের রোদ ভূতকে।

এই সময়ে প্রচুর লাউ ফলে। তাই লাউ খুব সস্তাদরে বিক্রয় হয়। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

চৈতের লাউ থোক বিক্রী।

অর্থাৎ লাউ এই সময় এমনই সস্তা যে তা আর গুণে-গেঁথে বিক্রয় হয় না। ভাদ্র মাসের বান যেমন মানুষের জীবন হানির কারণ রূপে দেখা দেয়, তেমনি চৈত্রের কুয়াশাও মানুষের পক্ষে চরম অমঙ্গলকর—

চৈতের কুয়া, ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

অসময়ে আমরা অনেক কিছু পেতে চাই, কিন্তু সময়ে ছাড়া তা পাওয়া যায় না। কাঁঠাল হল গ্রীষ্মকালের ফল। অথচ চৈত্রে অনেকের এই কাঁঠাল খাওয়ার ইচ্ছে হয়। চৈত্রের রোদ প্রখর হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে কাঁঠাল পাকে না—

চৈত্র মাসে খরাণে, কাঁঠাল খোঁজে পরাণে।

যে ব্যক্তি জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে না, সেই ব্যক্তি যদি অপেক্ষাকৃত কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যের আয়োজন করে, তাহলে বলা হয়—

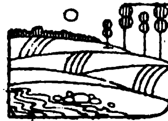
জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।

চৈত্রের রাস অপ্রধান উৎসব। নিমাই কোন উৎসব না করে কেবল এই রাসের অনুষ্ঠান করেছে। তাই সে উপহসিত হয়েছে।

অতএব বিভিন্ন মাসে বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতির অবস্থা জানতে মাস বিষয়ক প্রবাদগুলির ভূমিকা যে অসামান্য তা অনস্বীকার্য।

বাংলা প্রবাদে স্থান

প্রবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে A Proverb is a short sentence based on long experience—অর্থাৎ প্রবাদ হল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম-বাক্যয় প্রকাশ। কিন্তু সকল প্রবাদের ক্ষেত্রে বোধকরি এই বক্তব্য খাটে না, অন্ততঃ পক্ষে যে সব প্রবাদে বিভিন্ন অঞ্চলের নাম স্থান পেয়েছে সেইসব প্রবাদে। বিভিন্ন স্থান এবং সেইসব স্থানের নাম অবলম্বনে যেসব প্রবাদ রচিত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেইসব প্রবাদে বক্তব্যের গুরুত্ব অপেক্ষা লঘু পরিহাস-প্রিয়তাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানের নামের ছন্দের প্রয়োজনে এমন কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করে সেইসব স্থানের পরিচিতি ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছে, যে সেই পরিচিতি প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অবান্তর কিংবা অর্থহীন হয়ে উঠেছে।



যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ মাত্রেরই এক বিশেষ দুর্বলতা থাকে, তাদের অন্যতম হল তার জন্মস্থান বা বাসস্থান। স্বভাবতঃই আমাদের সকলেই জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধির কারণে যেমন তার সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করে অন্যান্য দেশের থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হই, তেমনি নিজেদের বাসস্থানের গৌরব বৃদ্ধির কারণে অন্যান্য অঞ্চলকে হেয় করি। নিজের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যেমন অতিরঞ্জন ঘটাই, বিপরীত ক্রমে অপরের স্থানকে নিকৃষ্ট প্রমাণের ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন ও অবাস্তব অভিযোগ উত্থাপন করি। যদি বা অঞ্চল বিশেষের কোন একটি বৈশিষ্ট্য সত্য হয়ে দেখা দেয়, তবু নিছক সেই বৈশিষ্ট্যে তার সামগ্রিক পরিচয়কে আচ্ছন্ন করার চেষ্টায় আর যাইহোক নিরপেক্ষতা থাকে না। তবু বিভিন্ন স্থান অবলম্বনে রচিত প্রবাদ-গুলি থেকে একদিকে আমরা কিছুটা লঘু পরিহাস প্রিয়তার পরিচয় লাভে যেমন সমর্থ হব, তেমনি বাংলা প্রবাদের বিষয় বৈচিত্র্যেরও সন্ধান লাভের সুযোগ লাভ করব। অবশ্য কোন কোন প্রবাদ থেকে বিশেষ স্থান বা অঞ্চল সম্পর্কে যে কিছু ধারণা করার সুযোগ আমরা পাব, প্রসঙ্গত তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই প্রবাদে কলকাতা মহানগরী কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেখা যাক—

মাটি বেটী মিথ্যা কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা।

অপর একটি প্রবাদের বিষয়ও প্রায় অনুরূপ—

মিথ্যা কথার কিবা কেতা, আজব শহর কলকাতা।

অন্য একটি প্রবাদের বক্তব্য—

রেতে মশা দিনে মাছি এই তাড়িয়ে কলকাতায় আছি।

কলকাতা সম্পর্কিত আর একটি প্রবাদ—

কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥

চারটি প্রবাদ মিলিয়ে কলকাতা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তাতে কলকাতার ভাবমূর্তি যে উজ্জ্বল হয় না তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম নগরী কিংবা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হিসাবে কলকাতা মহানগরীর যে গুরুত্বই থাক, যতই কেন দ্রষ্টব্য বস্তুর সমারোহ এখানে ঘটুক, তবু প্রবাদ রচয়িতারা মিথ্যাচারে পূর্ণ, মাছি ও মশার আক্রমণে জর্জরিত যে কলকাতা তাকেই চিত্রিত করেছেন। প্রবাদে কলকাতা আকর্ষণীয় শহর থাকেনি। এখানকার সবকিছুই বিপরীত—গুড় মিষ্টত্বহীন, এমনকি কলকাতার তেঁতুল তাও তেঁতুলের গুণ বর্জিত।

আজকের দিনে না হোক, এক সময়ে বাগবাজারের রসগোল্লা ছিল সুবিখ্যাত। বাগবাজার কলকাতার প্রাচীন অঞ্চল। এই অঞ্চলকে নিয়ে রচিত প্রবাদে ময়রাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লক্ষিত হয়, সেইসঙ্গে এই অঞ্চল যে মুদি ও কলাকার অধ্যুষিত তাও বলা হয়েছে প্রবাদটিতে—

ময়রা মুদি কলাকার
তিন নিয়ে বাগবাজার।

দর্জিপাড়া সম্পর্কে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কুস্তি, কোর্তা, কেতাব কাড়া
এ কয় নিয়ে দর্জিপাড়া।

দর্জিপাড়া বলে 'কোর্তা'র প্রসঙ্গটি স্বতঃই এসেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলে এক সময়ে যে কুস্তিগীরদের আধিপত্য ছিল, সেই তথ্যটুকুও প্রবাদটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

কালীঘাট বহুল পরিচিত তীর্থস্থান হওয়া সত্ত্বেও সেই অনুযায়ী প্রবাদ কিন্তু রচিত হয় নি। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।

প্রবাদটির মূল বক্তব্য হল অযোগ্য ব্যক্তির অর্থহীন প্রয়াস।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কালীঘাটের কাঙালী।

তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে উপার্জনের তথা খাদ্যের আশায় সকল তীর্থ স্থানের মত কালীঘাটেও এদের সমাবেশ লক্ষ্য করার মত। তাছাড়া 'কালীঘাটের কুকুর' প্রবাদটি ত আছেই।

কলকাতার অন্তর্গত চেতলা একাধিক প্রবাদের বিষয় হয়েছে। 'চেতলার হাট' খুব বিখ্যাত। একটি প্রবাদে এই হাটের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে—

আশীর্বাদ করি মাথার কাটে,
মেগে খাওগে চেতলার হাটে।

আর একটি প্রবাদে চেতলার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

চিঁড়ে চেটাই বোঁতলা, এই তিন নিয়ে চেতলা।

কলকাতার বেলেঘাটাও প্রবাদে অনুল্লিখিত থাকে নি। বলা হয়েছে—

যার নেই পুঁজিপাটা, সে যাক বেলেঘাটা।

অর্থাৎ নিঃস্ব, রিক্ত, সহায়সম্বলহীন ব্যক্তির কাছে বেলেঘাটা হল আদর্শ স্থান। কিন্তু এ প্রবাদের বক্তব্য আজও কি সত্য? একসময়ে অবশ্য এখানে চালের আড়ত ছিল আর তাই ভিক্ষাও ছিল সুলভ। সেই কারণেই সম্ভবত রিক্ত মানুষকে বেলেঘাটায় যাবার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকবে।

সুন্দরবনের খ্যাতি সুদূরপ্রসারী। বিশেষত এখানকার গভীর অরণ্যের বাঘ যা নাকি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' নামে পরিচিত, তা তো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। অথচ একটি প্রবাদে সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ প্রাণীরূপে ঘুঘুকে অভিহিত করা হয়েছে—

অযোধ্যার রঘু সুন্দরবনের ঘুঘু।

অবশ্য অপর একটি প্রবাদে সুন্দরবনের বাঘের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে—

দোজবরের মাগ, সোঁদর বনের বাঘ।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুন্দরবনের বাঘের মত দর্জাল হয় বলে প্রবাদটিতে বলা হয়েছে। এরা হতভাগ্য স্বামীকে দিয়ে যা খুশী তাই করিয়ে নেয়। সুন্দরবনের বাঘের মতই এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা নাকি খুব কঠিন। অবশ্য প্রবাদের সত্যতা কতখানি তা কেবল ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারেন!

'মুড়োগাছা'র পরিচয় সম্বলিত একটি প্রবাদ হল—

তাল বাবলা ছুঁচো বোঁচা, এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

মুড়োগাছায় এক সময়ে তাল বাবলা গাছের আধিক্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে ছুঁচো আর বোঁচার আধিক্য ছিল, মুড়োগাছার শত নিন্দুক হলেও এমন অপবাদ স্বীকার করে নেওয়া খুবই কঠিন। ছন্দের প্রয়োজনেই ছুঁচো এবং বোঁচার আমদানী ঘটেছে অনুমান করা চলে।

২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী কি একসময় ফলমূলের জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল? প্রবাদের বক্তব্য অনুযায়ী কিন্তু তাই স্বীকার করতে হয়—

ফল মূল শাকের আঁটি এই তিন নিয়ে নৈহাটী।

পানিহাটীর রাস বিখ্যাত। সেইসঙ্গে এখানকার মানুষ যে নিষ্কর্মা এবং অলস প্রকৃতির, কেবল আমোদ-আহ্লাদ, খেলা আর মজা নিয়ে দিন কাটায়, সেই নির্মম সমালোচনাও স্থান পেয়েছে—

রাস তাস জোরের লাঠি, এই তিন নিয়ে পানিহাটী।

অপর একটি প্রবাদেও পানিহাটীর মানুষদের অলস প্রকৃতির কথা ফলাও করে বলা হয়েছে—

কাজের বেলায় আমড়া আঁটি
বাড়ী কোথায় না পানিহাটী।

বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত বালীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে একটু বিচিত্র-ভাবে। বলা হয়েছে বালী গ্রামের লেখকেরা ভাল। পড়াশুনার ব্যাপারে এই গ্রাম খুব প্রসিদ্ধ।

কাগজ কলম কালি, এই তিন নিয়ে বালী।

সচরাচর প্রবাদে স্থান বিশেষের প্রশংসা প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। বিরূপ মন্তব্য, তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ইত্যাদিই প্রবাদগুলিতে বেশি। সেদিক দিয়ে বালীর ভাগ্যে যে প্রশংসা জুটেছে, তাকে বিচিত্র বলে স্বীকার করতে হবে বৈকি!

কিংবদন্তী আছে যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষ নাকি ভীষণ মামলাবাজ হয়। কিন্তু তা নিয়ে কোন প্রবাদ রচিত হয় নি। অথচ উত্তরপাড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে—

পেয়েছি কোঁদলের গোড়া, আর যাবনা উত্তরপাড়া।

অর্থাৎ উত্তরপাড়ার মানুষেরা ভীষণ ঝগড়াটে হয়। তাই কোঁদলের গোড়াকেই যখন একবার পাওয়া গেছে, তখন আর উত্তরপাড়ায় যাওয়ার প্রয়োজন কি? আবার হুগলীর পরিচয়বাহী প্রবাদটিতে স্থান পেয়েছে ঠোঁটে জমাবার মিশি,

মাথাঘসা আর সেইসঙ্গে মোগলদের প্রসঙ্গ—

মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা।

অর্থাৎ কিনা হুগলী গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে আগে থেকেই মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানকার দর্শনীয় এবং লভ্য বস্তু এগুলিই। অতএব এগুলি ছাড়া অন্য কিছু দেখার অথবা লাভের বাসনা থেকে থাকলে নিদারুণভাবে নিরাশ হতে হবে। কিন্তু হুগলীর অধিবাসীরা কি এই বক্তব্য নির্দ্বিধায় মেনে নিতে সম্মত হবেন?

ঠিক তেমনিভাবে বৈদ্যবাটীর পরিচয় কলাপাতা আর কাঠ রপ্তানীর জন্যে।

কলাপাতা, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটী।

মানভূম কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল বিহারের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে অবশ্য মানভূম পশ্চিমবঙ্গেরই একটি জেলা। এই সীমান্তবর্তী জেলাটির মানুষেরা পানের বড় ভক্ত। তাই তো মানভূমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

মুখে পান হাতে চুন, তবে জানবে মানভূম।

ফরাসডাঙ্গা কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু প্রবাদে তার কোন উল্লেখ নেই। ফরাসডাঙ্গার যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা মোটেই এখানকার মানুষের অনুকূলে নয়।

গাঁজা গুলি, অন্ন ভাঙ্গা তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা।

অর্থাৎ ফরাসডাঙ্গার মানুষেরা নানাবিধ নেশায় নেশাগ্রস্ত, এই বক্তব্যটিই এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তবে শুধু ফরাসডাঙ্গার মানুষদের দুঃখিত হবার কারণ নেই। প্রবাদের রাজ্যে কেবল এরাই যে কলঙ্কিত তা নয়, এদেরও সাথী আছে। সরগুনা সম্পর্কেও অনুরূপ প্রবাদ রচিত হয়েছে—

গাঁজা তাড়ি প্রবঞ্চনা, তিন নিয়ে সরগুনা।

তার মানে ফরাসডাঙ্গার মানুষের মত সরগুনার অধিবাসীরা কেবল নেশাগ্রস্তই নয়, সেই সঙ্গে তারা আবার ঠক ও প্রবঞ্চক। অর্থাৎ গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত নেশাগ্রস্ত বিশেষণের সঙ্গে প্রবঞ্চক বিশেষণকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

নদীয়াকে নিয়ে রচিত প্রবাদে নদীয়ার কোন প্রশংসা করা হয়নি, বেশ বোঝা যায় নদীয়ার কেউ এই সব প্রবাদ রচনা করেননি। নদীয়া নিয়ে রচিত একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কাঙ্গাল বাঙ্গাল খচ্চে, তিন নিয়ে নদ্যে।

অন্য একটি প্রবাদেও সুর একই—

বাঁশ বাকস ডোবা, তিন নদ্যের শোভা।

নদীয়া জেলার গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের কাছে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম উলো, এটি আবার 'বীরনগর' নামেও পরিচিত। সেই 'উলো' সম্পর্কে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

পোল পাগল পুলো, তিন নিয়ে উলো।

অপর একটি প্রবাদেও উলোর প্রসঙ্গ এসেছে, তবে সেইসঙ্গে অগ্রদ্বীপ, শান্তিপুর এবং গুপ্তি পাড়াও স্থান পেয়েছে—

উলোর মেয়ের কুলজি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা,
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।

প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যে উলোর মেয়েরা প্রতিপক্ষের পূর্বপুরুষদের গালাগাল দেওয়ায় খুব পটু, আর বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে চার ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত 'অগ্রদ্বীপ' গ্রামের মেয়েরা খোঁপা বাঁধায় খুব পটু। নবদ্বীপের নিকটবর্তী শান্তিপুরের মহিলারা হাতনাড়ায় পটুত্বের অধিকারিণী, সর্বোপরি ছোট-বড় কথা বলায় পটুত্বের অধিকারিণী গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী ও নবদ্বীপের মধ্যবর্তী গ্রাম গুপ্তি পাড়া স্বতন্ত্রভাবেও প্রবাদে স্থান পেয়েছে—

বাঁদর সভাকর মদের ঘড়া, এই তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।

উলো এবং গুপ্তিপাড়াকে অন্য একটি প্রবাদেও উল্লিখিত হতে দেখা যাচ্ছে—

উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বঁাদর হালিসহরের ত্যাঁদড়।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলাস্থিত শান্তিপুর একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। শান্তিপুর বিখ্যাত তাঁতের কাপড়ের জন্য। তাছাড়া বৈষ্ণবদেরও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। শান্তিপুর সম্পর্কিত প্রবাদেও শান্তিপুরের এই পরিচয়ই প্রকাশিত হয়েছে—

তাঁতী, গোঁসাই, পচা ভুর, তিন নিয়ে শান্তিপুর।

'পচা ভুর' অর্থে ঝরঝরে গুড়। আর একটি প্রবাদে শান্তিপুরের বৈষ্ণবীদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে—

শান্তিপুর রসের সাগর, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর।

আগেকার দিনে নেড়া-নেড়ীদের কাণ্ড-কারখানার ইঙ্গিত প্রবাদটিতে বর্তমান।

আবার বৈষ্ণব কুল চূড়ামণি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শান্তিপুরের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। শান্তিপুরের গৌরব তিনি। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

আকাশ থেকে পড়ল এটা ঘুনে খেকো চান্দ।
নিমাই মোড়ল না হইলে শান্তিপুর আন্ধ।

দিনাজপুরের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, তাই দিনাজপুর নিয়ে রচিত প্রবাদে এই কৃষিজ পণ্যটি উল্লিখিত হয়েছে—

চাল চিঁড়ে গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের পরিচয়জ্ঞাপক প্রবাদটি হল এইরকম—

কুঁজড়া, কাওয়ারী, সুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

'কুঁজড়ো' অর্থে ঝগড়াটে বা কলহপ্রিয় এবং 'কাওয়ারী' অর্থে 'কাওয়া'।

এক পিঠে চিঁড়ে এবং আর এক পিঠে গুড় নিয়ে যেতে অনেককেই দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রবাদে সুনির্দিষ্ট ভাবে এই রূপ মানুষকে রঘুনাথপুরের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

হাঁদে চিড়া হুঁদে গুড় তবে জানবি রঘুনাথপুর।

'বীরভূম' সংক্রান্ত প্রবাদটিতে বীরভূমের অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্যের পরিচয়টুকু বিধৃত হয়েছ—

পোস্ত টক কলাইয়ের ডাল, তিন নিয়ে বীরভূমের চাল।

বর্ধমান নিয়ে একাধিক প্রবাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি প্রবাদে বর্ধমানে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে—

আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান, এই তিন নিয়ে বর্ধমান।

কিন্তু অপর একটি প্রবাদে বর্ধমানের মানুষের হাস্যকর বিলাসিতার কথা তুলে ধরা হয়েছে—

লম্বা কোঁচা, কাছার টান, তবে জানবে বর্ধমান।

বর্ধমান নিয়ে রচিত অন্য প্রবাদে এখানে যে ময়রা ও মুসলমানের সংখ্যা অধিক আর তাছাড়া এখানে মদ প্রস্তুত হয় অথবা বর্ধমানবাসী মদ্যাসক্ত, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে—

মদ ময়রা মুসলমান—এ তিন নিয়ে বর্ধমান।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কাছা উঁচু কোঁচা টান, তার বাড়ি বর্ধমান।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 'কর্জনা' স্থানটি ছিল এক সময়ে ডাকাত অধ্যুষিত।

একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

যদি গেলে কর্জনা
তবে মানে মানে ঘর যানা।

অর্থাৎ কর্জনায় কোন ক্রমে কেউ উপস্থিত হলে তার প্রধান কর্তব্য মানে মানে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে উপনীত হওয়া, নতুবা এখানে ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা।

অনুরূপভাবে মুর্শিদাবাদের একটি অঞ্চল 'গোকর্ণ' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

গোকর্ণে কে কার মেসো।

অর্থাৎ 'গোকর্ণ'ও ছিল দস্যু অধ্যুষিত। তাই এখানে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কেউ সহজে সম্পর্ক স্থাপনে রাজি হত না বিপদাশঙ্কায়।

মুর্শিদাবাদ প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী। এখানকার সিল্কের কাপড়ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রবাদের রাজ্যে বোধ করি এখানকার মানুষেরা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শাস্তি লাভ করেছেন। কারণ এঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

চোর চোট্টা হারামজাদ, তিনি নিয়ে মুর্শিদাবাদ।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

অম্বিকানগর গেছে গানে
খাতড়া গেছে দানে
রাইপুর গেছে বানে।

এখানে বলা হয়েছে অম্বিকানগরের রাজা ছিলেন অতিশয় সঙ্গীতানুরাগী, সঙ্গীতে উৎসাহ দিতে গিয়েই তিনি সর্বস্বান্ত হন। অপর পক্ষে খাতরার রাজা ছিলেন দানশীল, তাঁর সর্বনাশ ঘটেছে বদান্যতায়, আর রাইপুর বন্যায় হয়েছে বিধ্বস্ত। বাঁকুড়ার তিনটি অঞ্চলের ধ্বংস হবার তিনটি পৃথক কারণ বর্ণিত হয়েছে প্রবাদটিতে।

বাঁকুড়ার মানুষ যে প্রচুর পরিমাণে মুড়ি খেতে অভ্যস্ত, একটি প্রবাদে সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

আঁকুড়া বাঁকুড়া বাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি।

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ঘটালে বলা হয়—

কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাসকাটা।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া জেলায় এই প্রাচীন

শহরটি অবস্থিত। বিষ্ণুপুরের পান আর মতিচুর খুব বিখ্যাত। প্রবাদে তাই বিষ্ণুপুরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

গুলি খিলি মতিচুর, এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

পঞ্চকোট সম্পর্কিত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

বাঁকা সিঁথে লম্বা ছোট, তবেই জানবে পঞ্চকোট।

অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা নগরী বহুকালের বিখ্যাত। কিন্তু কলকাতার মত ঢাকার ভাগ্যেও জুটেছে শুধু বিরূপ সমালোচনা। এমন কি যে ঢাকার কুটনিদের কথার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত, তা সত্ত্বেও ঢাকার মানুষ বেরসিক, অন্যান্য অপবাদের সঙ্গে এই অপবাদও দেওয়া হয়েছে—

বেহায়া বেরসিক বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা।

অবশ্য বরিশালে যে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়, আর সেই সঙ্গে সেখানে যে প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি লেগে থাকে একটি প্রবাদে সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ধান খুন লাল, তিন নিয়ে বরিশাল।

চট্টগ্রাম একাধিক প্রবাদে স্থান পেয়েছে। 'মশা মারতে কামান দাগা'—এই অর্থে চট্টগ্রাম সংক্রান্ত প্রবাদগুলি রচিত হয়েছে। যেমন—

ক. দেড়বুড়ির ভাড়ানী, চাটগাঁয়ে বরাত।

খ. উদূখলে খুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত।

বাংলা দেশকে উপস্থিত করা হয়েছে এইভাবে—

সাজা বাজা কেশ, বাংলা দেশ বেশ।

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরও একটি প্রবাদে স্থান পেয়েছে।

শুনতেই শোনা যায় সোনার গাঁ বিক্রমপুর।

প্রবাদটির অর্থ হল যে বিক্রমপুরকে 'সোনার গাঁ' বলে প্রচার করা হলেও আসলে এই গ্রামের তেমন কিছু ঐশ্বর্য নেই যার জন্যে তার সম্পর্কে এবংবিধ বিশেষণ ব্যবহৃত হতে পারে। তাই প্রবাদ রচয়িতা বলতে চেয়েছেন যে, বিক্রমপুরের খ্যাতি, ঐশ্বর্য সবকিছুই কেবল শোনার জন্যে, চাক্ষুষ করতে গেলেই বিপদ। শোনা কথার সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রের কোনই মিল নেই।

মৈমনসিংহ সম্পর্কিত প্রবাদটিতে বিশেষ করে এখানকার জমিদার আর জঙ্গলের আধিক্যের কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে। সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হয়েছে গরুর শিঙ—

জমিদার জঙ্গল আর গরুর শিঙ,
এই তিন নিয়ে মৈমনসিং।

বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে উড়িষ্যার সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সূত্রে বহুদিনের পরিচয়। কয়েকটি প্রবাদে তাই উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। অবশ্য কোন প্রবাদেই কটক সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয় নি। না অনুকূলে, না প্রতিকূলে। একটি প্রবাদ হল—

ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যাওয়া।

আর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

উঠল বাই ত কটক যাই।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

নিত্য রাজা কটক যায়, পথের সম্বল ঘরে বসে খায়।

নীলাচল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই তীর্থস্থানে যাতায়াত করছে। আগেকার দিনে যখন যাতায়াতের তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না, ছিল না ট্রেন কিংবা অন্য কোন দ্রুতগামী যানবাহন, তখন পুণ্যলোভী মানুষ জীবন বিপন্ন করে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এখানে এসে উপস্থিত হত। দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার মত একদিকে তাই দরকার হত পাথেয় আর অপরদিকে দৈহিক শক্তি, বিশেষত হাঁটার ক্ষমতা। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে চল নীলাচল।

'বামুনডি'র বিশেষত্ব হল—

চণ্ডী, সপিণ্ডী, কুশণ্ডী, তিন নিয়ে বামুনডি।

নীলাচল ব্যতীত অপর যে সব তীর্থস্থান অবলম্বনে বেশ কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হল কাশী বা বারাণসী। কাশীতে বহু বিধবা বসবাস করে থাকে। তাছাড়া সন্ন্যাসীদের ভীড়তো আছেই, সর্বোপরি আছে বিশ্বনাথের বাহন ষাঁড়ের আধিক্য। তাই কাশীর কথা বলতে গিয়ে এই সুপ্রাচীন নগরী এবং বহুল পরিচিত তীর্থস্থানের কোন মাহাত্ম্য কথা প্রকাশ না করে বলা হল—

ষাঁড় রাঁড় সন্ন্যাসী এই তিন নিয়ে হল কাশী।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।

বিশ্বনাথের অনুচরেরা সব ভূত-প্রেত। আবার কাশীতে সেই বিশ্বনাথের

অধিষ্ঠান। তাই কাশীতে তাঁর অনুচরদেরও অবস্থান। আসলে কাশীর অধিবাসীদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে—

কাশীতেই ভূতের বাসা।

কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিত অর্থহীন এক কাকতালীয় ব্যাপার বোঝাতেও একটি প্রবাদে কাশীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার।

অপর একটি প্রবাদে কাশীধামে পুণ্যলোভাতুর সকলে যেতে চাইলেও যেতে পারে না, কেবল ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এহেন মহাতীর্থে উপস্থিত হতে পারেন, সেকথা বলা হয়েছে—

পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বক।
গেঁড়ি গুগলি এরা বলে—আমরাও সভ্য॥
ডেঙরা কাক বলে—আমি করব একাদশী
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী॥

কাশীধামের পর অপর এক তীর্থ ক্ষেত্র বৃন্দাবনের প্রসঙ্গে রচিত প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গেতর ভারতের কেবল সেই সকল তীর্থস্থানগুলিই বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছে, যেগুলির সঙ্গে বাঙ্গালীর দীর্ঘদিনের যোগ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সূত্রেই মথুরা, বৃন্দাবন, নীলাচল ইত্যাদি তীর্থস্থানসমূহের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। শ্রীকৃষ্ণ আবার তুলসীভক্ত। তাই একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

যেখানে তুলসীবন, সেখানে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনধামে অবস্থানকারীদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মাছ খাইনা, মাংস খাইনা, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এসেছি বৃন্দাবন॥

হিন্দুদের বহু অভিলষিত, শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্মৃতিপূত বৃন্দাবন যে আসলে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত, একটি প্রবাদে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—

হরি পদে থাকলে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদ—

হরি বলে মন, চললেন গোবর্দ্ধন।

বৈদ্যনাথ ধাম আর একটি পরিচিত তীর্থ। কিন্তু এখানকার পরিচয় দিতে

গিয়ে বলা হয়েছে—

কুঁড়ের বাথান বৈদ্যনাথ।

পিতৃতীর্থ গয়া চৈতন্যদেবের সূত্রেই বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছে, একাধিক প্রবাদে তার প্রতিফলনও ঘটেছে। যেমন—

ক. গয়াতে মরেছে বাপ-বেটা।

খ. মুখ ভাকুটি কপটমায়া, লোক জড় করে যাচ্ছে গয়া।

গ. বাপ থাকতে বিদ্যমান, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান।

বিরাট ব্যবধান বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কোথায় হরিদ্বার, কোথায় গঙ্গাসাগর।

আমাদের রাজধানী দিল্লী একাধিক প্রবাদেই উল্লিখিত হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই দূরত্ব বোঝাতে। যেমন—

হিল্লী দিল্লী করে বেড়ান।

কিংবা, হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া।

একটি প্রবাদে আবার বলা হয়েছে—

দিল্লীর ওপার ত বেগার নেই।

বিভিন্ন স্থান অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলি থেকে একটা বিষয় বেশ পরিষ্কারভাবে জানা যায় তা হল—নিজের স্থান সম্পর্কে প্রবাদ রচয়িতারা কোন প্রবাদ রচনা করেন নি। সবসময়ে অন্যস্থান সম্পর্কেই প্রবাদগুলি রচিত হয়েছে। আর তাই প্রবাদ রচয়িতারা অতখানি নির্মম হতে পেরেছেন ঐসব স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবাদের বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থই মুখ্য হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন স্থান অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলির অধিকাংশে বাচ্যার্থই মুখ্য হয়ে উঠেছে। খুব অল্পসংখ্যক প্রবাদেই ব্যঙ্গার্থ প্রকাশিত হয়েছে। যাইহোক পরিশেষে আবার এই প্রবন্ধের ভূমিকার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় যে, এইসব প্রবাদে মজাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই সেই দৃষ্টিতে না দেখলে অনেকেই নিজ নিজ স্থানের বিরূপ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

বাংলা প্রবাদে কৃষি ও কৃষক

কৃষিপ্রধান আমাদের এই বাংলা দেশ। এখানকার জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি হ'ল কৃষিভিত্তিক। অতএব এ হেন বাংলা দেশের প্রবাদে কৃষি ও কৃষক যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা প্রবাদে এ হেন কৃষি এবং কৃষককে কি ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করবো।



প্রসঙ্গত প্রথমেই বলে নেওয়া যেতে পারে যে বাংলা প্রবাদে কৃষি এবং কৃষককে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। প্রবাদে কৃষির গুরুত্বকে যথোচিতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলেও, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সোনার ফসল উৎপন্ন হয় সেই কৃষকদের কিন্তু মোটেই উজ্জ্বল ভাবমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়নি প্রবাদগুলিতে। বিপরীতক্রমে প্রবাদে যে কৃষককে আমরা পাই, সেই কৃষক হল হীন, চরম নির্বোধ, অকর্মণ্য এবং মূর্খ। আসলে যে কৃষক রোদে পুড়ে জলে ভিজে সমগ্র জাতির অন্ন সংস্থান করে দেয়, তার প্রতি এরূপ অকৃতজ্ঞ আচরণের মধ্যে এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিহিত রয়েছে।

কৃষককে চিরকালই সমাজ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য আমাদের সমাজ কোনদিনই দেয়নি। অতএব যে কৃষককে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করে আসা হয়েছে তাদের প্রতি সেই শোষণকে অন্যায়ভাবে অব্যাহত রাখার একটা অপচেষ্টার সন্ধান প্রবাদ গুলির মধ্য থেকে আমরা পাই। প্রবাদে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে কৃষিকাজ খুব একটা সোজা ব্যাপার নয় এবং এ কাজে সকলে পারদর্শীও হয় না। অথচ এ হেন কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত যে চাষা, একাধিক প্রবাদেই তার বুদ্ধির স্থূলতা সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

চাষার বুদ্ধি বড় সরু।
আপনার গরুকে বলে—গুখেকোর বেটার গরু ॥

অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চাষা যখন নিজের গরুকে ভৎ´সনা করে তখন প্রকারান্তরে সে শুধু নিজেকেই না, এমন কি নিজের পিতৃদেব সম্বন্ধেও অশালীন মন্তব্য করে বসে।

চাষার স্থূলবুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপক আর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

যেমন চাষার বুদ্ধি বলে, পাড়াগাঁয়ের মাঠে।
নদী না দেখে নেঙটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাটে ॥

স্পষ্টতঃই এখানে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, চাষা হাটের মাঝখানে উলঙ্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান, কারণ সে স্নানের জন্যে প্রস্তুত। অথচ কোথায় বা নদী আর কোথায় বা তার জল। সর্বসমক্ষে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে কতখানি অশালীন, তাও তার কাছে বোধের অগম্য। কিংবা লাজ-লজ্জা হীন যে চাষা তার কাছে এতাদৃশ আচরণ যে কোন একটা ব্যাপারই নয়, তারও ইঙ্গিত যেন প্রবাদটিতে পাওয়া যায়।

শালগ্রাম শিলা হলেন নারায়ণের প্রতীক। হিন্দুমাত্রের কাছেই তাই এ হেন শালগ্রাম শিলার বড়ই কদর। কিন্তু এ হেন শালগ্রাম শিলার মর্যাদা উপলব্ধি কিংবা মর্যাদা রক্ষা কোনটিই হয় না চাষার দ্বারা। তার কাছে অপর পাঁচটি প্রস্তর খণ্ডের মতন শালগ্রাম শিলাও একটি সাধারণ প্রস্তর খণ্ড মাত্র তার বেশি কিছু নয়। তাই ত বলা হয়েছে—

চাষার হাতে শালগ্রামের দশা বা মরণ।

স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন চাষার পরিহাস :প্রিয়তার মধ্যেও তার বুদ্ধির স্থূলত্বই প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে বসে :

চাষার ঠাট্টা কাস্তের ঠোকর।

কিংবা, চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোকর।

চাষা একমাত্র চাষের কাজেই দড়, অন্য জীবিকার ক্ষেত্রে কিন্তু তার চরম ব্যর্থতা। তাইত একটি প্রবাদে যেখানে বলা হয়েছে—

'চাষা জমি চষতে ভাল', সেখানে অন্য একটি প্রবাদে অভিব্যক্ত হয়েছে, চাষার অন্যবিধ কর্মে চরম ব্যর্থতার কথা :

চাষ করে খাচ্ছিল আবদুল, ছিল ভাল,
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে ম'ল।

এক্ষেত্রে, 'আবদুল' কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় সমগ্র কৃষক সমাজেরই একজন প্রতিনিধি সে। কিংবা বলা চলে প্রতীক চরিত্ররূপে তাকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে।

চাষা যখন, তখন সে ভাল-মন্দ বিচার ক্ষমতা রহিত। অন্ততঃপক্ষে তার মধ্যে না আছে সূক্ষ্ম রসবোধ, না আছে উৎকৃষ্ট জিনিষের রসাস্বাদন করার ক্ষমতা। তা না হলে আর বলা হয়—

চাষা কি জানে মদের স্বাদ।

অন্য একটি প্রবাদেও প্রায় একইরূপ বক্তব্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

অতএব এ হেন নির্বোধ চাষার যদি অপরের কল্যাণ করার সৎ উদ্দেশ্যও থাকে, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তার মাধ্যমে আর ফলপ্রসূ হয় না, বরং বিপরীত ব্যাপার ঘটে যায়। তাই চাষার হিতকারী প্রয়াসেও খুব একটা আশান্বিত হবার কিছু নেই, বরং আশার থেকে সেক্ষেত্রে আশঙ্কার মাত্রাই অধিক হয়ে দেখা দেবার কথা। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

চাষা যদি করে হিত,
করতে করতে বিপরীত।

এইবার চাষাকে কিরূপ অলস প্রকৃতির করে উপস্থিত করা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। অমাবস্যায় হাল চালনা করতে নেই, লোক-সংস্কার অনুযায়ী অমাবস্যায় হালচালনা করলে বলদের বাত হয়। কৃষির কাজে চাষার মস্ত সম্বল বলদ। অতএব এ হেন বলদের বাতের আশঙ্কা থাকায় চাষা স্বভাবতঃই অমাবস্যার দিনগুলি চাষের কাজ থেকে বিরত থাকে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে যে চাষা অমাবস্যার জন্যেই ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে আর এই প্রতীক্ষার মূলে যত না বলদের জন্য তার ভাবনা, তার থেকে ঢের বেশি আগ্রহ তার নিজের অবকাশ লাভের প্রতি। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে।

প্রবাদে যে শুধু চাষার আলস্য কিংবা তার নির্বুদ্ধিতার প্রতিই বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নয়, একটি প্রবাদে তার রূপ নিয়েও চরম কটাক্ষ

করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

চাষার মুখ না আখার মুখ।

এখানে 'আখার মুখ' বলতে উনানের মুখকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ চাষার মুখ মণ্ডল এতই শ্রীহীন যে তা অনেকাংশে উনানের মুখেরই সমান।

একটি প্রবাদে চাষার তুলনায় সামান্য একটি কাস্তের গুরুত্বকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে—

চাষা মরে সেও ভাল তবু পরের কাস্তে না হারায়।

এক্ষেত্রে বক্তব্য অনেকটা এই রকম—চাষা মারা গেলে তেমন ক্ষতি নেই। যেহেতু চাষা তাই তার প্রাণের যেন কোন মূল্য নেই। কিংবা একজন চাষা মারা গেলে অনায়াসে অপর চাষা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন ক্রমে পরের কাস্তে হারান চলবে না। যেন একটি কাস্তে যদি হারিয়েও যায়, তো আর দ্বিতীয় কাস্তে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবেনা, এমনই জিনিসটি দুর্লভ এবং মহার্ঘ।

না, প্রবাদে শুধু চাষা কিংবা চাষার পিতাকে নয়, সেই সঙ্গে তার পুত্র-কন্যার প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে চাষার ছেলে পাশা খেলতে বসে ক্রমাগত দশের কথা বলে। এর কারণ বুঝতে দেরী হয় না। যেহেতু চাষার ছেলে, তাই অন্যের দেখাদেখি পাশা খেলতে বসলেও খেলার হিসাব তার আয়ত্তে নয়, তাই সব দানেরই মূল্য তার কাছে এক—

চাষার ছেলে পাশা খেলে নিত্য বলে দশ।

যে চাষার কন্যা জ্ঞান হওয়া অবধি বাবার দৌলতে চাষের কাজের সঙ্গে পরিচিত সেই কন্যাকেই দেখি বেগুন ক্ষেত দেখে বিস্মিত হতে। এক্ষেত্রে তার মূঢ়তার আধিক্য অপেক্ষা ন্যাকামিই যেন অধিকতর প্রকটিত—

নিত্য চাষার ঝি
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কি।

চাষার মধ্যে ভারসাম্যেরও বড়ই অভাব, অন্ততঃ প্রবাদ সেই কথাই বলে। যদিও স্থিতধী মানুষের সংখ্যা নেহাৎই কম, সুখে-দুঃখে ক'জন মানুষের পক্ষে সমান থাকা সম্ভব? তবু আক্রমণের বেলায় চাষাকেই উপলক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এমনিতে সে পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক নয়। নেহাৎ অভাবে বা প্রয়োজনে না পড়লে সে পরিশ্রমের পথে পা বাড়ায় না। আবার

অবস্থা ভাল হলে তখন ধরাকে তার সরা জ্ঞান। প্রবাদের ভাষায়—

পড়লে চাষা গরু খায়, উঠলে চাষা বামুন খায়।

প্রবাদটির বাচ্যার্থ যাই হোক ব্যঙ্গার্থ হল, অবস্থার বৈগুণ্য ঘটলে চাষা গরুকে খাটায়, বিপরীতক্রমে অবস্থার উন্নতি ঘটলে ব্রাহ্মণকেও মান্য করেনা।

পরিশ্রম না করেই চাষা কি রকম ফললাভের আনন্দে অকারণে বিভোর থাকে তার পরিচয় মেলে একটি প্রবাদে—

মনে মনে হাসে চাষা,
কাঁধে লাঙ্গল জাত ব্যবসা।

অর্থাৎ জাত-ব্যবসা তারা কৃষিকর্ম হলেও, কাঁধের লাঙ্গলখানি ধরেই চাষার ভাবখানা যেন তার কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হ'ল।

প্রবাদে যে একতরফা ভাবে চাষাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাতে শুধু জর্জরিত করা হয়েছে তা নয়, কোন কোন প্রবাদে তার করুণ জীবনের কথা, অন্তহীন বঞ্চনার কথাও স্থান পেয়েছে, তবে তা নেহাৎই বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে।

যে চাষা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সোনার ফসল উৎপন্ন করে, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, বিচিত্র এক সামজিক তথা অর্থনৈতিক কারণে সেই হতভাগ্য চাষাকে প্রচণ্ড অন্নাভাবে, অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। কারণ খুবই স্পষ্ট, তার পরিশ্রমের ফল সে নিজে সার্থকভাবে ভোগ করতে পারেনা। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

হালিয়া হাল চষে কৃষাণ বোনে ধান।
আগে খায় চোরচোট্টা পিছে খায় কৃষাণ ॥

এখানে 'চোরচোট্টা' বলতে নিছক যারা মাঠের ফসল সকলের: সঙ্গোপনে চুরি করে নিয়ে যায় তাদের বোঝান হয়নি, বোঝান হয়েছে ভদ্রবেশী চোরদের অর্থাৎ সেইসব সুদখোর মহাজনদের, যারা দুঃস্থ চাষাকে চড়া সুদে দাদন দিয়ে তার ইহকাল-পরকাল—দুইয়েরই সর্বনাশ ঘটায়।

চাষা আজীবন দুঃখ ভোগের শিকার। বেচারীরা সুখ কি তা জানেনা আর এই দুঃখ ভোগের কারণ কি তাও সম্ভবত তাদের অজানা। বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের অন্যের শোষণের শিকার হয়েই জীবনটাকে শেষ করতে হয়। একটি প্রবাদে পরিহাসের মধ্য দিয়ে সেই নির্মম সত্যটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে—

চাষার শুধু এগারো মাস দুঃখ আর সকল মাস সুখ।

অথচ দেশের সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক হল এই অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়। অসংখ্য প্রবাদে যদিও চাষাদের সম্পর্কে যারপর নাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অথবা পরিহাস করা হয়েছে কিন্তু অন্ততঃ একটি প্রবাদে চিরন্তন সত্যটিকে স্বীকার করে বুঝিবা চাষাদের নিদারুণভাবে আক্রমণ করার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। তাই সমগ্র দেশের সমৃদ্ধির মূল চাষাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে—

চাষার বলেই দেশটা নাচে, সোনা ফলে গাছে।

চাষাকে নিয়ে আরও অনেক প্রবাদ রচিত হয়েছে। কোনটিতে প্রকাশিত হয়েছে চাষার আশার কথা, কোনটিতে বা স্থান পেয়েছে চাষার পরিচয়ের মূল কিংবা বলা চলে তার অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপাদান যে ক্ষেত তার কথা।

যেমন—ক. আশায় মরে চাষা

খ. যদি উয়ঁাল কচুর পাত,
পাতে রইল চাষার ভাত।

গ. ক্ষেত্রের দৌলতে চাষা নয়ত ফকির।

ঘ. আষাঢ় মাস, চাষার আশ।

এ পর্যন্ত গেল চাষার প্রসঙ্গ। এইবার প্রবাদে কৃষিকে কি ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রবাদে যে কৃষিকে অতিশয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটি প্রবাদে স্পষ্টতঃই স্বীকার করা হয়েছে—

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।

কৃষিজীবী যারা, তাদের প্রায় বারো মাস দুঃখ ভোগের কথা প্রবাদে উল্লিখিত হলেও, জীবিকা হিসাবে কৃষি যে অত্যন্ত লোভনীয় একাধিক প্রবাদেই সেকথা বলা হয়েছে। যেমন—

ক. ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।

খ. বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার অর্ধেক চাষ।

গ. ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা।

কৃষির জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হ'ল জল। তাই জলসেচের সুবন্দোবস্ত করে তারপর যদি কৃষির কাজে নামা যায়, তাহলে শ্রম সার্থক

হবার সমধিক সম্ভাবনা থাকে। প্রবাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়

সেচ দিয়ে করে চাষ, তার সব্জী বার মাস।

অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা, জমি কর্ষণ, উপযুক্ত সার দান, নিয়মিত তত্ত্বাবধান এসব করলেই যে ফসল উৎপন্ন হবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায়না। নানা নৈসর্গিক কারণ আছে, যা চাষার নিয়ন্ত্রণের অতীত। শেষ পর্যন্ত তাই কৃষির সাফল্য একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই থেকে যায়। আর তাইতো চাষাকে শেষ পর্যন্ত দৈব নির্ভর হতে দেখা যায় ফসল লাভের ব্যাপারে—

কি করবে ভাল গরু, কি করবে কারে।
দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে॥

চাষার জমিকে যদি সুরক্ষিত অবস্থায় না রাখা যায়, তাহলে ছাগল, গরুর মত প্রাণীরা প্রবেশ করে উৎপন্ন ফসলের অথবা সদ্য পোঁতা চারা গাছের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর সেই কারণেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া।

নতুবা অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, চাষ করবে যার মা—বাপ আছে।

এখানে 'মা' অর্থে গ্রামধোয়া জল আর 'বাপ' অর্থে পুকুর। অর্থাৎ সোজা কথায় জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে এমন জায়গাতেই চাষ করা বিধেয়।

তাই বলে আবার জলসেচের সুযোগ আছে বলে নদীর কূলে চাষ করা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। যেহেতু সেক্ষেত্রে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়—বন্যার ফলে যে কোন সময়ে শস্য হানির আশঙ্কা থাকে—

নদী কূলে চাষ, হয় ত ভাল,
নয়ত মন্দ, নয়ত সর্বনাশ।

এই একই বক্তব্যের প্রতিফলন অন্য প্রবাদেও লক্ষ্য করা যায়—

নদীর উপর চাষ, বালির ওপর বাস।

বসত ভূমির সংলগ্ন কৃষি ক্ষেত্রই হল সবদিক থেকে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। কারণ সেক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসল, দৃষ্টির মধ্যেই থেকে যায়। তাছাড়া বসতভূমির সংলগ্ন হলে কৃষিক্ষেত্রে যাতায়াতের সময় এবং পরিশ্রম দুইই বাঁচে। তাই বলা হয়েছে,

আনহি বসত, আনহি চাষ,
বলে ডাক তার বিনাশ।

চাষের জন্য জমিতে ভাল করে মই দেওয়া প্রয়োজন। কারণ মই দিলে জমির মাটি ঝুরো হয়ে যায় যা কৃষির ব্যাপারে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তাই একটি প্রবাদে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে,

ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে, ভোজন তুষ্ট দইয়ে।

গাছের অতিরিক্ত বাড় ভাল নয়, কারণ তার ফলে শস্যের পরিমাণ সীমিত হয়ে যায়। পরিবারে অবস্থানকারী বৃদ্ধ যেমন সংসারের কাজে তেমন লাগেন না, বরং সংসারের গলগ্রহ বলে বিবেচিত হন, তেমনি গাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ফসল লাভের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে দেয় বলে এই ধরণের গাছ চাষার কাছে গলগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। একটি প্রবাদে এই বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

ভুঁইয়ের বালাই হুড়ো গেরস্থের বালাই বুড়ো।

জমি মাত্রই যে কর্ষণযোগ্য হবে এমন কোন কথা নেই। তাই আগে থেকে জমির পরিচয় নিয়ে তবেই সেই জমিতে চাষ করতে হয়। নতুবা অনুর্বর জমি হলে শত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

জায়গা জেনে বসি জমি জেনে চষি।

প্রধান দুই জীবিকা হল বাণিজ্য এবং কৃষি। দুইয়ের মধ্যে বাণিজ্যে বিপদের সম্ভাবনা সমধিক। বিশেষত প্রাচীন কালে যখন সমুদ্র-বাণিজ্যের বিশেষ চল ছিল। সে তুলনায় কৃষি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবিকা। অন্ততঃ প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই এই জীবিকার ক্ষেত্রে। তাই একটি প্রবাদে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যে অন্যের সন্তানকে নিযুক্ত করার কিন্তু, চাষের ক্ষেত্রে নিজের সন্তানের উপর নির্ভর করতে হয়—

পরপোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ।

কৃষি বলতে জমিতে উৎপন্ন করা যায় এমন অসংখ্য ফসলকে বোঝালেও প্রবাদে কৃষি বলতে মূলতঃ ধানকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ আমাদের দেশের প্রধান কৃষি দ্রব্য হল ধান। তাই ধানের রোয়া, ফলন ইত্যাদি বিষয়েই সর্বাধিক প্রবাদ রচিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

ধানের আবাদে ধন।

অর্থাৎ ধান যদি ঠিকমত উৎপন্ন হয়, তাহলেই তার সুবাদে লাভ করা যায় আকাঙ্ক্ষিত ধন। এমনকি সোনা-রূপার তুলনায় ধানকেই অধিক মূল্য দেওয়া হয়েছে—

ধান ধন বড় ধন আর ধন গাই।
সোনা রূপা কিছু কিছু আর সব ছাই॥

তবে হ্যাঁ, ধানের চাষ করলেই যে বিত্তবান হওয়া যায় তা নয়, ঠিকমত তার ফলন হওয়া চাই বৈকি, নতুবা ধান চাষের ফলে পথের ভিখারী হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ধানের তুল্য ধন নেই যদি না পড়ে ভুসা।
ভায়ের তুল্য জন নেই যদি না করে হিংসা॥

ধানের মধ্যে আছে আবার নানা প্রকারভেদ। প্রবাদে যে বিশেষ ধরণের ধানটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হ'ল কটকী ধান—

শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কটকী, বউয়ের মধ্যে ছোটকী।

ধান কখন বুনতে হয় এবং কখনই বা তা রুইতে হয়, তার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আর এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে যে উপযুক্ত পুরস্কার লাভও ঘটে, তারও প্রলোভন দেওয়া হয়েছে—

বৈশাখী বোনা, আষাঢ়ী রোয়া,
জায়গা হয় না ধান থোয়া।

প্রথমে চাষ হয় আউসের, তারপর চাষ হয় আমনের। যখনকার যা, তখন সেটি করতে হয় বোঝাতে তাই বলা হয়েছে—

যখনকার যেমন, আউশ ফুরোলে আমন।

আউশ ধানের চাল কি রকম হয়, তার পরিচয়ও মেলে প্রবাদ থেকে—

আউশ ধানের চাল, আর ঠাকুরঝির গাল।

বর্ষাকাল উৎপন্ন আউশ ধানের চাল হয় মোটা হ্যাঁ, এই তথ্যটুকুও আমরা পাই প্রবাদ থেকেই—

ওদা ধানের চাল দড়, গোদা পায়ের লাথি বড়।

আউশ ধানের ফলন অত্যধিক হয় বৈশাখের প্রথম জলটি পেলে। তাই-ত বলা হয়েছে—

বৈশাখের প্রথম জলে, আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে।

সত্য কথা বলতে কি জল ছাড়া ধান চাষ কদাপি সম্ভব নয়। তাই বর্ষাতেই হয় ধান চাষ। বর্ষার জল যত পায়, ধান তত শীঘ্র বেড়ে ওঠে। কিসে কি বাড়ে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তাই বলা হ'ল—

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ি থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান॥

বর্ষাকালে যখন পুরোদমে চাষের কাজ শুরু হয়ে যায়, তখন নিজে না পারলে অপরকেও লাগাতে হয় চাষের কাজে। কারণ বর্ষা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাই বর্ষার নির্দিষ্ট সময়টুকুর সদ্ব্যবহার না করলে পরে পস্তাতে হয়—

আষাঢ়ে যে না খাটালে পর, মিছে তার ঘর দুয়ার।

ধান চাষের জন্যে বিশেষ জমির প্রয়োজন, যে কোন জমিতে যে কোন চাষ হয় না, বিশেষ করে ধান চাষ। তাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কৃষিতে সাফল্য লাভ করা খুবই দুরূহ—

জানেনা শোনে না বামন, চানার ক্ষেতে বুনে আমন।

ধান পাকার পর ধানের গুচ্ছ কেটে নেওয়া হয়, আর এই গুচ্ছ কাটার সঙ্গে সঙ্গেই ধান-জমি অন্য ফসল চাষের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়—

গোছ কাটলে জমি খালাস।

অমানুষিক পরিশ্রম করে যে ধান উৎপন্ন করা হয়, দুঃখের বিষয় তার প্রকৃত পরিমাণ কিন্তু হয় অন্যান্য আবর্জনার তুলনায় খুবই কম। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশই অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা অধিকার করে থাকে। প্রবাদে সে কথাও বলা হয়েছে—

ধান একগুণ, তুষ তিনগুণ।

আবার ধান যেটুকু পাওয়া যায় তার তুলনায় আসল প্রয়োজনীয় যে চাল, তা লাভ করা যায় যৎসামান্যই। কি রকম?

ধান একমন, চালকে তেরজন।

কোথায় কোথায় প্রভূত ধান উৎপন্ন হয়, তার কথাও আমরা জানতে পারি প্রবাদ থেকে। যেমন একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের উল্লেখ করা হয়েছে—

ধান আগুরি মুসলমান।
এই তিনে বর্ধমান।

শুধু বর্ধমান নয়, অন্যত্রও ধান ফলে, এবং তা বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই। এমনই একটি স্থান হল অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল—

ধান খুন খাল—তিন নিয়ে বরিশাল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষা যে চাষ করে তা নিজের জমিতে নয়, পরের জমিতে। আর তাই তাকে গুণগার নেহাৎ কম দিতে হয় না। পরিশ্রমের তুলনায় তার প্রাপ্য হয় যৎসামান্য। তাও ঠিকে জমিতে চাষ করার ফলে তাকে সর্বদা এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়। জমির মালিক যদি তাকে আর তাঁর জমিতে চাষ করার সুযোগ না দেন। এই অনিশ্চিত অবস্থাটি বোঝান হয়েছে একটি প্রবাদে এই বলে—

ঠিকের জমি, নিকের মাগ।

কৃষি ও কৃষক সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবাদ রচিত হলেও কৃষকের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী প্রবাদ কিন্তু তেমন রচিত হয় নি। মাত্র দু'টি একটি প্রবাদেই তার করুণ অভিজ্ঞতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যেমন একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কি করবে কার্ত্তিকের চাষে, ভাত পাইনা ভাদ্রমাসে।

একটি প্রবাদে এই সংসারে কারা বিশ্বাসী নয়, সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জমিদারকেও—

সাপ শালা জমিদার
তিন নয় আপনার।

বলাবাহুল্য প্রবাদটিতে জমিদারের অব্যবহিত পূর্বের পদটি জমিদারের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয় নি।

প্রবাদে চাষা সম্পর্কে যে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে, তেমনটি কিন্তু মহাজন, জমিদার, ভূস্বামী প্রভৃতির সম্পর্কে করা হয় নি। অথচ কৃষকের অত্যাচারিত এবং বঞ্চিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাচারী এবং বঞ্চনাকারী মহাজন-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ হওয়া ছিল স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম এইটুকুই প্রমাণ করে যে প্রবাদ রচয়িতাদের সহানুভূতি কাদের পক্ষে ছিল।

পরিশেষে বলতে হয়, বাংলা প্রবাদ অনেক ক্ষেত্রেই রূপকাশ্রয়ী, কখনও কখনও আবার প্রবাদে বক্রোক্তিও দেখা যায়। কিন্তু কৃষিকার্য বিষয়ক প্রবাদগুলির ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয় অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। বলাবাহুল্য ব্যবহারিক মূল্যের গুরুত্বের কারণেই এসব ক্ষেত্রে রূপক বা বক্রোক্তি অনুপস্থিত।

বাংলা প্রবাদে পৌরাণিক চরিত্র

ঐতিহাসিক এবং সামাজিক চরিত্র অবলম্বনে যেমন বিপুলসংখ্যক প্রবাদ রচিত হয়েছে, তেমনি পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনেও বাংলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাদ রচিত হতে দেখা গেছে। মূলতঃ রামায়ণ এবং মহাভারতের নানা চরিত্র এবং ঘটনাগুলিই এইসব প্রবাদ রচনায় উপলক্ষ্য স্বরূপ গৃহীত হলেও অন্যান্য পুরাণ সম্পর্কিত প্রবাদের সন্ধানও যে না পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়। তবে বাংলাদেশে রামায়ণ এবং মহাভারত যেমন জনপ্রিয়, অন্যান্য পুরাণ তেমন জনপ্রিয় নয়। তাই স্বভাবতঃই বাংলা প্রবাদে বর্ণিত পৌরাণিক ঘটনা এবং চরিত্রের অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত থেকে সংগৃহীত।



আমরা জানি প্রবাদ ব্যষ্টির সযত্ন প্রয়াস রচিত নয়, এগুলি সংহত সমাজের সৃষ্টি। আর এই সংহত সমাজের মানুষেরা মূলতঃ নিরক্ষর। তাই প্রশ্ন জাগে যে নিরক্ষর মানুষেরা রামায়ণ-মহাভারত কিংবা অন্যান্য পুরাণাদির সঙ্গে পরিচিত হল কিভাবে? কারণ পরিচিত না হলে পৌরাণিক চরিত্র কিংবা ঘটনা অবলম্বনে বিপুলসংখ্যক প্রবাদ রচিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

বাংলাদেশে প্রাচীনকালে লোকশিক্ষার উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিল কথকতা, পাচালী ও যাত্রা। এইসব মাধ্যম বাংলাদেশের মানুষকে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত করেছিল। আর সেই কারণে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সংহত সমাজের মানুষের পক্ষে বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা কিংবা চরিত্র অবলম্বনে প্রবাদ রচনা করা কঠিন হয় নি।

বিভিন্ন লৌকিক এবং পৌরাণিক দেব-দেবী নিয়ে যে অজস্র প্রবাদ রচিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন দেব-দেবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ পরিহাস করতে দেখা গেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রবাদে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে কখনই বিকৃত করা হয় নি। বড়জোর বাঙালী

সমাজের বৈশিষ্ট্য তথা মানসিকতা অনুযায়ী কাহিনী এবং চরিত্রগুলি সংকলিত ও পরিবেশিত হয়েছে।

আগেকার দিনে আমাদের সমাজজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে। বিশেষতঃ রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র বাঙ্গালী সমাজের কাছে ছিল অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র। রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনা তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা প্রবাদে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, পৌরাণিক চরিত্রগুলি রূপক নিরপেক্ষ চরিত্ররূপে প্রবাদে স্থান পায় নি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যা, পরিচিত চরিত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই পৌরাণিক চরিত্র কিংবা ঘটনার রূপকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

প্রথমেই আমরা রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রবাদ-গুলির পরিচয় গ্রহণ করতে পারি।

রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও পরিচিত হল রামচরিত্র। তারপর সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, রাবণ, শূর্পনখা ইত্যাদি চরিত্রগুলি এবং এই চরিত্রগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনা-রাজি। তাই রামচরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রবাদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা আদর্শ নরপতি, প্রজাপালক, বীর, যোদ্ধা, কর্তব্য-পরায়ণ ইত্যাদি সদ্‌গুণের আকররূপে জানি। কিন্তু সকলের থেকে বড় পরিচয় তিনি নারায়ণ। স্বয়ং ভগবানের অবতার। তাই একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

বল বল তিন বল।
ভোজনে অম্বল, শয়নে কম্বল, মরণে 'রাম বল'॥

অর্থাৎ মৃত্যুকালে রামচন্দ্রের নাম স্মরণ করে তাঁর করুণায় মুক্তিলাভ সম্ভব। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, রামায়ণের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল নামতত্ত্ব। দস্যু রত্নাকর 'রাম' নাম উচ্চারণ করেই ভাবরত্নাকর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। রাম নাম উচ্চারণেই পুণ্যার্জন সম্ভব, এতেই মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হয়—এই বিশ্বাসই প্রবাদটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

অথচ এই রামচন্দ্রকেই বনবাসে যেতে হয়েছিল পিতৃসত্য পালনের জন্য। অযোধ্যাপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে দশরথ তাঁকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধ সাধলেন দশরথের দ্বিতীয়া

স্ত্রী ভরত-জননী কৈকেয়ী। মন্থরার প্ররোচনায় এবং দশরথের পূর্ব প্রতিজ্ঞার সুযোগে তিনি দশরথের কাছে দুটি বর প্রার্থনা করেন। এক বরে ভরতের ঘটে যৌবরাজ্য লাভ এবং অপর বরে রামচন্দ্রের চোদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস নির্দিষ্ট হয়। একাধিক প্রবাদেই রামচন্দ্রের বনবাসের ঘটনাটি স্থান পেয়েছে—

কোথা রাম রাজা হবে, না, রাম বনে যাবে।

কিংবা,

কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস।

অন্য একটি প্রবাদেও এই করুণ ঘটনাটি প্রতিফলিত হয়েছে—

রাম যে গেছেন বনে, ওই কথাই ওঠে মনে।

কোন শুভ ঘটনার শেষ মুহূর্তে বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটলে সচরাচর উদ্ধৃত প্রবাদগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবন নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কার্যাবলীতে পূর্ণ। কিন্তু তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল লঙ্কাধিপতি দশাননকে হত্যা। সীতা উদ্ধারকল্পে রামচন্দ্র প্রবল পরাক্রমশালী রাবণকে হত্যা করেছিলেন। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।

একদা স্থাণুবৎ, নিশ্চল, মৃতপ্রায় অজগরের আহারের সংস্থানও করে দিয়েছিলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের সেই করুণা রসঘন রূপটির কথা স্মরণে রেখেই রচিত হয়েছে—

অজগরের দাতা রামচন্দ্র

রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের সহায়ক হয়েছিলেন সূর্যপুত্র, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব। সুগ্রীব ও বানরসেনার সহায়তায় রামচন্দ্র সেতু-বন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সুগ্রীব লঙ্কার যুদ্ধেও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কুম্ভ, বিরূপাক্ষ, সহোদরের মত ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সুগ্রীবের হাতেই নিহত হন। রামচন্দ্র নিজেও ছিলেন এক মস্ত বীর। তাই লঙ্কা-যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে আবার সুগ্রীবের সহায়তা যুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই রামচন্দ্রের শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই রচিত হয়েছে—

একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।

দুই প্রবল শক্তির সংযোগ ঘটলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

রাবণ-পুত্র মেঘনাদ অঙ্গদের কাছে পরাজিত হয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং

রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন। কিন্তু বিষ্ণুবাহন গরুড়ের সহায়তায় এঁরা সেই বন্ধন-দশা থেকে মুক্তিলাভ করেন। এরপর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতিরা যুদ্ধে নিহত হলে মেঘনাদ আবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অচৈতন্য করেন। কিন্তু হনুমান কর্তৃক আনীত ঔষধে এঁরা দুজনেই রক্ষা পান। এইভাবে ইন্দ্রজিতের একাধিকবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে—

মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী।

চোদ্দ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত হওয়ার পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁর সুশাসনে অযোধ্যার প্রজাবর্গ পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে রামচন্দ্র অদ্বিতীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। মর্ত্যলোকে তাঁর আদর্শ শাসন স্বর্গলোক রচনা করেছিল। আজও আদর্শ রাজত্ব বলতে আমরা রামরাজ্যকেই বুঝিয়ে থাকি। অযোধ্যা পরিচিত বিশেষভাবে রামচন্দ্রের রাজ্য বলে। তাই একটি প্রবাদে অযোধ্যার ভৌগোলিক অবস্থানকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে—

যাঁহা রাম তাঁহা অযোধ্যা।

অপর একটি প্রবাদে দুঃখ করে বলা হয়েছে—

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

অতীতের সহজ সরল এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রার অনুপস্থিতি বোঝাতেই বর্তমান প্রবাদটি লক্ষিত হয়।

রামচন্দ্রের পরই উল্লেখ করতে হয় সীতা চরিত্রের। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের সংহত সমাজে রামায়ণের প্রভাব এবং বাংলা প্রবাদে তার প্রতিফলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

'বাঙালী চরিত্রের বিশেষত্ব অনুযায়ী ইহাদের বিশেষ কোন কোন অংশে হয়ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রামায়ণের মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের সম্পর্ক কিংবা হনুমান এবং বানর সৈন্যদের আচরণ যতখানি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে সীতা চরিত্র ততখানি গুরুত্ব লাভ করে নাই।'

কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য বোধকরি একবারে মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের সমাজে আদর্শ নারী বলতে যাদের বোঝান হয় সীতা তাঁদেরই অন্যতমা। রামচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হলেই সীতার নাম স্বাভাবিকভাবেই এসে

পড়ে, যেমন এসে পড়ে নলের প্রসঙ্গে দময়ন্তীর নাম। নানা কারণেই সীতা আমাদের সমাজে বিশেষভাবে পরিচিতা। রামচন্দ্র নারায়ণের অবতার, সেই হিসেবে সীতা হলেন লক্ষ্মী। রামায়ণে বর্ণিত তাঁর সতী-সাধ্বী রূপ, পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে তাঁকে সহজেই অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। একদিকে সীতা রামচন্দ্র ছাড়া যেমন কিছু জানেন না, তেমনি রামচন্দ্রও সীতাহারা অবস্থায় মণিহারা ফণীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। একটি প্রবাদেও এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

সীতা হারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর।

সীতা স্বেচ্ছায় রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগামিনী হয়েছিলেন। ত্যাগ করেছিলেন রাজপ্রাসাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। তাঁরই কারণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর লঙ্কাযুদ্ধ। তবে সীতার জনপ্রিয়তার কারণ অন্যত্র বিদ্যমান। রামচন্দ্রগতপ্রাণা সীতা জীবনে সুখের মুখ দেখেনি। একের পর এক আঘাতে তাঁর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। যে সীতাকে রামচন্দ্র বহু কষ্টে রাবণের লঙ্কাপুরী থেকে উদ্ধার করলেন, তাঁরই চরিত্রে সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি সীতাকে যেখানে খুশী চলে যেতে বলেন। তখন অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সীতা লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বলেন এবং অগ্নিতে প্রবেশকালে বলেন যে, তিনি যদি যথার্থই সতী হন, তাহলে স্বয়ং অগ্নিই তাঁকে রক্ষা করবেন। বাস্তবিক, স্বয়ং অগ্নি তাঁকে ক্রোড়ে ধারণ করেন এবং তাঁকে গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে ভদ্র নামক জনৈক হাস্যকারের মাধ্যমে অবহিত হন যে, প্রজারা সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহপরায়ণ। এমতাবস্থায় প্রজাদের মনোরঞ্জনার্থে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সাহায্যে সীতাকে তমসার তীরবর্তী বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত করেন। সীতা তখন সন্তান সম্ভবা।

লব-কুশের মাধ্যমে রামচন্দ্র পুনরায় সীতার সন্ধান লাভ করেন এবং এই শর্তে সীতাকে গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, সীতা যদি নিষ্পাপ হন, তাহলে তিনি যেন বাল্মীকির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করেন এবং সকলের সমক্ষে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। রামচন্দ্রের শর্তানুযায়ী সীতা সর্বসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন যে, তিনি যদি যথার্থই সতী হন, রামচন্দ্রগতপ্রাণা হন, তাহলে যেন স্বয়ং পৃথিবী তাঁকে আশ্রয় দেন। সীতা সত্যসত্যই পাতালে প্রবেশ করেছিলেন, পৃথিবী তাঁকে আশ্রয় দান করেন। সীতার ট্রাজিক জীবনই বিশেষ-

ভাবে আমাদের দেশের সমাজকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। সীতা সম্পর্কিত প্রবাদ গুলিতেও সীতার দুঃখময় জীবনের কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে। একটি প্রবাদে ত স্পষ্টই বলা হয়েছে—

যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরলে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

সীতা নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও বারংবার তাঁকে যে নিষ্কলঙ্ক সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটি প্রবাদেও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা।

সীতাকে আমরা সাধারণভাবে মিথিলার রাজা জনকের কন্যারূপে জানি। কিন্তু আসলে জনকরাজ হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় এঁকে সীতার বা লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। সীতা জনকের মানস-কন্যা। তিনি কারো গর্ভজাত কন্যা নন। পূর্ব জন্মে ইনি ছিলেন মহর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী। রাবণ কর্তৃক হৃতধর্মা হবার আশঙ্কায় ইনি জলন্ত চিতায় প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন এবং সেই সময়ে বলে যান যে ত্রেতাযুগে তিনি কোন ধার্মিক ব্যক্তির অযোনি-সম্ভবা কন্যারূপে রাবণের বিনাশের জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন। অতএব সীতা আসলে অযোনিসম্ভবা। একটি প্রবাদে সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

জনম দুখিনী সীতা, নাই মাতা নাই পিতা।

সীতা সম্পর্কে যে প্রবাদটি বিশেষভাবে পরিচিত, যা নাকি কোন বিষয় আনুপূর্বিক পাঠ কিংবা শোনার পর মূল কিংবা সেই বিষয় সম্পর্কিত অতি সাধারণ একটা ধারণা গড়ে তুলতে অসমর্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তা হল—

সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্যা॥

অতএব প্রবাদের রাজ্যে যে সীতা অবহেলিত চরিত্র নয়, বরং রাম কিংবা রাবণের মতই গুরুত্বের অধিকারিণী, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

রাম এবং সীতার পর অনিবার্যভাবে যাঁর প্রসঙ্গ এসে পড়ে তিনি লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা পরিচিত প্রবাদটি হল—

লক্ষ্মণের ফল ধরা।

লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমন করেছিলেন। বনে থাকাকালীন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে প্রতিদিন ফল দিতেন ভক্ষণের জন্য। কিন্তু কোন দিনও খেতে বলেন নি তাঁকে, কেবল ফল দিয়ে ধরতে বলতেন। লক্ষ্মণও

তাই ঐসব ফল ভোজন না করে রেখে দিতেন। এইভাবে সুদীর্ঘ চৌদ্দবৎসরকাল তিনি উপবাসী ছিলেন। কোন বস্তুকে ব্যবহার না করে নিছক তা অধিকারে রাখলে তখন এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়। অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

লক্ষ্মণ ভোজন।

ঋষি বিশ্বামিত্রের বরে রামানুজ লক্ষ্মণ সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর ভোজন ও সেইসঙ্গে নিদ্রাও ত্যাগ করেছিলেন। সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁর উপবাস ভঙ্গ হয়।

লক্ষ্মণ ছিলেন অতিশয় ভ্রাতৃবৎসল, বিশেষত রামচন্দ্র গত প্রাণ। তাই লক্ষ্মণ সম্পর্কিত প্রবাদে তাঁর এই দিকটির পরিচয়ই বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছে—

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই রথে চড়ে স্বর্গে যাই।

লক্ষ্মণ সম্পর্কিত অপর একটি প্রবাদে রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মৃত্যুমুখে পতিত হবার বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হনুমান কর্তৃক আনীত বিষল্যকরণী, সাবন্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী নামক ওষধির ঘ্রাণে পুনর্জীবন লাভ করেন লক্ষ্মণ।

আজ মরে লক্ষ্মণ ওষুধ দেব কখন॥

রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। তাই সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রকে লঙ্কায় উপস্থিত হতে হয়েছিল। মাঝে ছিল দুস্তর সমুদ্র। সমুদ্রেরই পরামর্শে রামচন্দ্র নলের সাহায্যে সেতুবন্ধন করেন। নল ছিল বিশ্বকর্মার পুত্র। বিশ্বকর্মার কাছে লব্ধ বরের প্রভাবে নল শত যোজন দীর্ঘ এবং দশ যোজন বিস্তৃত সেতু সমুদ্রবক্ষে নির্মাণ করে, যার সাহায্যে কোটি বানর সেনা অনায়াসে সমুদ্র পার হতে সমর্থ হয়। অতএব সমুদ্র বন্ধনের মত অসম্ভব কাজও যে সম্ভবপর হয়েছিল মূলতঃ রাবণকৃত দোষের জন্য, একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন।

মারীচ ছিল লঙ্কাধিপতি দশাননের এক অনুচর। হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দের ঔরসে ও তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে তার জন্ম। সীতাহরণ কালে রাবণ মায়াবী মারীচের সাহায্য প্রার্থী হন। তিনি মারীচকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ

করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে বলেন। কিন্তু রামের বিক্রম অবগত হয়ে মারীচ রাবণের প্রস্তাব মত কার্য করতে অসম্মত হয়। রাবণ তখন মারীচকে অর্দ্ধ রাজ্যের লোভ দেখান। এবং সেইসঙ্গে জানিয়ে দেন যে রাবণের প্রস্তাবে অসম্মত হলে তিনি তাকে হত্যা করবেন। অবশেষে মারীচ নিরুপায় হয়ে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করে এবং পরিণামে রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়। বেচারী মারীচের এই শোচনীয় পরিণতির মূলেও 'যে রাবণ, একটি প্রবাদে সেকথা বলা হয়েছে—

রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।

মারীচের উভয় সঙ্কট নিয়ে একাধিক প্রবাদ রচিত হতে দেখা গেছে। উভয়-সঙ্কট এই কারণে যে রাবণের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ না করলে তাকে রাবণের হাতেই মৃত্যু বরণ করতে হত, আবার রামচন্দ্রের সঙ্গে ছলনা করতে গেলে তাঁর হাতেও তাঁর মৃত্যু অবধারিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মারীচ যখন দেখলে যে উভয় ক্ষেত্রের তার মৃত্যু অনিবার্য, তখন সে রাবণ অপেক্ষা রামচন্দ্রের হাতে মৃত্যু বরণকেই অধিকতর শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেছিল। যাই হোক মারীচের করুণ অবস্থা যে দুটি প্রবাদে রূপায়িত হয়েছে, সেই প্রবাদ দুটি হল

ক. রামে মরলেও মারবে, রাবণ মারলেও মরবে

খ. এগুলে রাম পেছুলে রাবণ।

শাঁখের করাত বা উভয় সঙ্কট অর্থেই উদ্ধৃত প্রবাদ দুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একটি ইডিয়মে 'রাবণের চিতা'র প্রসঙ্গ এসেছে। রাবণ বধের পর সদ্যোবিধবা মন্দোদরী শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে উপস্থিত হলে রাম তাকে চিরায়তির আশীর্বাদ করেন। পরে তিনি নিজে ভুল বুঝতে পেরে বর দেন যে রাবণের চিতা অনির্বাণ থাকবে। মন্দোরীকেও কখনও বৈধব্যের শিকার হতে হবে না। কারণ মৃত পতির চিতা নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত তার পত্নীকে এয়োতির চিহ্ন ত্যাগ করতে হয় না।

এইবার অন্য একটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল—

আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরামাঝে এখন জোড়া পারিস্ যদি দেখা॥

প্রবাদটি শূর্পণখার উক্তিরূপে প্রকাশিত। এখন প্রশ্ন হল এই শূর্পণখা কে? মুনি বিশ্রবার ঔরসে ও কৈকসীর গর্ভে এর জন্ম। রাবণ শূর্পণখার অগ্রজ। কালকেয় বংশীয় রাক্ষসরাজ বিদ্যুৎজিহ্বের সঙ্গে এর বিবাহ হয়। কিন্তু

দিগ্বিজয় কালে রাবণ ভ্রমবশতঃ কালকেয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বিদ্যুৎজিহ্বকে নিহত করেন। রাবণ স্বভাবতঃই এই ঘটনায় অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং বিধবা ভগিনীকে ইচ্ছামত দণ্ডকারণ্যে বিহারের অনুমতি দেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন, তখন রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে শূর্পণখা তাকে বিবাহ করতে চায়। রামচন্দ্র তাকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠান। কিন্তু লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে প্রত্যাখান করেন। ক্রুদ্ধা শূর্পণখা তখন সীতাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। অগত্যা লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে তার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করেন। অপমানিতা শূর্পণখা তখন রাবণের কাছে গিয়ে খুব করে উত্তেজিত করে তাকে দিয়ে সীতাকে অপহরণ করায় এবং পরিণামে রাবণ সবংশে নিহত হন।

তাই এহেন শূর্পণখা যখন গৌরব করে বলে যে, সে যেমন আদর্শ বোন, তেমনি রাবণ তার আদর্শ ভাই—জগতে এদের জোড়া মেলা ভার, তখন এটা যে নিতান্ত পরিহাসকল্পেই রচিত, তা আর বুঝতে বিলম্ব হয় না। অর্থাৎ কিনা শূর্পণখার মত বোন না হলে রাবণের সবংশে নিধন সম্ভবপর হত কি করে—এই ইঙ্গিতটুকুই এখানে দেওয়া হয়েছে।

কার্য সিদ্ধির পূর্বেই ফলাকাঙ্ক্ষা করা হলে বলা হয়—

কালনেমির লঙ্কাভাগ।

কালনেমি হলেন রাবণের মাতুল। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে অচৈতন্য হয়ে গেলে তাঁকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে ঔষধ সংগ্রহ করতে গেলে হনুমানকে হত্যার জন্য রাবণ কালনেমিকে প্রেরণ করেন। রাবণ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন কালনেমি সাফল্যমণ্ডিত হলে পুরস্কার স্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্বের অধিকারী করবেন। সঙ্গে সঙ্গেই কালনেমি পরিকল্পনা রচনা করেন রাজ্যের কোন অংশটি গ্রহণ করবেন।

কালনেমি পূর্বেই গন্ধমাদনে এসে উপস্থিত হন এবং হনুমানকে নিজের আশ্রমে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু হনুমান কালনেমির আহ্বানে সাড়া না দিয়ে জলাশয়ে স্নান করতে যান। এখানে একটি কুমীরের মুখে পড়েন। আসলে কুমীরটি ছিল শাপভ্রষ্ট এক অপ্সরা। হনুমান কুমীরকে হত্যা করলে অপ্সরা মুক্তি লাভ করেন, আর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কালনেমির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দেন। এরপর হনুমান কালনেমিকে এমন আকাশে ছুঁড়ে দেন

যে কালনেমি সোজা রাবণের সিংহাসনের ওপর এসে পড়েন এবং মৃত্যু বরণ করেন।

রামচন্দ্র-তনয় লব-কুশ অবলম্বনে রচিত একটি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়—

লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জ্বলে মরি।

রামচন্দ্র যখন লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসিত করেন, তখন সীতা সন্তান সম্ভবা। পরে বাল্মীকির তপোবনে সীতা দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেন। শিশুঘাতক পূতনাদির হাত থেকে সদ্যোজাত শিশুদ্বয়কে রক্ষার জন্য মহর্ষি বাল্মীকি কুশের অগ্রভাগ এবং অধোভাগ দিয়ে এদের রক্ষা-বন্ধন করেছিলেন। তাই জ্যেষ্ঠ সন্তানটির নাম হয় কুশ এবং কনিষ্ঠটির নাম হয় লব। দুজনেই বিরাট বীর। বাল্মীকি দুজনকেই নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেছিলেন।

পক্ষিরাজ জটায়ুকে নিয়েও একটি প্রবাদ রচিত হয়েছে—

জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা।

প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যে, সীতাহরণকারী রাবণের রথ গলাধঃকরণ করতে গিয়েই জটায়ু রাবণ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। জটায়ু ছিলেন দশরথের বন্ধু। সীতাহরণকালে সীতার কান্নায় ব্যথিত জটায়ু রাবণের গতিরোধ করে তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায় হয়ে ভূপতিত হন। রাবণ এই সুযোগে সীতাকে নিয়ে পলায়ন করেন। বাক্যাংশটিতে যদিও জটায়ুর রাবণের রথ গলাধঃকরণের কথা বলা হয়েছে, বাল্মীকি-রামায়ণ অথবা কৃত্তিবাসী-রামায়ণে কিন্তু জটায়ু কর্তৃক রাবণের রথ চূর্ণ করার কথাই উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। গলাধঃকরণের বিষয়টি দু'ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। রাবণ-অনুজ কুম্ভকর্ণও প্রবাদে উল্লিখিত হয়েছে—

ক. এক গাঁজার তিন ধর্ম, তোতা পেঁচা কুম্ভকর্ণ।

খ. গুণের কথা বলব কত কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।

কুম্ভকর্ণ যে একটানা ছয়মাসকাল নিদ্রিত থাকত, প্রবাদ দু'টিতে তার সেই বৈশিষ্ট্যটিকেই আলোকপাত করা হয়েছে।

বিভীষণকে নিয়েও একাধিক প্রবাদ তৈরী হয়েছে—

ক. ঘর শত্রু বিভীষণ।

খ. ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।

রাবণ ভ্রাতা বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যোগাযোগ হওয়ায় বিভীষণ গৃহের

সমস্ত গোপন তথ্যাদি তাঁর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যার পরিণামে রাবণের মৃত্যু ঘটে।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ।

মহীরাবণ ছিলেন মাল্যবানের বোনের ছেলে। বিষ্ণুর ভয়ে ভীত একদল অসুর পাতালে গিয়ে বসবাস করতে থাকলে এই মহীরাবণ এদের রাজা হন। মহীরাবণের অপর নাম রাবণ। ব্রহ্মার তপস্যা করে ইনি বরপ্রাপ্ত হন যে বিনা বাহনে যে কোনও স্থানে ইচ্ছামত যেতে পারবেন এবং সমস্ত মায়া-বিদ্যার অধিকারী হবেন। তাছাড়া তাঁর অধিগত নীল বর্ণের হীরক খণ্ডটি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ইনি জীবিত থাকবেন।

মহীরাবণের সঙ্গে রাবণের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। লঙ্কার যুদ্ধে ইনি রাবণকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। পাতাল থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ইনি সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে যান, উদ্দেশ্য ছিল মহকালী মন্দিরে দু'ভাইকে বলিদান। এর পর বিভীষণ হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে পাতালে গিয়ে উপস্থিত হন। হনুমান মহীরাবণের নীল হীরকটি সংগ্রহ করে নেন প্রথমে। মহীরাবণের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অতঃপর হনুমান নীল হীরকটি কাপড় দিয়ে ভাঙ্গার ফলে মহীরাবণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এ পর্যন্ত গেল রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনারাজি অবলম্বনে রচিত প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশের আলোচনা।

এইবার মহাভারত থেকে গৃহীত চরিত্র ও ঘটনারাজি অবলম্বনে রচিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন মহাভারতের একটি স্মরণীয় চরিত্র। পাণ্ডবদের অজ্ঞাত-বাসকালে অর্জুন 'বৃহন্নলা' এই ছদ্মনামে মৎস্যরাজ ভবনে নপুংসক বেশে বিরাট-রাজ্যের কন্যা উত্তরার নৃত্য-গীত শিক্ষকরূপে অবস্থান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অজ্ঞাতবাসের শেষের দিকে দুর্যোধন যখন বিরাট রাজের গোধন হরণ করে, তখন বৃহন্নলারূপী অর্জুন কৌরব সৈন্যদের পরাজিত করে গোধন উদ্ধার করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে—

বৃহন্নলা রথী যার, পরাজয় কোথা তার।

অর্জুনকে নিয়ে রচিত আর একটি প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপদেষ্টা ও সারথিরূপে লাভ করেন।

তার ওপর অর্জুন নিজেও অদ্বিতীয় বীর ছিলেনই। তাই শ্রীকৃষ্ণকে উপদেষ্টা সারথিরূপে লাভ করায় অর্জুনের পক্ষে তা সোনায় সোহাগা হয়ে দাঁড়ায়। এই উপলক্ষে রচিত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ ?

শল্য মহাভারতের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে একটি চরিত্র। ইতি ছিলেন মদ্র প্রদেশের রাজা। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রীর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন শল্য। অর্থাৎ নকুল ও সহদেবের ইনি ছিলেন মাতুল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি কৌরবদের পক্ষে যোগদান করেছিলেন এবং কর্ণের সারথি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্ণের সঙ্গে কলহ করে তিনি তার মনোবল নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। অষ্টাদশ দিবসে ইনি কৌরবদের সেনাপতি পদেও বৃত হয়েছিলেন। উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারী যারা, তারা যখন কোন কার্যে ব্যর্থ হন, তখন তাদের স্থানে তুলনায় নিতান্ত সাধারণ শক্তির অধিকারী যারা তারা যখন সেই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হন, তখনই প্রযুক্ত হয় নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি—

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী ॥

অর্থাৎ কিনা যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ কিংবা কর্ণের মত বীরেরা ব্যর্থ, সেখানে শল্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ নিতান্ত হাস্যকর প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

কর্ণ মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কর্ণ শুধু অসাধারণ বীর ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন মহান দাতা। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঘরেতে নাহি অন্ন, তার নাম দাতা কর্ণ।

এখানে যার গৃহে অন্ন বাড়ন্ত, তাকে দাতা কর্ণরূপে অভিহিত করে পরিহাস করা হলেও, কর্ণের দানশীলতা—এই মহৎ গুণটিকে কিন্তু ব্যক্ত করা হয়েছে। অপর একটি প্রবাদে কর্ণের শৌর্য-বীর্যকেও রূপায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

বুদ্ধিতে সেরা বৃহস্পতি, যুদ্ধে সেরা কর্ণ।
জাতির সেরা ব্রাহ্মণ, ধাতুর সেরা স্বর্ণ ॥

বাস্তবিক, কর্ণ একমাত্র অর্জুনের সঙ্গেই তুলনীয়।

দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকে নিয়েও রচিত হয়েছে প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। ভীমের অপর নাম বৃকোদর, কারণ ভীম ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত

ভোজন পটু। স্বভাবতঃই ভীমের পক্ষে উপবাস করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এ হেন ভীমও নাকি মাঘী শুক্লা একাদশী পালন করেছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে রচিত হয়েছে—

ভীমের আ গার একাদশী।

অন্য একটি প্রবাদেও এই একই বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে—

সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী।

দুর্যোধনকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি প্রবাদ রচিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তাকে প্রবাদ মূলক বাক্যাংশ থেকে যে বাদ দেওয়া হয়নি তারই প্রমাণ—

'দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ করে থাকা' বাক্যাংশটি।

কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে সমস্ত কৌরবসেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন দুর্যোধন প্রাণ রক্ষার্থে কুরুক্ষেত্রের বাইরে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মায়া দ্বারা হ্রদের জল স্তম্ভিত করে সেই জলে প্রবেশ করে। উদ্ধৃত বাক্যাংশ-টিতে এই ঘটনাটিকেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

মহাভারতোক্ত বৃষ্ণিবংশীয় চেদি দেশের রাজা ছিলেন শিশুপাল। ইনি ছিলেন চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র। শিশুপালের মাতা ছিলেন বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবা। শিশুপাল ছিলেন ঘোরতর কৃষ্ণ বিদ্বেষী। শ্রীকৃষ্ণের হাতেই শিশুপালের মৃত্যু হয়। একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশে এ হেন দমঘোষ এবং শিশুপালকে ব্যঙ্গে প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে—

দম ঘোষের বেটা শিশুপাল।

মহাভারতের চরিত্র এবং ঘটনা অবলম্বনে প্রবাদ অপেক্ষা প্রবাদমূলক বাক্যাংশই রচিত হয়েছে অনেক বেশি। আর এইসব বাক্যাংশে স্থান পেয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী আছেন, তেমনি আছেন পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, মাতুল শকুনি, জরাসন্ধ ও পরশুরাম প্রমুখেরা। এইসব বাক্যাংশে বিশেষভাবে এইসব চরিত্রগুলির স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য বা পরিণাম অভিব্যক্ত হয়েছে। দ্রৌপদী রন্ধন বিদ্যায় ছিলেন পারদর্শিনী, তাই বলা হয়েছে, 'দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী'। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি চিরকুমার থাকবেন। তাঁর এবংবিধ প্রতিজ্ঞার কারণ ছিলেন তাঁর পিতৃদেব। ভীষ্মের পিতা শান্তনু যমুনা তীরে বেড়াতে গিয়ে কস্তুরী গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গিয়ে দাসরাজকন্যা সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। সত্যবতীর পিতা দাসরাজ দাবী করেন যে সত্যবতীর সন্তানকে রাজ্য দিলে তবেই তিনি তাদের বিবাহে

সম্মতি দেবেন। শান্তনু এ দাবীতে স্বীকৃত হন না। ভীষ্ম পিতার ইচ্ছা অবগত হয়ে স্বয়ং দাসরাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জানান যে তিনি রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করেছেন, শুধু তাই নয়, আজীবন কৌমার্য রক্ষা করবেন বলে শপথ করেন। এরপর তিনি সত্যবতীকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং পিতাকে সবকিছু জানান। কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে শান্তনু ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যুর বরদান করেন এবং তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য নাম দেন ভীষ্ম। তাই কোন ব্যক্তি যদি খুব কঠিন কোন প্রতিজ্ঞা করে বসে, তখন সেই প্রতিজ্ঞাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা'।

পিত্রাদেশে পরশুরাম কুঠারাঘাতে তাঁর মাতার শিরশ্ছেদ করেছিলেন। আর সেইজন্যই রচিত হয়েছে 'পরশুরামের কুঠারে'র ন্যায় বাক্যাংশ। পঞ্চপাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার দুষ্কর্মে মদত দিয়েছিলেন কৌরবদের মাতুল শকুনি, আর পরিণামে কৌরব পক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়। 'দুর্যোধনের শকুনিমামা'—বাক্যাংশটি এই পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। আবার জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের শত শৃঙ্গ পর্বতে ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম হয়। তাই যুধিষ্ঠির পরিচিত ধর্ম, ধর্মরাজ এবং ধর্মপুত্র নামে। যুধিষ্ঠির অবলম্বনে রচিত ইডিয়মেও তাঁর এই পরিচয়টিই বিধৃত হয়েছে—'ধর্মপুত্র-যুধিষ্ঠির'। কোন ব্যক্তি নিজের বক্তব্যকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলেও যদি তার বক্তব্য অসত্য বলে শ্রোতার মনে হয়, তখন সত্য প্রতিপন্নকারীর ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যুধিষ্ঠিরাদির পিতৃব্য বিদুরকে নিয়েও একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা প্রবাদ রচিত হয়েছে দেখা যায়—'বিদুরের ক্ষুদ'। শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের এক দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে বিদুরের জন্ম। রাজ পরিবার ভুক্ত হয়েও ইনি দীন ভাবে জীবন যাপন করতেন। বিদুর ছিলেন ন্যায় পরায়ণ এবং ধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের তরফে হস্তিনাপুরে সন্ধির প্রস্তাব সহ উপস্থিত হলে অহঙ্কারী দুর্যোধন কৃষ্ণকে আহার্য গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু দুর্যোধনের অশ্রদ্ধাযুক্ত রাজভোগ পরিহার করে তিনি বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিদুর যৎসামান্য অথচ শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত আহার্যে কৃষ্ণের সেবা করেন। এইজন্যেই রচিত হয়েছে 'বিদুরের ক্ষুদ' বাক্যাংশটি। শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা পূর্ণ যে ভোগ্য-সামগ্রী, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই সামান্য হোক, সেরূপ ক্ষেত্রেই এই প্রবাদে ব্যবহার হয়ে থাকে। কৌরবাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী অসময়ে একটি কুষ্মাণ্ডকৃতি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন আর এই মাংসপিণ্ড থেকেই শত পুত্রের জন্ম

হয়। এই শত পুত্রের কারণেই কুরু বংশ ধ্বংস হয়। এই কারণেই উদ্ভূত হয়েছে যে প্রবাদ মূলক বাক্যাংশটি, সেটি হল—

অকাল কুষ্মাণ্ড।

কীচক কেকয় রাজার ছেলে। ইনি ছিলেন মৎসরাজ বিরাটের শ্যালক আবার সেনাপতি। কীচক এবং তাঁর ১০৫ ভাই (উপকীচক) বিরাট রাজার সঙ্গেই থাকতেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী কীচকের বোন সুদেষ্ণার পরিচারিকার বেশে থাকতেন, তখন তাঁর নাম হয় সৈরিন্ধ্রী বা মালিনী। কীচক সৈরিন্ধ্রীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। এরপর সুদেষ্ণা ছলনা করে এক পূর্ণিমার রাত্রে দ্রৌপদীকে কীচকের কক্ষে প্রেরণ করেন। কীচক দ্রৌপদীকে ধরতে গেলে দ্রৌপদী তাকে ফেলে দিয়ে রাজসভায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কীচকও সেখানে এসে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে অপমান করেন। আত্মপ্রকাশের ভয়ে পঞ্চপাণ্ডব নীরব থাকেন। এরপর ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে নৃত্যশালায় গোপনে দেখা করতে বলেন। সেইমত কীচক এলে ভীমের হাতে নিহত হন। তাকে একটি মাংস পিণ্ডে পরিণত করেন। এই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে—

কীচক বধ করা।

রামায়ণ এবং মহাভারত ব্যতিরেকে অন্যান্য পুরাণের যেসব চরিত্র বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছেন, তার অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত চরিত্র। দেবকী একাধিক প্রবাদেই স্থান পেয়েছেন। বিদর্ভরাজ আহুকের পুত্র দেবকের অন্যতমা কন্যা দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। দেবকী-স্বামী বসুদেব কংসকে প্রতারিত করার জন্যে এবং কৃষ্ণকে রক্ষাকল্পে সদ্যোজাত কৃষ্ণকে যমুনাপারস্থিত ব্রজধামে নন্দের গৃহে রেখে আসেন এবং নন্দের স্ত্রী সদ্যোজাত কন্যাকে দেবকীর কাছে রেখে দেন। এই সূত্রেই রচিত হয়েছে—

আপন ধন পরকে দিয়ে
দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

এই একই বিষয়কে ঈষৎ পরিবর্তিত করে অন্যত্র বলা হয়েছে—

কুঁতিয়ে মল দৈবকী, নাম পাড়াল যশোদারাণী।

কৃষ্ণের জন্মদাত্রী না হয়েও যশোদা যে ঘটনাচক্রে কৃষ্ণের জননীরূপে পরিচিত হবার সৌভাগ্য সুখ লাভ করেন, অন্যত্রও সে বিষয়ে বলা হয়েছে—

যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী।

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রূর বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এইভাবে কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসীদের প্রতি ক্রূরতার পরিচয় দিয়েছিলেন; একটি বাক্যাংশে এই বিষয়কে ব্যক্ত করে বলা হয়েছে—

ওরে আমার অক্রূর খুড়ো।

রোহিণী কৃষ্ণের বিমাতা, বলরামের মাতা এবং বসুদেবের স্ত্রী। একটি প্রবাদে রোহিণী উল্লিখিত হয়েছেন এইভাবে—

কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।

বসুদেব কংস ভয়ে রোহিণীকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন। আবার কৃষ্ণও লালিত হয়েছেন নন্দালয়ে। এই কারণেই নীলমণি বা কৃষ্ণের কারণে দেবকীকে যে কি নিদারুণ দুঃখভোগ করতে হয়েছিল, তার সাক্ষ্য হিসেবে রোহিণীর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

রাধিকা ছিলেন কৃষ্ণগতপ্রাণা। কৃষ্ণের সজ্জার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর মাথার চূড়া। হাতে তাঁর মোহন বাঁশী। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, মিলবে রাধা হেন দাসী।

রাধা ছিলেন আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণ-প্রেমিকা হওয়ায় সেই সুবাদে বলা হয়ে থাকে—

সবাই সতী কবলায় ধরা পড়েছে রাধা।

অর্থাৎ রাধার মত অনেকেই বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতাজনিত অপরাধে অপরাধী করা হয়ে থাকে শ্রীরাধাকেই। বিপরীতক্রমে কৃষ্ণও রাধিকার প্রতি ছিলেন আসক্ত। তাই কৃষ্ণের প্রতিও কটাক্ষ করে বলা হয়েছে—

গুণের আর সীমা নাই, ওরে মোর ভাগনে কানাই।

কিন্তু এ হেন কৃষ্ণও রাধিকাকে ত্যাগ করে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই সূত্রেই একটি প্রবাদে রাধিকাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—

বেশভূষা কেন করিস রাই, আসবে না আর তোর কানাই।

রৈবত- কন্যা রেবতী বলরামের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। একটি প্রবাদে রেবতী এবং বলরামের সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে—

যেমন কন্যা রেবতী; তেমনি পাত্র গদাহাতী।

এক্ষেত্রে 'গদাহাতী' বলতে—বলরামকেই বোঝান হয়েছে। আসলে যেক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য থাকে, যেখানে রাজযোটক মিল হয়, সেক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি।

গণেশের হস্তীমুণ্ড ধারণের প্রসঙ্গটিও একটি প্রবাদের বিষয় হয়েছে—

শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে।

বিষ্ণুর বরে পার্বতীর গর্ভে গণেশের জন্ম হলে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল থেকে দেবতারা নবজাতককে দেখতে আসেন। শনিও আসেন। শনির স্ত্রী শনিকে অভি-সম্পাৎ দিয়েছিলেন যে, তিনি যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তারই মৃত্যু হবে। তাই শনি নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু পার্বতীর পীড়াপীড়িতে তিনি যেইমাত্র গণেশের মুখের দিকে তাকিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ শিশুর মুণ্ডটি দেহ থেকে খসে পড়ে। শেষে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের সাহায্যে একটি হস্তীর মুণ্ড ছেদন করে গণেশের গলায় লাগিয়ে দেন। উদ্ধৃত প্রবাদটিতে এই পৌরাণিক ঘটনাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

কোন কিছুরই যে অতিরিক্ত ভাল নয়, সেই প্রসঙ্গে কথিত হয়—

অতিদানে বলির পাতালে হল ঠাঁই।

দৈত্যরাজ বিরোচনের ছেলে বলি ছিলেন প্রহ্লাদের নাতি। ভৃগুর উপদেশে বলি নর্মদাতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে যা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, তা তিনি পূরণ করবেন।

মুনি-বালকের ছদ্মবেশে স্বয়ং বিষ্ণু বামনরূপে বলির কাছে উপস্থিত হন এবং ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি ভিক্ষা চান। বলি বামনকে তার প্রার্থিত ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দানে স্বীকৃত হন। এরপর বামন বৃদ্ধি পেতে থাকেন। বামনের দেহে বলি বিশ্বরূপ দেখতে থাকেন। তিন পাদ ভূমির মধ্যে বামন এক পায়ে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে নেন, দ্বিতীয় পা স্থাপন করেন মহঃ জনঃ ও তপঃ লোকে। বামনের নাভি থেকে নির্গত তৃতীয় পাটি কোথায় রাখবেন বামন তা জানতে চান। বলি তখন নিরুপায় হয়ে নিজের মাথা পেতে দেন। বামন তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলের খোঁচায় ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে ফেলেন, গঙ্গার জন্ম হয়। তখন বামন বলির মাথায় পা দিয়ে তাকে পাতালে প্রেরণ করেন।

সর্বম অত্যন্তম গর্হিতম, দান ভাল কিন্তু অতিরিক্ত দান যে ভাল নয়, বলির পরিণতির কথা বলে তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রবাদটিতে।

একটি প্রবাদে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে—

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এলেন যেন কৃষ্ণের দূত।

এই ঋষ্যশৃঙ্গ হলেন বিভাণ্ডক মুনির সন্তান। দশরথের তিনি আবার জামাই। ভগ নামে আদিত্যের শাপ ভ্রষ্টা কন্যা স্বর্ণমুখী নামে হরিণীর গর্ভে এঁর জন্ম, তাই এঁর শিঙ ছিল। এই কারণে বিভাণ্ডক এঁর নাম রেখেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। অঙ্গ দেশের রাজা লোমপাদ নিজ রাজ্যে বৃষ্টির জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছিলেন আর পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে মুনির বিবাহ দেন। শান্তা দশরথের কন্যা। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গ দেশেই বাস করতেন। অন্য এক মতে বলা হয় যে পিতা বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শান্তার ছেলে হলে তিনি যেন আশ্রমে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী সুমন্ত্রের পরামর্শে পুত্রেষ্টি / অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রধান পুরোহিত করে পূর্ণ মনোরথ হয়েছিলেন।

অতিথি সৎকারের উপযুক্ত আয়োজন না করে বহু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান প্রসঙ্গে বলা হয়—

নারদের নেমন্তন্ন।

দেবর্ষি নারদ ত্রিভুবন ভ্রমণকালে যাকেই পেতেন, তাকেই নিমন্ত্রণ করতেন, কিন্তু অতিথি সৎকারের কোনপ্রকার আয়োজন করতেন না।

একান্ত আপন জনের মধ্যেকার বিরোধকে বলা হয়—

গজ কচ্ছপের যুদ্ধ।

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, বিভাবসু নামে এক মুনি ছিলেন, ইনি ছিলেন অত্যন্ত রাগী। এঁর ছোট ভাইয়ের নাম সুপ্রতীক। পিতৃ সম্পত্তি বণ্টনের জন্য সুপ্রতীক বিভাবসুকে অনুরোধ করলে বিভাবসু তাকে পৃথক হবার কুফল সম্পর্কে বোঝাতে সচেষ্ট হন। শুধু তাই নয়, বিভাবসু বিরক্ত হয়ে সুপ্রতীককে হাতী হবার অভিশাপ দেন, সুপ্রতীকও কচ্ছপ হবার অভিশাপ দেন বিভাবসুকে। অতঃপর গজ ও কচ্ছপ রূপে দুজনে বহুকাল পর্যন্ত সরোবরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অতিবাহিত করেন। শেষে এদের দুজনকে ভক্ষণ করে ফেললে দুজনের দীর্ঘদিনের কলহের অবসান ঘটে।

সুবৃহৎ হিসাব সম্বলিত খাতাকে বলা হয়—

চিত্রগুপ্তের খাতা বা খতিয়ান।

চিত্রগুপ্ত হলেন যমের মন্ত্রী, ইনি মানুষের পাপ-পুণ্য এবং জীবন-মরণের হিসাব

রাখেন, যে খাতায় এইসব হিসাব রাখেন তাকেই বলা হয় চিত্রগুপ্তের খাতা। এইবার একটি প্রবাদে উল্লেখ করা গেল যেটিতে ত্রিশঙ্কুর উল্লেখ রয়েছে।

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের যোগবলে স্বর্গে উঠেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁর গতিরোধ করে তাঁকে নীচে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাঁর নিম্নগতি রোধ করলে তিনি মাঝামাঝি ঝুলে থাকেন। অনিশ্চিত অবস্থায় থাকলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

খুব প্রাচীনকালের বা অতীতের ঘটনা বোঝাতে বলা হয়—

মান্ধাতার আমল।

এই মান্ধাতা ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভূত। রাজা যুবনাশ্বের পুত্র ইনি। ইন্দ্রের অমৃতক্ষরা আঙ্গুল চুষে শিশু মান্ধাতা এক দিনেই বড় হন। রাজা হয়ে তিনি সপ্তদ্বীপ পৃথিবী জয় করেছিলেন। ইনি এক দিনে পৃথিবী জয় করেছিলেন। বিষ্ণু একবার ইন্দ্রের বেশ ধারণ করে এসে এঁর সঙ্গে রাজধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বৃহস্পতি মান্ধাতার সঙ্গে গোদান সম্পর্কিত এক আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। সুমেরু পর্বতে রাবণের সঙ্গে এঁর যুদ্ধ হয় এবং দুজনেই সমান বলশালী বলে প্রতিপন্ন হয়।

একটি প্রবাদে ব্রহ্মাও উল্লিখিত হয়েছেন—

ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডালে শাপে
খণ্ডাইতে না পারে ব্রহ্মার বাপে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ঋকবেদে ব্রাহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা অনুপস্থিত, সেখানে আছেন হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। পুরাণে ব্রহ্মার চার হাত পঞ্চমুখ এবং অন্তরীক্ষের দেবতা তিনি। সচরাচর চতুর্মুখ হংসবাহন, হাতে মালা, অক্ষমালা, পুস্তক ও কমণ্ডলু।

প্রলয়ের পর নারায়ণ যখন অনন্ত শয্যায় যোগ নিদ্রায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর নাভি থেকে শত যোজন বিস্তৃত একটি পদ্ম ফুটে ওঠে এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা।

দক্ষ বৃহস্পতি নামে একবার এক যজ্ঞের আয়োজন করেন, কিন্তু সেই যজ্ঞে শিবকে এবং পার্বতীকে আমন্ত্রণ জানান নি। সতী যজ্ঞের সংবাদ পেয়েই জোর করে শিবের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে দক্ষ শিবনিন্দা শুরু করে দেন, তাতে সতী অপমানিতা বোধ করেন। অভিশাপ দেন দক্ষ ছাগ

মুণ্ডের অধিকারী হবেন, সতী যোগবলে যজ্ঞস্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। শিব সতীর দেহত্যাগের সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে সদলবলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করে দেন। এই কারণেই শিবকে বাদ দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবাদের ভাষায় তাই বলা হয়—

শিবহীন যজ্ঞ।

হিরণ্যকশিপুর সন্তান প্রহ্লাদকে নিয়ে রচিত প্রবাদটি হল—

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

বংশের ধারার বিপরীত আচরণ বা চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির উদ্দেশে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

প্রহ্লাদ রানী কয়াধুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণুর হাতে ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ নিহত হবার পর থেকেই হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে পড়েন এবং পৃথিবী থেকে নারায়ণের নাম চিরতরে মুছে দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। অপর-পক্ষে হিরণ্যকশিপুরই সন্তান হয়ে প্রহ্লাদ হয়ে ওঠেন অতি মাত্রায় বিষ্ণুভক্ত। হিরণ্যকশিপুর হাতে এজন্য প্রহ্লাদকে নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এমনকি মত্ত হস্তী, সাপ, আগুন ইত্যাদির সাহায্যে তাকে হত্যা করারও চেষ্টা করেন। পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করা হয়, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন তিনি, এসব সত্ত্বেও প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি যায় না। শেষে হিরণ্য-কশিপু বিষ্ণুর অবস্থান সর্বত্র শুনে সভাগৃহের সম্মুখস্থিত স্ফটিক স্তম্ভে পদাঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহ মূর্তি বিষ্ণু বের হয়ে হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করেন এবং নখে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। এরপর নৃসিংহ মূর্তি প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করেন এবং অন্তর্হিত হয়ে যান। প্রহ্লাদ পাতালে গিয়ে দৈত্যদের রাজা হন।

জড়বৎ অবস্থানকারীকে বলা হয়ে থাকে—

জড় ভরত।

এই প্রবাদটির সঙ্গে যুক্ত নামটিও পৌরাণিক চরিত্রের। ঋষভ দেবের একশত সন্তানের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। ঋষভের মৃত্যুর পর উনি রাজা হন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন এই ভরত থেকেই 'ভারতবর্ষে'র নাম-করণ হয়।

ধার্মিক এবং প্রজাবৎসল ভরত আপন ছেলেদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করে দিয়ে নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে পুলহ আশ্রমে অবস্থান করতে থাকেন।

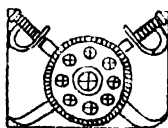
এখানে অবস্থান কালে একদিন একটি পূর্ণগর্ভা হরিণীকে দেখলেন জলাশয়ে জল পান করতে এসে হঠাৎ সিংহের গর্জন শুনে দ্রুত পালাতে গিয়ে প্রসব করে ফেলেছে। শাবকটি জলে পড়ে গেছিল। ভরত এই শাবকটি পালন করেন এবং এর মায়ার বন্ধনে পড়েন। মৃত্যুকালে তিনি এই হরিণের কথাই চিন্তা করেছিলেন। পর জন্মে তিনি কালঞ্জর পাহাড়ে জাতিস্মর হরিণ হয়ে জন্মান। হরিণ তারপর মারা গিয়ে পরজন্মে অগ্নিবেশ বংশে এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মান।

রাজর্ষি ভরত জাতিস্মর হয়ে পূর্বজন্মের মৃগরূপ স্মরণ করে সর্বদা জড়বৎ অবস্থান করতেন। তিনি জড়িত স্বরে কথা বলতেন, শুধু তাই নয়, কাজে-কর্মেও ছিলেন বিমুখ। এই কারণে তিনি 'জড়ভরত' নামে পরিচিতি অর্জন করেন।

বাস্তবিক, আমাদের সংহত সমাজে রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণাদির প্রভাব যে কতখানি গভীর তা প্রবাদগুলি থেকে জানা যায়। নিরক্ষর মানুষও যে দেশীয় সংস্কৃতির কতখানি আন্তরিক ধারক ও বাহক হতে পারে, আলোচ্য প্রবাদগুলির মাধ্যমে তারও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি রামায়ণ-মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণের অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্র-রাজির মধ্যে আমাদের সমাজের মানুষ বিশেষভাবে কোন্ কোন্ চরিত্র ও ঘটনায় অধিকতর আকৃষ্ট, সে পরিচয় জানতে গেলেও পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির সহায়তা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই স্বীকার করতে হয়। আর এর থেকেই বাঙ্গালী মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয়টুকু লাভ করা সম্ভব।

বাংলা প্রবাদে ঐতিহাসিক চরিত্র

অতীত কালের বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মাচরণ এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে কয়েক-জন মাত্রই বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়ে প্রবাদ-পুরুষ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বাংলা প্রবাদে বর্ণিত ঐতিহাসিক চরিত্রের অধিকাংশই বাঙ্গালী হলেও দুটি একটি অবাঙ্গালী চরিত্র অথবা বাংলার ইতিহাস বহির্ভূত চরিত্রও স্থান পেয়েছেন লক্ষ্য করা যায়। যে সব চরিত্র প্রবাদগুলিতে স্থান পেয়েছেন, গুরুত্বের বিচারে কয়েকজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ চরিত্রের তুলনায় আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্তমান, কিন্তু যে সংহত সমাজে প্রবাদগুলির সৃষ্টি, সেই সমাজকে নিঃসন্দেহে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি প্রভাবিত করতে পারেন নি বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন নি। সেই কারণে ঐ সব চরিত্র অনুল্লিখিত রয়ে গেছেন।



যেসব ঐতিহাসিক চরিত্র বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছেন, স্বাভাবিক কারণে প্রবাদের স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে তাঁদের চরিত্রের একটি দিকমাত্রই আভাসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখের বিষয় হল এই যে, ঐতিহাসিক চরিত্রের গুণের দিকটি যেমন অভিব্যক্ত হয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আবার চরিত্র বিশেষের ত্রুটির দিকটির প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। অবশ্য প্রবাদে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের যে সকল ক্রিয়া-কলাপকে সংহত সমাজ ত্রুটি বলে বিবেচনা করেছে, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে সেগুলি আদৌ ত্রুটির পর্যায়ভুক্ত নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ঐ সব চরিত্রের মহত্ত্বের কারণ রূপে স্বীকৃত। অবশ্য যে সংহত সমাজে ঐসব প্রবাদের সৃষ্টি সেই সমাজের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী আশা করাও বোধ করি অসমীচীন।

যাই হোক যে সব বাংলা প্রবাদে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, সেই প্রবাদগুলির আলোচনার মাধ্যমে আমরা অতীত কালের বাংলাদেশের চিত্র

এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নানা ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পাব। প্রথমেই রাজা-রাজড়াদের নিয়ে রচিত প্রবাদগুলির প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত বাংলা প্রবাদে এঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু।

অন্য একটি প্রবাদেও মহীপাল স্থান পেয়েছেন—

ধান ভানতে মহীপালের গীত।

এখন প্রশ্ন হল এই মহীপাল কে যাঁর কীর্তিগাথা ধান ভানার সময় গাওয়া হত, কিংবা ঘুঁটে, কাঠ কুড়াবার সময় যাঁর কীর্তিগাথা অবলম্বনে রচিত গীতিকা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দুটি প্রবাদ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মহীপাল এমনই খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, বিশেষত সমাজের একেবারে সাধারণ স্তরের মানুষের মনেও স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা কাজে তিনি প্রেরণা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা দু'জন মহীপালের সন্ধান পাই। দু'জনেই পালবংশীয়। এঁদের একজন হলেন প্রথম মহীপাল এবং অপরজন দ্বিতীয় মহীপাল। প্রবাদে শুধু মহীপালেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন্ মহীপাল তার উল্লেখ নেই। তাই দুই মহীপালের কথাই আমাদের জেনে নিতে হবে, তাহলেই বোঝা যাবে প্রবাদে বর্ণিত মহীপাল আসলে কে?

পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ছিলেন প্রথম মহীপাল। ইনি অর্ধশতাব্দী কাল রাজত্ব করেছিলেন। এঁর রাজত্বকালে পাল রাজবংশে যে সুদিন ফিরে এসেছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পালরাজ্যের লুপ্ত গৌরবের অনেকখানিই ইতি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে এবং বিহারের কয়েকটি স্থানেও পাল কর্তৃক পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে এঁর কর্তৃত্ব বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। কম্বোজ নামক এক বিদেশী জাতির আক্রমণ থেকে তিনি বহু দেশকে রক্ষা করেছিলেন। নানা স্থানে তিনি অনেকগুলি অশোকস্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। অগ্নিদাহে বিনষ্ট সুবিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের সংস্কার সাধন, বৌদ্ধ গয়ায় একাধিক মন্দির নির্মাণ, কাশীধামে নবদুর্গার মন্দির ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির নির্মাণের কৃতিত্বও তাঁরই। দিনাজপুরস্থিত মহীপালদীঘি,

মহীপাল এবং মহীগুর, মহীসন্তোষ ইত্যাদি স্থানগুলি আজ তাঁর স্মৃতি রক্ষা করছে। শেষ জীবনে প্রথম মহীপাল কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের কাছে পরাজিত হন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশে এক নতুন জাতীয় জাগরণ ঘটেছিল বলে বলা হয়ে থাকে।

অপর পক্ষে দ্বিতীয় মহীপালও হলেন পালবংশের অপর একজন রাজা। তিনিও পাল রাজ্যের হৃত মর্যাদা কিছু পরিমাণে উদ্ধার করার কৃতিত্বের অধিকারী। এঁর শাসনকালেই উত্তরবঙ্গে কৈবর্তনেতা দিব্যোকের নেতৃত্বে প্রজাবিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তুলনামূলক বিচারে প্রথম মহীপাল যে অধিকতর জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন তা সহজে অনুমিত হয়। আর তাই বলা চলে তিনিই প্রবাদ পুরুষ হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।
একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মোষের শিঙ, ভেড়ার শিঙ, তারে কি বলে শিঙ।
সিংয়ের মধ্যে ছিল এক গঙ্গা গোবিন্দ সিং॥

এই গঙ্গাগোবিন্দ সিং হলেন আসলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এঁর জন্মকাল ১৭৩৯। গঙ্গাগোবিন্দ সিং কান্দী রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ফরাসী ভাষা এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব পত্রে বিশেষ পটু তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান গঙ্গাগোবিন্দকে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। দেওয়ান পদে যোগদানের পূর্বে ইনি রাজা রাজবল্লভের অধীনে ছিলেন সহকারী দেওয়ান। এঁর কার্যদক্ষতায় হেস্টিংস অত্যন্ত প্রীত হন এবং পরে এঁকে রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের নানা স্থানেই যে ইনি বহু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন, তার মূলেও ছিল হেস্টিংস-এরই আনুকূল্য। গঙ্গাগোবিন্দ তৎকালীন জমিদার মণ্ডলীর কর্তা হয়ে বসেছিলেন। জমিদারের স্বত্ব-স্বামিত্ব বিশেষভাবে এঁর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করত। প্রজাপীড়ক অত্যাচারী হিসাবে একদিকে যেমন গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন কুখ্যাত, অপরদিকে আবার ধর্মপরায়ণ ও দানশীল হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। মাতৃশ্রাদ্ধে ইনি নাকি সেকালে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষেও অগাধ অর্থ দান করেন। এঁর মোট দানের পরিমাণ হবে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার মত। কান্দী এবং কলকাতায় একাধিক মন্দির নির্মাণের কৃতিত্বও গঙ্গাগোবিন্দর। বেশ কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাগোবিন্দ প্রদত্ত বৃত্তিলাভের

অধিকারী ছিলেন। কলকাতার পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায় একটি প্রবাদে স্থান পেয়েছেন—

কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ, কোথায় ভজা জেলে।

অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একেবারে অপরিচিত ও অতি সাধারণ ব্যক্তির বৈপরীত্য বোঝাতেই এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়। এখন দেখা যাক প্রবাদে রাজা রামকৃষ্ণের স্থান পাওয়ার কারণটি কি। রামকৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত দীন-দরিদ্রের সন্তান। কিন্তু সৌভাগ্যের ফেরে ইনি রাণী-ভবানীর দত্তক পুত্র হন এবং সেই সূত্রেই রাজত্ব লাভ করেন। দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর রামকৃষ্ণকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রস্তাবিত 'দশশালা বন্দোবস্তে' ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। অবশ্য তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য হয় নি। রাজা রামকৃষ্ণ দরিদ্র অবস্থা থেকে রাজত্বের অধিকারী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তিনি সংসারের ভোগ-সুখে প্রবলভাবে আসক্ত হন নি। আসক্ত তো হন নিই, বরং পরবর্তীকালে ইনি সংসারে বীতস্পৃহ হয়েছিলেন। আর এই কারণেই ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং প্রবাদ পুরুষে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নাটোরের রাণী ভবানী একাধিক প্রবাদেই স্থান পেয়েছেন। প্রথমত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা প্রবাদে যে সব ঐতিহাসিক ব্যক্তি স্থান পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মহিলার স্থান প্রায় শূন্য বলা চলে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বলা চলে রাণী ভবানী। তাই সেদিক দিয়ে রাণী ভবানী সংক্রান্ত প্রবাদের যে এক বিশেষ গুরুত্ব আছে তা অনস্বীকার্য। রাণী ভবানী সংক্রান্ত প্রবাদেও অতি সম্ভ্রান্ত ও পরিচিতা মহিলার সঙ্গে অপরিচিত ও অতি সাধারণ রমণীর বৈপরীত্যমূলক তুলনা স্থান পেয়েছে। রাণী ভবানী সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রবাদ দুটি উদ্ধার করা যেতে পারে। দুটি প্রবাদের বিষয় বস্তুই মূলতঃ এক, কেবল উপমানের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ঘটেছে মাত্র—

কোথা রাণী-ভবানী, কোথা পাড়ার শেজ-মুতনী—

'শেজ মুতনী' অর্থাৎ ঘুঁটে কুড়ানী।

অপর প্রবাদটি হল—

রাণী ভবানী আর ফুল জেলেনী।

রাণী-ভবানীর জন্ম হয় ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে (১১২২ বঙ্গাব্দে) বগুড়ার ছাতিয়ান গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে। রাণী-ভবানীর পিতা ছিলেন আত্মারাম চৌধুরী। সুলক্ষণা ও সুন্দরী ভবানী নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পুত্র রামকান্ত রায়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত নাটোরের রাণী হন ভবানী। তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ বছর। প্রায় দেড় কোটি টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির অধিকারিণী হন ভবানী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি জমিদারীর কাজকর্ম নিজেই দেখাশুনা করতেন। দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় ওয়ারেন হেস্টিংস ভবানীর জমিদারী হস্তগত করেন। এছাড়া রাণীর প্রাসাদ অবরোধ করেও তিনি প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। ভবানী এ সবের বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের কাছে আবেদন করেন। শেষে কাউন্সিল রাণীর আবেদন গ্রাহ্য করে তাঁর সব সম্পত্তি তাঁকে প্রত্যার্পণ করেন।

বাংলাদেশে রাণী-ভবানী বিশেষভাবে দানশীলা ও ধর্মপরায়ণা রমণী হিসাবে খ্যাত। কাশী, গয়া, রাজসাহী ও অন্যান্য অনেক বড় বড় নগরে তিনি অসংখ্য দেবালয় স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া দেশের নানা স্থানে বেশ কয়েকটি পান্থনিবাস ও জলাভাব দূরীকরণের জন্য অসংখ্য পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়েছিলেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা এবং অন্যান্য ধর্মকার্যের জন্য প্রতি বছর ইনি একলক্ষ আশি হাজার টাকার নগদ বৃত্তি নির্দিষ্ট করেছিলেন। বীরভূম, রাজসাহী, বগুড়া, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ব্যক্তিদের প্রায় পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি দেবোত্তর কিংবা ব্রহ্মোত্তর করে দিয়েছিলেন। নাটোর গঙ্গাহীন বলে রাণী অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদে বড় নগর গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করতেন। উনআশী বছর বয়সে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলাকে নিয়েও একটি প্রবাদ রচিত হতে দেখা গেছে। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

যারে দেয়না খোদাতালা, তারে দেয় না আসফ্‌উদ্দৌলা।

আসফ্‌উদ্দৌলা ছিলেন অযোধ্যার চতুর্থ নবাব। পিতা নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইনি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে আসফ্‌উদ্দৌলা ছিলেন দাতা। প্রবাদে তাঁর সেই দানশীলতাকে মূর্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কিন্তু তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল যা নিঃসন্দেহে

তাঁর চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ বিবেচিত হবে। অবশ্য প্রবাদে সেই কলঙ্কের দিকটি অভিব্যক্ত হয় নি। সেটি হল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মাতা ও পিতামহীর ধনরত্ন বলপূর্বক হস্তগত করা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ফৈজাবাদ চুক্তি অনুযায়ী অযোধ্যায় অবস্থানকারী ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহনে অযোধ্যা বাধ্য ছিল। এই কারণে ইংরেজের কাছে অযোধ্যার প্রচুর ঋণ হয়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই ঋণ শোধের জন্য অযোধ্যার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার মা ও পিতামহী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রভূত ধন-রত্ন লাভ করেছিলেন। নবাব বলপূর্বক এইসব ধনরত্ন আদায়ের জন্যে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। যদিও ইংরেজ সরকার অযোধ্যার বেগমদের রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, তথাপি ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভূত ধন-রত্নের লোভে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নবাবকে বেগমদের কাছ থেকে বলপূর্বক ধনরত্ন আদায়ে সাহায্য করতে অযোধ্যায় ইংরেজ সৈন্য পাঠান। বৃটিশ পার্লামেণ্টে পরবর্তীকালে অযোধ্যার বেগমদের ধনরত্ন লুণ্ঠনের ব্যাপারে যুক্ত থাকায় হেস্টিংস এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

আসফ্‌উদ্দৌলা অযোধ্যার রাজধানী ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌয়ে স্থানান্তরিত করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের বারভুঁইয়াদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন ভুইঞা বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছেন। এঁরা হলেন চাঁদ রায় ও কেদার রায়। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

খায় লয় চাঁদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের।

একের প্রাপ্য প্রশংসা যখন অন্যজনে লাভ করেন তখন এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখন প্রবাদে উল্লিখিত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

চাঁদ রায় এবং কেদার রায় ছিলেন দুই সহোদর ভাই। পূর্বেই উল্লিখিত-হয়েছে যে, এঁরা ছিলেন বাংলার বিখ্যাত বার ভুঁইয়াদের অন্যতম। এঁরা ছিলেন কর্ণাটের অধিবাসী। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে এঁদের পূর্বপুরুষ নিমু রায় কর্ণাট ত্যাগ করে এদেশে আসেন এবং বিক্রম-পুরের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গের সেনরাজগণের পতন হলে নিমু রায় বিক্রমপুর পরগণা আত্মসাৎ করে নেন। নিমুরায়ের পরবর্তীকালে চাঁদ রায় এবং কেদার রায় দুজনেই বিক্রমপুর শাসন করেন।

দুজনেই ছিলেন পরাক্রমশালী। চাঁদ রায় এবং কেদার রায়—দুজনেই চেয়েছিলেন বাংলার বার ভুঁইয়াদের ঐক্যবদ্ধ করে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা। দুভাই-ই নিজেদের রাজ্য রক্ষার জন্য বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন, বহু অস্ত্রশস্ত্র ও অসংখ্য সৈন্যও সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল শ্রীপুরে। চাঁদ রায় এবং কেদার রায় দুজনে আরাকানী ও মগ দস্যুদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। দুজনেরই পরিণতি বড় করুণ। কেদার রায় মন্দিরে পূজা করার কালে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। অপরপক্ষে চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ী বা সোনামণিকে রাজবাড়ীর পূর্বগুরু শ্রীমত খাঁ প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য রাজকুমারীর প্রতি আসক্ত ঈশা খাঁর হাতে কৌশলে তুলে দিলে, সেই সংবাদে চাঁদ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কেদার রায় ছিলেন জলযুদ্ধে অদ্বিতীয়। আরাকান রাজের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি তাঁকে পরাজিত করেন। পরাজিত করেছিলেন মোঘল সেনাপতি মন্দা রায়কেও। মন্দা রায় কেদার রায়ের হাতে নিহতও হন। মানসিংহও কেদার রায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কেদার রায় খুব ভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি কোটীশ্বর নামক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। প্রজাদের কল্যাণের জন্যেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। প্রবাদে চাঁদ রায়কে বঞ্চিত করে তাঁরই প্রাপ্য খ্যাতি ও প্রশংসা কেদার রায় লাভ করেছিলেন বলে যে কেন বলা হয়েছে তার কোন সুস্পষ্ট কারণের সন্ধানলাভ করা যায় না। এইবার প্রবাদে না হোক প্রবাদমূলক কয়েকটি বাক্যাংশের উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন ভূম্যধিকারীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। এরকমই একটি বাক্যাংশ হল—

নবাব তেজচন্দ্র আর কি।

নবাব তেজচন্দ্র ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের পুত্র। ইনি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বাষট্টি বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁরই সময়ে বাংলাদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়। এইরকমই আর একটি বাক্যাংশ হল—

রাজা নবকৃষ্ণ আর কি।

রাজা নবকৃষ্ণ (১৭৩৩—১৭৯৭) শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি উর্দু ও ফারসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। এছাড়া আরবী

ও ইংরেজিতে তাঁর অধিকার ছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর ফারসী ভাষায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-দ্দৌলার পদচ্যুতি সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সব বৃত্তান্তই ইনি অবহিত ছিলেন। বাংলাদেশে যাঁরা ইংরেজ প্রতিপত্তি প্রসারের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের প্রয়াসে নবকৃষ্ণ 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। নবকৃষ্ণ প্রথমে গভর্নর ড্রেকের মুন্সী ও পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র-সচিব পর্যন্ত হয়েছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর গুপ্ত ধনাগার থেকে মীরজাফর, আমীর বেগ ও রামচাঁদ রায়ের সঙ্গে নবকৃষ্ণও আট কোটি টাকার ধনরত্ন লাভ করেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সে-যুগে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সভার আয়োজন হয়েছিল, সেই সভা সংলগ্ন স্থানে আমন্ত্রিত পণ্ডিত ও অভ্যাগতদের বাসস্থান ও সেই সঙ্গে কাঙ্গালীদের জন্য পণ্যবীথিকা স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলটিই সভাবাজার বা শোভাবাজার নামে পরিচিত হয়। এইবার বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ অবলম্বনে রচিত একটি বাক্যাংশের উল্লেখ করা গেল—

গোপাল সিংহের বেগার।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বলপূর্বক বিনা পারিশ্রমিকে বোধহয় রাজা গোপাল সিংহ কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত করতেন, সেই কথাই উদ্ধৃত বাক্যাংশটিতে বলা হয়েছে। তা কিন্তু নয়। গোপাল সিংহ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। এঁর রাজত্বে সকলের হরিনাম-সংকীর্তন করা ছিল আবশ্যিক। কেউ যদি হরিনাম-সংকীর্তনে অংশগ্রহণ না করত, তবে গোপাল সিংহ তার দণ্ডবিধান করতেন। বলা বাহুল্য, শাস্তিলাভের ভয়ে তাই অনেক অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও হরিসংকীর্তন করতে হত। বিষ্ণুপুরবাসী এই হরিনাম করাকেই—'গোপাল সিংহের বেগার' বলে অভিহিত করতেন।

গোপাল সিংহ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁর নামে একটি বৈষ্ণব কাব্য পাওয়া গেছে। গৃহী এবং রাজা হয়েও ইনি সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করতেন। তাই এঁকে বলা হত 'রাজর্ষি'। গোপাল সিংহ একজন সুকণ্ঠ কীর্তন গায়কও ছিলেন। বিষ্ণুপুরে পাঁচটি সুন্দর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল সিংহ। এঁরই রাজত্বকালে ভাস্কর

পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্য কর্তৃক বিষ্ণুপুর আক্রান্ত হয়। কথিত আছে— বিষ্ণুপুরের প্রধান দেবতা মদনমোহন দল-মাদল কামানের সাহায্যে শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করেছিলেন।

অপর একটি বাক্যাংশে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কথা বর্ণিত হয়েছে –

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা আর কি।

সিরাজদ্দৌল্লা (১৭৩০ – ১৭৫৮) নামটি আমাদের সকলেরই পরিচিত। তবু সংক্ষেপে এঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে। নবাব আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র ছিলেন ইনি। এঁর পিতার নাম জৈনউদ্দীন আহম্মদ এবং মা আমিনা বেগম। আলিবর্দীর উত্তরাধিকারী রূপে ইনি ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন অনুষ্ঠিত পলাশীর তথাকথিত যুদ্ধে ইনি মীরজাফরের চক্রান্তে পরাজিত ও বন্দী হন। পরে মীরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে মহম্মদী বেগের হাতে নিহত হন।

মালবদেশের পরাক্রান্ত অধিপতি, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মানুষ রাজা ভোজকে নিয়েও একটি প্রবাদ রচিত হয়েছে –

কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলী।

রাজা-রাজড়ার পরে সেনাপতি-বিষয়ক প্রবাদের আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে –

শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলে বাঘে, অন্য লোকে কোথা লাগে।

শঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন বাংলার বার ভুঁইয়াদের অন্যতম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বাল্যসঙ্গী। বীর সেনাপতিরূপে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন। মোঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শঙ্কর বারবার তাঁর অসামান্য বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এমনকি অম্বররাজ মানসিংহও এঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাঙ্গালী চিরকাল বাহুবলে দুর্বল—এই প্রচলিত ধারণাটি যে কতদূর ভিত্তিহীন, শঙ্কর চক্রবর্তীর শৌর্য-বীর্য তারই প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হবার যোগ্য। উদ্ধৃত প্রবাদটিতে শঙ্করের সেই অসামান্য শৌর্য-বীর্যের প্রতিই পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হল –

বিরূপাক্ষের কাটা, কালাপাহাড়ের কাটা।

এই কালা পাহাড় ছিলেন সেকন্দার সুরের ভাই। বাংলাদেশে কররানি বংশীয় সুলতান সুলেমান ও তাঁর পুত্র দায়ুদের সেনাপতি ছিলেন এই কালাপাহাড়।

কুচরাজ শুক্লধ্বজ বাংলাদেশ আক্রমণ করলে কালাপাহাড় তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও বন্দী করেন। মোঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ও বিহারে যে বিদ্রোহ হয়, কালাপাহাড় সেই বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং এই যুদ্ধেই তিনি প্রাণ হারান। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পুরী আক্রমণ করেন এবং জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করেন। এঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হয়েও পরে ইনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং প্রবল হিন্দু বিদ্বেষীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এ দেশে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যে সব রাজপুরুষের যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদেরই অন্যতম হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। অন্যান্য বহু ইংরেজ রাজপুরুষ এদেশে শাসনসূত্রে এসেছিলেন, কিন্তু বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছেন একমাত্র হেস্টিংসই—

হাতী পর হাওদা, ঘোড়া পর জিন।
জল্‌দি আও জল্‌দি আও ওয়ারেন হেস্টিন।

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস-এর জন্ম হয়। মাত্র আঠার বছর বয়সে ইনি অর্থাৎ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক বন্দী হন। এঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এঁকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর পদে উন্নীত করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাংলার গভর্নর হন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয় এঁরই চক্রান্তে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, ভারতে অবস্থানকালে ইনি নানাবিধ অন্যায় কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর ব্যাপী বিচার চলার পর অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মুক্তি লাভ করেন।

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে—

শিরোমণিশ্চ চৈতন্যো বল্লালো রঘুনন্দনঃ।
লোকানাং ধর্ম্মনাশায় কলেঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্॥

অর্থাৎ কলিকালে মানুষের ধর্মনাশের জন্য যে চারজনের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা হলেন—নৈয়ায়িক রঘুনাথশিরোমণি, চৈতন্যদেব, বল্লালসেন এবং স্মার্ত রঘুনন্দন। অনুরূপ বাংলা প্রবাদটি হল—

রঘু চৈতা বলা, এ তিন কলির চেলা।

প্রবাদটিতে যথাক্রমে তিন জন ঐতিহাসিক পুরুষের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এই তিন জন হলেন যথাক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি, চৈতন্য মহাপ্রভু এবং বল্লাল সেন। রঘুনাথ শিরোমণির নিবাস ছিল শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে। পিতার নাম গোবিন্দ চক্রবর্তী। মাতা সীতাদেবী। শৈশবে মাতার সঙ্গে নবদ্বীপে এসে রঘুনাথ বাসুদেব নামক এক বিখ্যাত নৈয়ায়িকের গৃহে অবস্থান করেন এবং তাঁরই টোলে পড়াশুনা করেন। কথিত আছে যে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর নাকি সতীর্থ ছিলেন। নবদ্বীপের পাঠ শেষ করে রঘুনাথ যান মিথিলায়। সেখানে পক্ষধর মিশ্রের টোলে তিন বছরকাল অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে মিথিলার নিয়ম ছিল যে সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কোন পুঁথি লিখে আনতে পারবেন না। রঘুনাথ পুঁথিগুলি সব কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। নবদ্বীপে এসে তিনি স্বয়ং টোল খোলেন তারপর শুরু করেন নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে পাঠ নিতে আসত। রঘুনাথ বহু গ্রন্থেরও রচয়িতা। যেমন—পদার্থ খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেক টীকা, প্রামাণ্যবাদ, লীলাবতী টীকা, অনুমান দীধিতি, শব্দমণিদীধিতি ইত্যাদি। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। চৈতন্য সহচর নিত্যানন্দের হরিনাম এবং রঘুনাথের নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার কারণে সে সময়ে এদেশে মীমাংসানুগত যাগযজ্ঞাদি ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তাই সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল সমর্থকেরা রঘুনাথকে খুব সুনজরে দেখেন নি। তাঁকে ধর্ম বিদ্বেষী বলেই বিবেচনা করা হত। সেই মানসিকতার প্রতিফলন উদ্ধৃত প্রবাদটিতে লক্ষ্য করা যায়। উদ্ধৃত প্রবাদটিতে রঘুনাথ শিরোমণির সঙ্গে চৈতন্যদেবের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

চৈতন্যদেব ১৪৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নদীয়া জেলাস্থিত নবদ্বীপ ধাম। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। চৈতন্যদেবের পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর কাছেও দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক তিনি। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্মে দেবতা ধরা দিয়েছেন মানুষের আপন জন হিসাবে। মানুষের মধ্যেই দেবতা প্রকট হয়ে উঠেছেন। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে দেখা দিয়েছে। ঈশ্বর আরাধনায় সবার সমান অধিকার। এরজন্যে দ্বিতীয় কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এমনকি দেব

সেবার সঙ্গে এযাবৎকাল যুক্ত নানা জটিল আচার-অনুষ্ঠানও তিনি অর্থহীন বলে ঘোষণা করলেন। চৈতন্যদেব মহাপ্রয়াণ লাভ করেন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রবাদে যে কারণে রঘুনাথের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়েছে, সেই একই কারণে চৈতন্যদেবকেও ধর্মবিনষ্টকারী রূপে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে বল্লাল সেন। আনুমানিক ১১৫৮ সালে বিজয় সেনের মৃত্যুর পর বল্লাল সেন পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি গৌড়রাজ গোবিন্দ পালকে পরাজিত করে মগধ জয় করেন। পিতা বিজয় সেনের জীবদ্দশাতেই ইনি মিথিলা জয় করেন। বল্লাল সেন নিজের রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা—এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন। 'অরিরাজ .নিঃশঙ্ক-শঙ্কর'—এই উপাধিটি তিনি ধারণ করেছিলেন। বল্লাল সেন ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। গুরু অনিরুদ্ধের কাছে তিনি বেদ-স্মৃতি-পুরাণ—ইত্যাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন যাগ-যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানের প্রবীণ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ব্রত-সাগর, আচার-সাগর, দান-সাগর ইত্যাদি পাঁচটি গ্রন্থেরও রচয়িতা তিনি। বৃদ্ধবয়সে তিনি পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে সস্ত্রীক ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু প্রবাদে তাঁর উল্লেখ অন্য কারণে। সেটা হল বল্লাল সেনই বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক। বলা বাহুল্য এজন্য প্রবাদে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগই প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি সনাতন সমাজ ধর্ম বিনষ্ট করার মূলে ছিলেন।

জাত-ধর্ম বিনষ্টের ব্যাপারে অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ইষ্টিসেন, কেশবসেন, উইলসেন
তিন সেনেতে জাত মারলেন।

ইষ্টিসেন বলতে এখানে রেলগাড়ীকে বোঝান হয়েছে, আর উইলসেন হলেন একজন হোটেলওয়ালা, হোটেলে সব জাতের মানুষই খাওয়া-দাওয়া করে বলে উইলসেনকে জাত মারার ব্যাপারে দায়ী করা হয়েছে। কেশব সেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের একজন প্রথম সারির নেতা। এঁর জন্ম হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। দর্শন এবং ধর্ম বিষয়ে এঁর ছিল গভীর জ্ঞান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইনি ছিলেন প্রিয়পাত্র। অসাধারণ বাগ্মীতা এবং স্বদেশপ্রেমের জন্যে তাঁর ছিল দেশজোড়া খ্যাতি। নানা সামাজিক সংস্কারেও তাঁর ছিল বিশেষ অবদান। মদ্যপান নিবারণ, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিবারণ আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা, ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ধর্ম প্রচারের জন্য বিলাত যান। 'ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন' ও 'অ্যালবার্ট হলে'র প্রতিষ্ঠাতা ইনি। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এবং হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করার জন্যেই প্রবাদে তাঁকে জাত মারার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ও হাস্যরসিক শান্তিপুর নিবাসী গোপাল ভাঁড়ও একটি প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছেন। বলা হয়েছে—

নুনের ভাঁড় তেলের ভাঁড়, তারে কি বলে ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল নদের গোপাল ভাঁড়॥

অনুরূপভাবে কলকাতার আহিরীটোলার বদান্য ধনী গৌরীকান্ত সেনও একটি প্রবাদে উল্লিখিত হয়েছেন—

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

গৌরী সেন ছিলেন হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামের (বহরমপুরের) অধিবাসী। জাতিতে ছিলেন সুবর্ণ বণিক। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের কারামোচনে ইনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাই তাঁর বদান্যতাকে প্রবাদটিতে ধরে রাখা হয়েছে।

আর একটি প্রবাদের উল্লেখ করা গেল। প্রবাদটি হল—

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥

বাঙালীর স্বাধীন শিল্পোদ্যম ও ব্যবসার ক্ষেত্রে রামদুলাল সরকার একজন বরণীয় ব্যক্তি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বাল্যকালে পিতৃমাতৃ হীন রামদুলাল লালিত পালিত হন মাতামহীর কাছে। মাতামহী ছিলেন সেকালের কলকাতার একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মদনমোহন দত্তের বাড়ীর পাচিকা। মাতামহীর সূত্রেই রামদুলাল মদনমোহনের স্নেহলাভে সমর্থ হন এবং সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখে মদনমোহনের গদীতে মাসিক দশ টাকা বেতনে চাকরীতে নিযুক্ত হন। একবার মদনমোহন তাঁকে একটি নিলাম ধরতে পাঠান। রামদুলাল সেই নিলাম ধরতে অসমর্থ হন। তবে তার পরিবর্তে চোদ্দ হাজার টাকায় একখানি ডুবোজাহাজ ক্রয় করেন এবং সেটিকে অতিরিক্ত একলক্ষ টাকায় এক সাহেবকে বিক্রয় করেন। এরপর সমস্ত টাকাই রামদুলাল মদনমোহনের হাতে তুলে দিতে যান। কিন্তু মদনমোহন সব টাকা না নিয়ে লভ্যাংশ একলক্ষ টাকা রামদুলালকে দান করেন। বলা বাহুল্য তিনি রামদুলালের সততা এবং ব্যবসা বুদ্ধিতে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। যাইহোক

রামদুলাল মদনমোহনের কাছ থেকে প্রাপ্ত একলক্ষ টাকা দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে মুখ্যতঃ রামদুলালের প্রয়াসেই বাংলা দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমেরিকার ব্যবসায়ীরা রামদুলালের নামানুসারে একটি জাহাজের নামকরণ করেছিলেন। তাঁর অর্জিত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হয়।

প্রাণকৃষ্ণ হালদার ছিলেন বাবুসম্প্রদায়ভুক্ত। আড়ম্বরপ্রিয়তা, বিলাসিতা এবং সেইসঙ্গে পরোপকারিতায় তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' থেকে প্রাণকৃষ্ণ হালদার সম্পর্কে প্রকাশিত দুটি বিবরণ উদ্ধার করা গেল, যে বিবরণ দুটি থেকে প্রমাণিত হবে কেন তিনি প্রবাদ-পুরুষ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

২৯ অক্টোবর ১৮২৫/১৪ কার্তিক ১২৩২

সংপ্রতি মোকাম চুঁচড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলের চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে।

এইবার লোকোপকারের পরিচয়—

২০ অক্টোবর ১৮২৭/৫ কার্তিক ১২৩৪

চুঁচড়া নিবাসী দ্বিজমিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয়পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজ দ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাঁহারা ধন ব্যয় দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিত দ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতু ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদারবাবু ধন ব্যয় করিয়া সঞ্চয় করিতেছেন রোগে ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে অরোগের ইহাতে কোন

লভ্য নাই কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন।

অত্যধিক বাবুয়ানি এবং বিলাসিতার জন্য বলা হয়—

নবাব খাঞ্জা খাঁ।

এই নবাব খাঞ্জা খাঁ কোন কাল্পনিক চরিত্র নন, ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁর প্রকৃত নাম ছিল খান্ জাহান্ খান্। অতিরিক্ত নবাবিয়ানার জন্যই ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাঞ্জা খাঁ ছিলেন হুগলীর শেষ ফৌজদার। ইনি বাস করতেন হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অট্টালিকায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ হুগলীর ফৌজদারের পদটি তুলে দিলে খাঞ্জা খাঁর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পূর্বে গোন্দলপাড়া তালুক ছিল এঁর জমিদারীভুক্ত। খাঞ্জা খাঁ মারা যান ১৮৩০ সালের ২০শে জানুয়ারী। এঁর মৃত্যুর পর ইংরেজরা এঁর বিধবা স্ত্রীকে একশ টাকা করে বৃত্তি দিতেন।

আত্মারাম সরকার নামটি এখনকার দিনে অনেকেরই অচেনা লাগবে, কিন্তু যাদুবিদ্যা প্রসঙ্গে এই নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবার যোগ্য। যাদুবিদ্যা প্রসঙ্গে এখন যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি পি. সি. সরকার। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্বে এই আত্মারাম সরকার পি. সি. সরকারের মতই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। হাওড়া জেলার কমলাপুর গ্রাম নিবাসী আত্মারাম ছিলেন কায়স্থ বংশোদ্ভূত। কথিত আছে যে ইনি কামরূপ—কামাখ্যা থেকে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ফিরে আসেন এবং বিখ্যাত যাদুকর রূপে পরিচিতি অর্জন করেন। এঁর একটি বিখ্যাত খেলা ছিল চালুনি ও ধুচুনিতে জল স্থির রাখা। এহেন আত্মারাম সরকারের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে প্রবাদটি এখনও টিঁকে আছে, সেটি হল—

আত্মারাম সরকারের বাজি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ২৪ পরগণার হালিশহরে একজন স্বভাব কবি ছিলেন, এঁর নাম আজু গোঁসাই। ইনি ছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক এবং এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। এঁকে নিয়ে রচিত যে প্রবাদটি চলিত আছে, তা হল—

আজু গোঁসাই আর কি।

স্বভাব কবি রূপে কাউকে অভিহিত করতে কিংবা কারো কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করতে প্রবাদটি উল্লিখিত হয়। আজু গোঁসাই ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। রহস্য কবিতা কিংবা সঙ্গীত রচনায় এঁর দক্ষতা ছিল কল্পনাতীত। এঁর

অধিকাংশ সঙ্গীতই স্বগ্রামবাসী রামপ্রসাদকে কটাক্ষ করে রচিত। বৈষ্ণব পদ রচয়িতা আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের শাক্ত সঙ্গীতের জবাব মুখে মুখে সঙ্গীত-রচনার মধ্য দিয়ে দিতেন। রামপ্রসাদ এবং আজু গোঁসাইয়ের মধ্যেকার সঙ্গীত দ্বন্দ্ব দেখতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রাসাদে প্রায়ই উভয়কে আহ্বান জানাতেন।

অত্যন্ত আলস্য এবং অকমর্ণ্যতার কারণে আমরা ব্যক্তি বিশেষকে সমালোচনা করে বলি :

সরফরাজি করা।

এই সরফরাজ খাঁও ঐতিহাসিক চরিত্র। ইনি ছিলেন যেমন দুশ্চরিত্র, তেমনি অকর্মণ্য আর তেমনি অলস প্রকৃতির। এঁর প্রকৃত নাম ছিল আলাউদ্দৌলা। সরফরাজ ছিলেন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী রূপে ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব হয়েছিলেন। পিতা সুজাউদ্দীন যখন মুর্শিদাবাদ অধিকারের জন্য আসেন, তখন সরফরাজ তাঁকে মুর্শিদাবাদের অধিকার ছেড়ে দেন। এরপর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ নাম নিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু রাজকার্যে অযোগ্যতার জন্য ইনি সকলের অপ্রীতিভাজন হন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁর নামে সুবাদারী সনন্দ আনেন। সনন্দ পেয়ে আলিবর্দী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সরফরাজ আলিবর্দীর গতিরোধ করেন, উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় ঘরিয়ায়। যুদ্ধে সরফরাজ প্রাণ হারান। প্রভাব-প্রতিপ্রতিশালীর অধিকারিণী রমণীর উদ্দেশে বলা হয়—

খড়দার মা গোঁসাই।

খড়দহের শ্রী পাঠে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীকে কেন্দ্র করেই প্রবাদটির উৎপত্তি। জাহ্নবা দেবী ছিলেন শালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাসের কনিষ্ঠা কন্যা। ইনি ছিলেন জন্ম-বন্ধ্যা। তাই দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামচন্দ্রকে। জাহ্নবা দেবী জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও সপত্নী বসুধা দেবীর সঙ্গে খড়দহে অবস্থান করতেন। ইনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেন, তাছাড়া বোরাকুলি মহা-মহোৎসবেও যোগদান করেছিলেন। প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস, বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাস প্রভৃতি বিখ্যাত

বৈষ্ণব ভক্তরা তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। একসময়ে জাহ্নবা দেবীর বৈষ্ণব সমাজে খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্না, দুর্বার সাহসের অধিকারিণীকে বলা হয়, 'রায়বাঘিনী'। রায়বাঘিনীও ঐতিহাসিক চরিত্র।

রায়বাঘিনী ছিলেন গ্রাম্য জমিদারের কন্যা। এঁর আসল নাম ছিল ভবশঙ্করী। বাল্যকাল থেকেই ইনি অসিখেলা, ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া ইত্যাদিতে পারদর্শিনী ছিলেন। এঁর সঙ্গে বিবাহ হয় হাওড়া জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার (পেঁড়ো বসন্তপুর) সামন্তরাজ রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে। রুদ্র-নারায়ণ মুঘল সম্রাটকে প্রতীক রাজস্ব প্রদান করে প্রায় স্বাধীন নরপতি রূপেই রাজত্ব করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রানী ভবশঙ্করী স্বামীর রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। ভুরশুটের অধিবাসী পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ ভুরশুট আক্রমণ করলে রাণী ভবশঙ্করী তার প্রতিরোধ করেন। পাঠান সর্দার ওসমান খাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট আকবর রানী ভবশঙ্করীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তন্তুজাতীয় ভদ্রসন্তানের প্রতি বিদ্রূপ বশতঃ অথবা আক্রোশ বশতঃ প্রযুক্ত হয় যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি, সেটি হল—

মাকু জঙ্গ বাহাদুর।

কথিত আছে দিল্লীর বাদশাহ আলমের মীর মুন্সী, কাঁথির তন্তুবায় বংশীয় জগমোহন দালালের পুত্র জগদিন্দ্র বনোয়ারি লাল 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। উপাধি বিতরণের সময় নকীব নাকি ভুল করে 'মহারাজা বাহাদুরে'র পরিবর্তে 'মাকু জঙ্গ বাহাদুর' বলে ঘোষণা করেছিল। সেই থেকেই এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির উৎপত্তি। এইবার আর একটি প্রবাদের উল্লেখ করা হল, যেটির সঙ্গে আমাদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে—

জগৎ শেঠ আর কি।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে জগৎ শেঠ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, এটি মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বণিক বংশের উপাধি।

বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন ও বিস্তারে জগৎ শেঠরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংক্ষেপে জগৎ শেঠদের পারি-বারিক পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

জগৎ শেঠদের আদিপুরুষ হীরানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজস্থান

থেকে পাটনায় এসে বসবাস শুরু করেন। এই হীরানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মানিক-চাঁদ ঢাকা কুঠীর মালিক হন এবং মুর্শিদাবাদেও কুঠী স্থাপন করেন। মানকি-চাঁদ সরকারী কোষাগার পরিচালনায় এবং রোকারের মাধ্যমে রাজস্ব জমা নেবার এক সহজ পথ নির্ধারণ করেন। মানিকচাঁদ ছিলেন নিঃসন্তান, ইনি তাই দত্তক নিয়েছিলেন ফতে চাঁদকে। মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর স্বভাবতঃই ফতেচাঁদ তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আস্থাভাজন এবং মন্ত্রণাদাতা হয়ে ওঠেন। ফতেচাঁদ ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক 'জগৎ শেঠ' উপাধিতে ভূষিত হন। ফতেচাঁদের মৃত্যু হয় ১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর এঁর পৌত্র মহাতাবচাঁদ ফতেচাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। ইনিই ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেও উদ্যোগী হন। ইংরেজরা প্রধানতঃ এঁর সাহায্যে মীরজাফরকে সিরাজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন রাঘব রায়। রাঘব রায় বহু পূর্বে রাজত্বের অধিকারী হন। এই কারণে বহুকাল পূর্বের কোন ঘটনাকে বোঝাতে বলা হয়—

রাঘব রায়ের কাল।

যাদুবিদ্যা বা ভোজবিদ্যার সঙ্গে আর একজনের নাম যুক্ত, তিনি হলেন ভানুমতী। কথায় বলে—

ভানুমতীর খেল।

ভোজরাজ নিজে যেমন ছিলেন যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, তেমনি তাঁর কন্যা ভানু-মতীও কুহক বিদ্যায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

বাংলা প্রবাদে সামাজিক চরিত্র

উপকরণের প্রাচুর্যে এবং বৈচিত্র্যে বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শিরোভাগে অবস্থান করে প্রবাদ। তারপর অবশ্য ধাঁধাঁর স্থান। বাস্তবিক প্রবাদের সংখ্যাধিক্য এবং সেইসঙ্গে এতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনা আমাদের সংগত কারণেই বিস্মিত করে থাকে। অবশ্য প্রবাদের ক্ষেত্রে বিষয়ের পরিব্যাপ্তির যথাযথ কারণও আছে। বলা হয় প্রবাদ হল মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বাঙ্ময় রূপ। আর মানুষের মধ্যে আচার-আচরণে কর্তব্য এবং জীবনবোধে তথা মানবিক গুণের পরিপ্রেক্ষিতে কতই না বিভিন্নতা, কতই না বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা প্রবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রকেও বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছে।



সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রবাদের উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন লক্ষ্য মানব চরিত্র। আমাদের দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য অসংখ্য উপাদানকে আধার করে মুখ্যত মানব চরিত্রকেই সমালোচনা করা হয়েছে অসংখ্য প্রবাদে। অবশ্য এই মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ করতে হয় যে, বেশকিছু প্রবাদে মানব চরিত্র বিরহিত বক্তব্যও স্থান পেয়েছে। মাছ, দেব-দেবী, মাস, স্থান, পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক চরিত্র ইত্যাদির ন্যায় বহু বিষয়ে রচিত প্রবাদে শেষ পর্যন্ত মানুষের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে মানুষের কথা বিশেষতঃ মানব চরিত্রের সমালোচনা সরাসরি প্রকাশিত না হয়ে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিভিন্ন সামাজিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলি। এইসব প্রবাদে কোনপ্রকার রূপকের আশ্রয় গ্রহণ না করেই বিভিন্ন বৃত্তিভোগী মানুষের সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি যে

লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের ন্যায় প্রবাদও সংহত সমাজের সৃষ্ট। বিভিন্ন বৃত্তিভোগী মানুষ সমাজেরই অংশ অথচ অনেক সময়েই এইসব বৃত্তিভোগী মানুষ যথাযথভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন না। সমাজের প্রচলিত আইন সবসময়ে এইসব সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির শাস্তিবিধানে সমর্থ না হলেও কিংবা বলা চলে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সামাজিক মানুষ তথাকথিত দণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেলেও প্রবাদের রাজ্যে কিন্তু প্রাপ্য দণ্ডকে আর এড়িয়ে যেতে পারেন নি এরা। সেখানে সকলকেই ন্যায্য দণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে একটা কথা, বিভিন্ন বৃত্তিভোগী সামাজিক মানুষ সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রবাদে বক্তব্য অভিব্যক্ত হলেও বিশেষ বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই যে প্রবাদে কথিত দোষে দুষ্ট এমন মনে করা সংগত হবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাদে সামাজিক মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতাকে যতই কটাক্ষপাত করা হয়ে থাক, সর্বোপরি এক প্রকার স্নিগ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা কটাক্ষের রুক্ষতা বা নির্মমতাকে অনেকাংশে লঘু করে দিয়েছে স্বীকার করতে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজ ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকার করে এসেছে। ব্রাহ্মণও তার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেছেন। বেদ-উপনিষদ পাঠে ব্রাহ্মণেরই ছিল একচ্ছত্র অধিকার। দেবার্চনার পৌরোহিত্যেও ব্রাহ্মণকেই সমাজ সুদূর অতীতকাল থেকে বরণ করে এসেছে। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদির মত সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতেও ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য স্বীকৃত। ব্রাহ্মণই ভক্ত ও ভগবানের মাধ্যম। আর ব্রাহ্মণও এর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এসেছেন। নানাভাবেই সমাজের বিভিন্ন মানুষকে শোষণ করেছেন ব্রাহ্মণ। চাপিয়ে দিয়েছেন নানা অবাঞ্ছিত বিধান। ফলে সমাজ স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। এই অসন্তুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাদ একেবারে ব্রাহ্মণদের পরিত্যাগ করেনি ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্মণদের নিয়ে রচিত প্রবাদগুলিতে নানাভাবেই তাদের অপদস্থ করে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের যেন শোধ নিয়েছে সমাজ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্রাহ্মণের আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য উপবীত ধারণের ক্ষেত্রে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

বামুন গরু ছাগল, তিনই দড়ির পাগল।

ব্রাহ্মণ অর্থের জন্য পারে না এমন কিছু নেই। উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে ঢেঁকির নামে চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প করতেও তার কোন আপত্তি থাকে না। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

ব্রাহ্মণের জীবিকা মূলত যজমানদের কাছ থেকে সংগৃহীত দক্ষিণার ওপরই নির্ভর করে। তাই একটি প্রবাদে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে—

বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

ব্রাহ্মণ নিজে অন্যের বাড়ী ভোজনে অক্লান্ত হলে কি হয় অপরকে কিন্তু ভোজন করানোর ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা। বহু প্রচলিত একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

বামুন বাড়ীর ভাত, কপালে দাও হাত।

সমাজে ব্রাহ্মণের পরই মর্যাদার স্থান অধিকার করে এসেছেন কায়স্থেরা। প্রবাদে ব্রাহ্মণদের মত কায়স্থেরাও বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছেন। প্রবাদে বিশেষভাবে সমালোচনা করা হয়েছে কায়স্থদের বুদ্ধির প্রাখর্যকে, ধূর্ততাকে। কায়স্থদের তুলনা করা হয়েছে কাকের ধূর্ততার সঙ্গে—

কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত।

একটি প্রবাদে তো কালসাপ এবং কুলটা নারীর মত কায়স্থ পরিহর্তব্য, সেই কথা বলা হয়েছে—

কায়েত, কালসাপ, বেদো নারী, তিনজনকে পরিহরি।

কায়স্থদের ধূর্ততা এমনই অবিশ্বাস্য যে একাধিক প্রবাদেই মৃত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাণহীন দেহকে কাক পর্যন্ত ঠোকরায় না বলে পরিহাস করা হয়েছে—

কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।

এই একই বিষয়কে আরও একটু ব্যঙ্গ করে বর্ণনা করা হয়েছে—

কায়েত মরে জলে ভাসে,
কাক বলে—ফিকিরে আসে।

কায়স্থকে সর্বাপেক্ষা কঠিনভাবে দণ্ডিত করা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটিতে—

দাঁত থাকে না বলে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না।

অপরের দানের ওপরেই মূলত ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে নির্ভর করতে হয় জীবিকা নির্বাহের জন্যে। যজমানরাই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সংসার নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। একটি প্রবাদে এ হেন যজমান সম্পর্কে তাই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—

দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান।

কিন্তু বাস্তবত সকল ক্ষেত্রে যজমানরা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের খুব আন্তরিকতার

সঙ্গে দান ধর্ম পালন করে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই নিছক সামাজিক কর্তব্য পালন করতে তারা চাতুরীর আশ্রয় নেয়—

বামুনকে বস্ত্রদান, আলগা তার তানা।
বামুনকে তণ্ডুলদান ভাঙা ক্ষুদ দানা ॥
বামুনকে তৈজসদান, মধ্যে তার ছেঁদা।
বামুনকে গরুদান, সার তার লেদা ॥
বামুনকে হরিনাম, ওজন তার কম।
এলরে পুরুত ওই যজমানের যম ॥

সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে এদেশের সাধারণ মানুষ জমিদার ভূস্বামী কর্তৃক নির্যাতিত, বঞ্চিত হয়ে এসেছে। স্বভাবতঃই বাংলা প্রবাদে তাই জমিদার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হতে দেখা গেছে—

সাপ শালা জমিদার, তিন নয় আপনার।

আমাদের সমাজে জ্যোতিষী-গণকদের বেশ একটা মর্যাদার স্থান স্বীকৃত। বিশেষতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা যতই অগ্রসর হচ্ছি বলে অভিমান করি, ততই আমাদের জ্যোতিষী নির্ভরতাও ক্রমবর্দ্ধমান। সমাজের সকল স্তরের মানুষই পূর্ব থেকে অনাগত ভবিষ্যতের কথা জেনে নিতে আগ্রহী। আর এই দুর্বলতারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে গণকেরা। গণক সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে তাদের সম্পর্কে তাই বিরূপ সমালোচনাই প্রকট হয়ে উঠেছে—

গণক যদি গণে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক।

ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মত গণকদেরও সম্পূর্ণরূপে অপরের ওপর নির্ভর করতে হয় জীবিকা নির্বাহের জন্য। সমাজের কোন উৎপাদনশীল কর্মের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। এমনকি ডাক্তার কবিরাজ বা শিক্ষকের মত সেবামূলক কাজও তারা করে না। তবু সমাজই তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে নির্দ্বিধায়। তাইতো একটি প্রবাদে বলা হল—

বামুন গণক কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।

প্রবাদে গণকের বৃত্তিকে নিছক ভণ্ডামির পর্যায়ভুক্ত করে দেখা হয়েছে—

রাজা খায় ভেড়ে, গণক খায় ভেঁড়ে।

পেয়াদা সমাজের পরিচিত আর এক শ্রেণীর মানুষ। পেয়াদা সম্পর্কে সমাজের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ নয়। অত্যাচার ও নির্যাতনের সঙ্গেই যেন পেয়াদা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পেয়াদা সম্বন্ধে সমাজের তাই ধারণা, অত্যন্ত রাশভারী

গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ এরা। দয়া মায়া ইত্যাদি কোমল গুণগুলি থেকে এরা বঞ্চিত। একটি প্রবাদে পেয়াদার এই গাম্ভীর্যময় চিত্রটি ফুটে উঠেছে—

হেসে হেসে কথা কয়, এ মিনসে ত পেয়াদা নয়।

অন্য একটি প্রবাদে পেয়াদাকে অপরিমেয় উৎকোচ গ্রহণকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে—

হাঁসে খায় গেঁড়ি, পেয়াদায় খায় কড়ি।

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মোড়ল বা মাতব্বর খুব সম্মানিত ব্যক্তি। সকলের কাছে তিনি আস্থাভাজন। গ্রামের ঝগড়া-বিবাদে সালিশী করা নানাপ্রকার সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে সকলকেই মোড়লের শরণাপন্ন হতে হয়। মোড়লকে তাই একদিকে যেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী হতে হয়, তেমনি সেইসঙ্গে তাঁর অপর যে গুণের প্রয়োজন সর্বাধিক তা হল তাঁর বাচন ক্ষমতা। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কথায় মোড়ল চিনি, দাতা চিনি দানে।
গোঁয়ার চিনতে পারি কর্কশ বচনে॥

আমাদের সমাজে জামাইয়ের আদর যতই হোক, প্রবাদের রাজ্যে বেচারী জামাইয়ের অবস্থাকে বড় সঙ্গীন করে তোলা হয়েছে। নানাভাবে জামাইকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে। জামাইয়ের উন্নাসিকতা, মিথ্যা অহংবোধ, অর্থহীন লজ্জা, আপাত নির্লোভের অন্তরালে তার—অন্তহীন লোভ—এইসব বিষয়ই প্রবাদগুলিতে স্থান পেয়েছে। এ এক বড় বিচিত্র মনস্তত্ত্ব। প্রত্যক্ষভাবে যাকে কিছু মুখ ফুটে বলা যায় না, অথচ ভেতরে ভেতরে তার সম্বন্ধে বিরূপতা থাকে, প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে সেই গোপন ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

খাওয়া-দাওয়ার গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

জামাইয়ের লোভ সম্পর্কে একটি প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে—

সাধলে জামাই খান না পিটে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে।

জামাইয়ের উন্নাসিকতা সম্পর্কিত প্রবাদটি হল—

পাঁচ ব্যন্নন দুধ রুটি, তবু জামাইয়ের ভিরকুটি।

জামাইকে আপাতদৃষ্টিতে যতই আপনার করে দেখা হোক, আসলে সে যে একান্তভাবে পর একাধিক প্রবাদেই তা বলা হয়েছে—

জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা।

একই বক্তব্য কিঞ্চিৎ ভিন্নতরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটিতে—

দুঃখের কথা কারে জানাই, মায়ের পুত নয়, শাশুড়ীর জামাই।

শেষে একটি প্রবাদে তো জামাইকে প্রহারের কথাও অবলীলাক্রমে বলা হয়েছে—

কিল কনুই মুষ্টি, তবে জামাইয়ের তুষ্টি।

এমনিতেই যেখানে জামাইয়ের এমন দুরবস্থা, সেখানে ঘরজামাইদের অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে, অন্ততঃপক্ষে প্রবাদের রাজ্যে, তা বোধকরি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘরজামাইকে প্রবাদে কুকুর, চাকর, পোড়ার মুখ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। ঘরজামাইরা যদি তাদের সম্পর্কে রচিত প্রবাদগুলি শোনেন বা পড়েন, তাহলে নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখিত হবেন। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ কেউ হয়তবা ঘরজামাইয়ের কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেতেও প্রয়াসী হবেন। অবশ্য কথা হল যে আত্মমর্যাদাবোধই যদি থাকবে, তাহলে আর ঘরজামাই হওয়া সম্ভব হয় কি করে? যাইহোক ঘরজামাই সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ঘরজামাই, তার পিতৃ-পরিচয় কিভাবে লোপ পায় সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ঘরজামাই আধা চাকর সর্ব্বলোকে বলে।
বাপ-দাদার নাম নাই ফলনীর জামাই বলে॥

ঘরজামাইয়ের বেঁচে থাকা না থাকা দুই-ই সমান। অন্ততঃ প্রবাদের বক্তব্য অনুযায়ী—

ঘরজামায়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।

ঘরজামাই স্বামীর জন্য পত্নীরও যথেষ্ট আত্মসম্মান বিঘ্নিত হয়। তাই ত বলা হয়েছে—

ঘরজামায়ের ভাতার যার, কানের সোনা নিন্দে তার।

দূরস্থিত জামাইয়ের সঙ্গে ঘরজামাইয়ের সম্মান লাভের ক্ষেত্রে পার্থক্যও একটি প্রবাদের বিষয় হয়েছে—

দূর-জামাইয়ের কাঁধে ছাতি, ঘর জামাইয়ের মুখে লাথি।

ঘরজামাইকে কুকুর বলা হয়েছে যে প্রবাদে, সেই প্রবাদটি হল—

পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোস্‌রা কুত্তা ঘর ঘর বুলে
তেসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই॥

কিভাবে ঘরজামাইকে আপ্যায়িত করা হয় তার বিচিত্র উদাহরণ পাওয়া যাবে এই প্রবাদটিতে—

যা ছিল আমানি পান্ত মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু॥

সমাজে চিকিৎসকের বৃত্তিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সবসময় সব চিকিৎসক পীড়িত মানুষের সেবায় আন্তরিক হন না, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা অর্থলোলুপতার পরিচয় দেন। রুগীর চিকিৎসায় বাঞ্ছিত মনোযোগ দেন না। তাই প্রবাদে চিকিৎসক সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয় নি। চিকিৎসকদের বৃত্তিকে কটাক্ষ করা হয়েছে এই বলে—

জল জোলাপ জোচ্চোরি, তিন নিয়ে ডাক্তারি।

ডাক্তার সম্পর্কে তবু যেটুকু বা নমনীয়তা প্রকাশিত হয়েছে, কবিরাজ সম্পর্কে সেটুকুও প্রকাশিত হয়নি। কবিরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কথা, কড়া, কারসাজি, তিন 'ক' তে কবিরাজি।

অপর একটি প্রবাদেও কবিরাজি সম্পর্কে সমাজের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজি।

তবে কবিরাজ সম্পর্কে চরম বিষোদ্গার ঘটেছে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটিতে—

লাথি চড়ে নাহি লাজ আমার নাম কবিরাজ।

চিকিৎসক-কবিরাজের পর সমাজের অন্য এক বৃত্তিভোগীদের প্রসঙ্গে আসা যাক। এঁরা হলেন উকিল। যে প্রবাদের রাজ্যে চিকিৎসক-কবিরাজদেরই এই রকম দুর্দশা, সেক্ষেত্রে উকিলদের সম্পর্কে প্রকাশিত মানসিকতা যে তাঁদের অনুকূলে যাবে না তা সহজেই অনুমেয়। প্রবাদে উকিলের সমাজ সেবার কথা বলা হয় নি, উল্লিখিত হয় নি তাঁদের মহান অবদানের কথা, বরং সম্ভবমত এঁদের এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—

বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে
উকিল পাঠাবে না, আপনি যাবে।

উকিলকে খুব তোয়াজে রাখতে হয়, নতুবা মক্কেলের ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা। তাইতো একটি প্রবাদে উকিল গাড়ীর চাকার সঙ্গে উপমিত হয়েছেন—

উকিল আর গাড়ীর চাকা, তেল চর্বি দিয়ে রাখা।

বিদ্যাদানকারী গুরু বা শিক্ষক সম্পর্কে কবিরাজ, ডাক্তার কিংবা উকিলের

তুলনায় অপেক্ষাকৃত নরম মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। একটি প্রবাদে কেবল এইটুকু বলা হয়েছে যে, গুরুকে প্রশ্ন করে, তাতিয়ে দিয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিতে হয়। অর্থাৎ এই ইঙ্গিত এক্ষেত্রে রয়ে গেছে যে গুরুমশাই স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে বলেন না—

গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়, মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়।

আমাদের সমাজে পার্থিব জগতের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য যেমন গুরুমশাই এবং শিক্ষকেরা আছেন, তেমনি অধ্যাত্ম জগতের ব্যাপারে জ্ঞানদানের জন্য আছেন মহারাজ, যোগী, মহাযোগী, ব্রহ্মচারী আখ্যায় ভূষিত গুরুর দল। সাধন মার্গের পথিক হতে গেলে এঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ নাকি অবশ্য স্বীকার্য। অথচ প্রবাদে এইসব তথাকথিত গুরুদেরও ছেড়ে কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে—

গুরু গরু আগুন—পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ।

অথচ যে কুসীদজীবী মহাজন সমাজে মানুষের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করে দরিদ্রকে দরিদ্রতর করে তোলে, তাদের প্রসঙ্গে কিন্তু আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হয় নি। বিস্ময়করভাবে তার পরিবর্তে বরং অনুকূল মানসিকতা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে—

মহাজন সাচ্চা রাজা গড়ে, এদের কখনো লক্ষ্মী না ছাড়ে।

এইবার সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কিত প্রবাদের আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

স্বর্ণকার বা সেকরা সম্পর্কে অত্যন্ত অবিশ্বাসী মনোভাব প্রকাশ করে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

যে সেকরা নিজের মায়ের কানের সোনা চুরি করতে পারে, সেই সেকরার পক্ষে খরিদ্দারদের গয়না থেকে সোনা আত্মসাৎ করা তাহলে যে খুবই স্বাভাবিক, এই ইঙ্গিত প্রবাদটির মধ্যে রয়ে গেছে। অবশ্য বিশ্বাসের ব্যাপারে যে কেবল সেকরার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে তা নয়। ধোপা-নাপিত-কুমোর-কামার এদের বিরুদ্ধেও প্রকাশিত হয়েছে সমান অনাস্থা এবং অবিশ্বাস। একটি প্রবাদে তো স্পষ্টতই ঘোষিত হয়েছে—

ধোপা নাপিত কুমোর কামার
যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার।

প্রবাদের রাজ্যে, ছেড়ে কথা কাউকেই বলা হয় নি। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই তীব্র সমালোচনা এবং কটাক্ষের সম্মুখীন হয়েছে। কেবল সমালোচনার মাত্রায় কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ পার্থক্য ঘটেছে মাত্র। আর এর জন্যেই একের সমালোচনায় অন্যের উৎফুল্ল হবার কোন অবকাশ থাকে নি।

ধোপা সম্বন্ধে একটি প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে যে, যতই চেষ্টা করা যাক তবু ধোপার গুণগত কোন পরিবর্তন ঘটান অসম্ভব। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে সে অবিচল থাকবেই—

গোবরে-পোকা গোবর খোঁজে, বেঙ খোঁজে ডোবা।
সিংহাসনে বসালেও রাজা হয় না ধোবা॥

শুধুই কি তাই, ধোপা যে কাণ্ডজ্ঞান রহিত বিবেচনাবোধ-রহিত, সে কথাও গোপন রাখা হয় নি—

বামুন মুচ্ছুদ্দি ধোপা গোমস্তা, এদের নেই বুঝ্-ব্যবস্থা।

নিজের হাতে কাপড় কাচলে কাপড় টেঁকে বেশি, কিন্তু ধোপার বাড়ী কাপড় কাচতে দিলে কাপড়ের পরমায়ু বেশি দিন থাকে না। কারণ ধোপা জোরে আছাড় দিয়ে কাপড় কাচে। তার নিজের কাপড় নয় বলে কাপড়ের প্রতি তার মমত্ববোধ স্বভাবতঃই কম হয়ে থাকে। একটি প্রবাদে এই বিষয়েও বলতে দেখা গেছে—

যার ফাটে তার ফাটে ধোপার তাতে কি।

অথচ ধোপা নিজের কাপড় কাচে সন্তর্পণে যাতে সহজে না ছেঁড়ে—

ধোপার ফাটে না, ফুটে।

অবশ্য তার নিজের কাপড় খুবই কম, অধিকাংশ সময়ে সে অপরের কাপড়ই পরিধান করে থাকে—

ধোপা পরের কাপড়ে শোভা।

গয়লা আর জলমিশ্রিত দুধ যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গেছে। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

গাই গয়লায় ভাব থাকলে
এক হাঁটু জলেও আধসের দুধ।

প্রবাদে গয়লাকে নির্বোধরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। একাধিক প্রবাদেই গয়লার নির্বুদ্ধিতা স্থান পেয়েছে—

গয়লা আশী বছরেও সাবালক হয় না।

কিংবা,—গয়লাতে গাড়া খোঁড় পাড়ার মারতে গাই।
সেই গাড়াতে পড়ে মরে গয়লার সাত ভাই।

হতভাগ্য মজুরদের সমালোচনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। বরং মজুরের দুর্ভাগ্যকেই প্রকাশ করা হয়েছে প্রবাদে—

মজুরের কপালে খেঁজুরের চেটাই।

মজুরদের প্রতি সমাজের অবাঞ্ছিত আচরণও একটি প্রবাদে প্রতিফলিত হয়েছে—

মজুরকে লাথি, হুজুরকে সেলাম।

সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে চাষাদের প্রতিও। পরিহাস মিশ্রিত সহানুভূতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় প্রবাদে, যখন বলা হয়—

চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ, আর সকল মাস সুখ।

চাকুরীজীবী যারা তাদের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। চাকুরী মানেই অপরের দাসত্ব। তাই প্রবাদে চাকুরেদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কুকুরের ওজর আছে ত চাকুরের ওজর নেই।

অন্য একটি প্রবাদে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে—

চাকুরে কুকুরে সমান।

ঘরামি অপরের জীর্ণ ঘরের সংস্কার করে, কিন্তু অর্থাভাবে নিজের ঘর সংস্কার করতে পারে না। কারণ যে সময়ে নিজের ঘর সংস্কার করবে সেই সময়ে অন্যের কাজ করলে তবু কিছু অর্থ জুটবে। আগে তো খাওয়া, পরে থাকার ব্যবস্থা। তাই—

ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর।

শিঙ বিশিষ্ট জন্তুকে বিশ্বাস করতে নেই, তেমনি বিশ্বাস করতে নেই মাতালকে। কেননা উন্মত্ত অবস্থায় মাতালের পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব। এই সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে প্রবাদে—

মাতাল দাঁতাল শিঙে, বিশ্বাস নেই এই তিনে।

আমাদের সমাজে এখনও বিবাহের ব্যাপারে ঘটকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাত্রপক্ষ এবং কন্যা পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল ঘটকের কাজ। বলাবাহুল্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিবাহের ব্যাপারে। তাই ঘটককে হতে হয় অত্যন্ত চতুর। নতুবা শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা-শোনা আর বিবাহ পর্যন্ত গড়ায় না। প্রবাদেও ঘটককে চতুর বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে—

সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।

গোঁসাইদের প্রবাদে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বলে বলা হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে তাঁরা মর্যাদাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এই মর্যাদা-বোধ তাদের অকলল্পনীয় ক্ষতিসাধনও করে—

গোঁসাই ঠাকুর মরে, মান রক্ষার তরে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এদের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত কথাও উচ্চারিত হয়েছে। যে গোঁসাই নিজেদের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে করে, তারাই আবার সুযোগ পেলে চৌর্যবৃত্তির ন্যায় গর্হিত অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হন। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

গোঁসাই দণ্ডবৎ, গরুচুরি করলে পরে দক্ষিণমুখী পথ!

অর্থাৎ গরুচুরির দায়ে ধরা পড়লে গোঁসাইকে দক্ষিণাধিপতি যমের বাড়ী পাঠান হবে বলে শাসান হয়েছে।

অপর একটি প্রবাদে গোঁসাইয়ের নির্মমতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে—

গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভাল।

প্রবাদের রাজ্যে মোল্লারাও স্থান পেয়েছেন, তবে স্থান পেলেও সমালোচনার হাত থেকে তাঁরাও রেহাই পান নি—

কলিকালের মুন্সী মোল্লা নামে হবে দড়।
না মানবে কোরাণ-কেতাব, হুজ্জৎ করবে বড়॥

মোল্লার দৌড় যে সীমিত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ একটি প্রবাদে তাও উল্লিখিত হয়েছে—

মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্।

আমাদের দেশে জলপথ নেহাৎ কম নয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজকের দিনেও জলপথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর জলপথে যাতায়াতের ব্যাপারে যার ওপর সর্বাধিক নির্ভরতা, সে হল মাঝি। মাঝিও তাই প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে সঙ্গত কারণেই। তবে প্রবাদে মাঝিকে কোন বিরূপ সমালোচনা করা হয় নি। কেবল উল্লেখ করা হয়েছে নৌকা চালনার জন্যে যে অপরিমেয় দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, তা মাঝি ভাত খেলেই অর্জন করে।

মাঝি ভাত খেলে গাঙে জোয়ার।

সমাজ সেবায় অনেকেরই অবদান, এদের মধ্যে অন্যতম হল মুচি। মুচির কাজ

চামড়া নিয়ে। আর চামড়া যেহেতু দুর্গন্ধ যুক্ত, তাই মুচিকে এ ব্যাপারে সহিষ্ণু হতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রবাদের বক্তব্য হল—

মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান।

ফকির সূক্ষ্ম বিচারে সামাজিক নয়, কারণ সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে না। সে গৃহত্যাগী। তবু সমাজেই সে বাস করে। আর তার ভরণ-পোষণের ভার বহন করে থাকে সমাজ। এই অর্থে ফকিরও সামাজিক। যদিও তাকে কোন প্রকার সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয় না। এহেন ফকিরদের নিয়েও বেশ কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে। একটি প্রবাদে ফকিরের সহজ আনন্দময় জীবনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ফকির সকল প্রকার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত। ঈশ্বর নির্ভরতাই অবশ্য এর কারণ—

সকালে খেয়ে ফকির নাচে, বিকালের তরে খোদা আছে।

ফকিরে-ফকিরে বেশ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। আর ফকিরদের যেহেতু নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান থাকে না, জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির ওপরই নির্ভর করতে হয়, তাই তাদের যাতায়াতও সর্বত্র—

ফকিরে ফকিরে ভাই, ফকিরের রাজ্য সব ঠাঁই।

কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণের জন্যে একমাত্র অবলম্বন ছুতোর। কিন্তু এদের স্বভাব হল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও দায়িত্ব পালনে সেই নিষ্ঠার পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না। হয়ত বা একজনের কাঠ নিয়ে অন্যের জিনিস তৈরী করে বসে। কিংবা আগের কাজ না করে অধিক পয়সার জন্যে পরের কাজ আগে সম্পাদন করে। তাই তো তাদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ছুতোর বাড়ি দিলে কাঠ, আন্‌তে আন্‌তে জান ফাট।

আগের দিনে ছিল কাজীর বিচার। কাজীরা কখনো যুক্তি নির্ভর কাজ করত না। অধিকাংশ সময়ই তারা স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা চালিত হয়ে বিচার কার্য সমাধা করতো। ইচ্ছামত অমানুষিক শাস্তি দিত, কিংবা একের দোষে শাস্তি ভোগ করত অন্যজনে। তাই প্রবাদে কাজীকে পাজি বলা হয়েছে—

কাজী হল গাজী পাজী হয় কাজী।

অন্য একটি প্রবাদে কাজীকে অকাজেই দড় বলে ভৎর্সনা করা হয়েছে—

কাজের নামে নেই কাজী, অকাজ পেলেই রাজি।

বার্ণাড শ 'Arms and the Man' নাটকে সিপাইদের যে চিত্র এঁকেছেন

সিপাই সম্পর্কিত প্রবাদেও যেন সেই বক্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে যদিও সিপাইদের অসাধারণ বীর ও যোদ্ধা বলে মনে করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের জীবন বাঁচাতেই যে ব্যস্ত থাকে এবং লড়াইয়ের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করে যুদ্ধাবসানে আত্মপ্রকাশ করে নিজেদের বীর্যবত্তা জাহির করতে সচেষ্ট হয়—প্রবাদে তারই সমালোচনা করা হয়েছে—

লড়াইয়ের পর সবাই বীর, লড়াইয়ের পর সেপাই হাজির।

সমাজ সেবায় অংশ গ্রহণ না করলেও কাঙ্গালীও সমাজেরই অংশ। সহায়সম্বল-হীন, নিঃস্ব, রিক্ত কাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনের কথাই বড় হয়ে উঠেছে প্রবাদগুলিতে। হতভাগ্যরা সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য কি তা জানে না। দুঃখই তাদের জীবনের ভূষণ। আর সেইজন্যেই অন্যের কাছে যা পীড়াদায়ক, কাঙ্গালীর কাছে তাই স্বাভাবিক, হয়ত বা সৌভাগ্যের সূচক!

কাঙাল গরীব গায়ে লাগে না,
ভাঙা খড়ম পায়ে লাগে না।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।

অনুরূপ আর একটি প্রবাদের বক্তব্য বল—

কাঙালের রাঙই সোনা,
মাচা বেঁধে শোয় বালাখানা।

চোরকে নিশ্চয়ই সামাজিক মানুষের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ তার জীবিকা হল চরম অসামাজিক। কিন্তু যেহেতু সে সমাজেই বসবাস করে আর সামাজিক মানুষই তার আয়ের উৎস, তাই আলোচ্য প্রবন্ধে তাদের কথাও আলোচিত হতে পারে। চোর যতই ঘৃণ্য হোক, তবু তাদের নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবাদ রচিত হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে সাধুসঙ্গেও চোরের স্বভাব পরিবর্তিত হয় না—

চোর যদি যায় সাধুর কাছে, স্বভাব যায় তার পাছে পাছে।

যতই চোরকে সৎকথা, ধর্মকথা শোনান হোক, চোর কিন্তু তাতে কোনই আকর্ষণ বোধ করে না—

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

সকলের চোখ এড়িয়ে চোরকে যাতায়াত করতে হয়, নইলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

সেইজন্যে সাধারণ মানুষের চলাচলের পথ চোর সচরাচর পরিহার করে চলে—

চোর শূকরের একই পথ।

গভীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় রাত চোরের চুরির পক্ষে প্রশস্ত। তাই—

চোর খোঁজে আঁধার রাত।

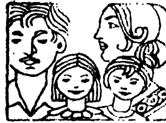
চোর নিজেও জানে যে, তার কাজ মোটেই সঙ্গত নয়। তাই নিজের কৃত পাপ-কর্ম স্খালনের জন্যে চোর আবার দেবস্থানেও যায়—

চোর, ছিনাল, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলার মাড়।

এইভাবে সমাজে বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রবাদ। যে মানুষ আমাদের অতি পরিচিত, যাদের দোষ-গুণ, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, যাদের সম্পর্কে আমাদের রয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অথচ যাদের সম্পর্কে অনেক সময়েই আমরা সোচ্চার কণ্ঠে কিছু বলে উঠতে পারি না, প্রবাদে সেই সকল মানুষের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। প্রবাদে সামাজিক মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই বড় করে দেখান হয়েছে সত্যি, তবু তার মানে এই নয় যে সব মানুষই খারাপ। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আছে ভাল-মন্দ। প্রবাদে মানুষের মহত্ত্ব তথা মানবিকতাকে প্রকাশ করা হয় নি। আসলে সমালোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে বাঞ্ছিত ও আদর্শ লোকে উত্তীর্ণ করতে চাওয়া হয়েছে। তাই প্রবাদের বিবরণ অনুযায়ী আমরা যদি বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষকে দেখি, তাহলে চরম মূঢ়তারই পরিচয় দেওয়া হবে।

বাংলা প্রবাদে পারিবারিক চরিত্র

বাংলা প্রবাদের রাজ্যকে চরিত্রের চিত্রশালা বললে বোধকরি খুব একটা অতিশয়োক্তি হয় না। বস্তুত কত ধরণের চরিত্রেরই না সেখানে সমাবেশ। এদের মধ্যে আছে পৌরাণিক চরিত্র, আছে ঐতিহাসিক চরিত্র। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক চরিত্র তো আছেই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা প্রবাদে যে সব পারিবারিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি নিয়েই বিশেষ ভাবে আলোচনায় প্রয়াসী হব। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা একান্নবর্তী পরিবার জীবন যাপনে ছিলাম অভ্যস্ত, কিন্তু সেই পরিবার জীবন আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলা প্রবাদে আমরা যে সব পারিবারিক চরিত্রের সন্ধান পাই, বলাবাহুল্য, সেগুলি একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা যখন অটুট ছিল তখনকার। আজ যখন একান্নবর্তী পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়, তখনও এইসব চরিত্র আমাদের কাছে সুপরিচিত, তবে স্বভাবতঃই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে এই যা।



বাংলা প্রবাদে উল্লিখিত পারিবারিক চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই যে চরিত্রটির কথা বলতে হয়, সেটি হল মায়ের চরিত্র। বাংলা ছড়ায় যেমন মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়েছে, বাংলা প্রবাদেও সেই একই মানসিকতা মা সম্পর্কে। বলা হয়েছে—

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন।

কিন্তু মা যে বড় ধন তার কারণ কি? নিছক ভাবালুতা কিংবা অতিশয়োক্তি কি এরূপ মন্তব্যের পেছনে কাজ করেছে? না, জগতের আশ্চর্য সৃষ্টি হ'ল মাতৃস্নেহ। এমন স্বার্থশূন্য আন্তরিক স্নেহ, মায়া, মমতা, আর কারো কাছে

প্রত্যাশা করা যায় না। মা হলেন সন্তানগত প্রাণা। এমন কি সন্তান যদি অবাধ্য কিংবা মাতৃভক্তিশূন্য হয় তবুও। সেই পরিচিত গানের কলিটি স্মরণীয়—'কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখন নয়'। তাইতো একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মায়ের হাড় যদি মাটিতে থাকে পোঁতা।
মাটি থেকে বলে—বাছা আমার কোথা।

অতএব যে হতভাগ্য ব্যক্তি মাতৃহীন, তার দুর্ভাগ্য কল্পনাতীত। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ থেকেই সে বঞ্চিত—

অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা।
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্ন ছা॥

সংসারে অনেকেই আমাদের প্রতি মায়া দেখিয়ে থাকে, কিন্তু অনেক সময়েই তা কপটমায়া। এদিক দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যায় যার ওপর, তিনি আর কেউ নন, জননী। জননী কোন কপটতা জানেন না। আর সেই জন্যেই ত বলা হয়েছে—

অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।

একটি প্রবাদে আবার জননীকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—মা হওয়া কি মুখের কথা, শুধু বিয়লেই হয় না মাতা॥ অনুরূপ ভাবে, বাপ হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না পিতা॥ অর্থাৎ সন্তানের প্রতি উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের মধ্যেই জনক-জননীর প্রকৃত পরিচয় নিহিত থাকে। সন্তান কি রকম হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে জনক-জননীর মানুষ করার ওপর। বিশেষত মা'র প্রভাব সন্তানের ওপর সর্বাধিক কার্যকরী। তাই যখন বলা হয়—

মা গুণে পোয়া, ভূঁই-গুণে রোয়া।

—তখন তা যে কত বড় সত্য, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পুত্র এবং কন্যার মধ্যে আবার পুত্রের ওপর প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হয় পিতার, বিপরীতক্রমে কন্যার ওপর মায়ের প্রভাব কার্যকরী হয় অধিকতর।

মা-গুণে ঝি, বাপ-গুণে পো।

সন্তানের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়স্থল কোনটি—এই প্রশ্নের উত্তর একটিই এবং তা সর্বজনস্বীকৃত। মাতৃক্রোড় সন্তানের কাছে সর্বাধিক আরামপ্রদ। একটি প্রবাদেও স্পষ্টই বলা হয়েছে সন্তান মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় পেলে তার আয়ু বৃদ্ধি পায়—

মায়ের কোলে আয়ু বর্তায়।

অনেক সময় জননী সন্তানের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। ক্ষুব্ধ হয়ে চড়-চাপড়টিও হয়ত মেরে বসেন। কিন্তু বাহ্যত তা যতই নির্মম আঘাতকারী বলে প্রতিভাত হোক, আসলে তার আঘাত সন্তানের লাগে না। কারণ সন্তানের আঘাত শতগুণ হয়ে যে মায়ের কাছেই ফিরে আসে।

মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না।

মাতৃস্থানীয়া অনেকেই আছেন, তবু মা এক এবং অদ্বিতীয় মহিমায় অধিষ্ঠিতা। তাঁর সঙ্গে আর কারোর কোন তুলনাই চলে না।

চিঁড়ে বল মুড়ি বল, ভাতের বাড়া নয়।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নয়॥

অনেকেই হয়ত আমাদের কাছে মা অপেক্ষা অধিকতর দরদ দেখিয়ে আপনজন বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু প্রবাদে এদের সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এই বলে—

মায়ের চেয়ে দরদ বেশি, তারে বলি ডান।

যে মা নাকি সন্তানগতপ্রাণা, বিবাহের পর অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের কাছে সেই মা হয়ে যান পর, আর আপন হয়ে দেখা দেয় পত্নী। প্রবাদে এইসব অকৃতজ্ঞ সন্তানদের ক্ষমা করা হয়নি। মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ সন্তানকে তীব্র ভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার।
মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার॥

অন্য একটি প্রবাদেও প্রায়ই একইরূপ বক্তব্য প্রকাশিত হতে দেখা গেছে—

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।

অথবা, মা মরেন দোষ নাই বউ বাঁচলে বাঁচি।

সব সময় স্ত্রীর জন্যে যে পুত্র জননীর প্রতি কর্তব্য পালনে বিচ্যুত হয় তা নয়, নিজের স্বভাবদোষে এবং স্বার্থপরতাবশতও জননীর প্রতি কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে বিরত থাকতে দেখা যায় সন্তানকে—

মা বেচে খায় কলমি শাক, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ।

অন্য একটি প্রবাদেও একই রূপ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—

মায়ের পরনে টেনা নেই, ছেলের বাঁকা টেরি।

না, প্রবাদে কেবল পুত্র-সন্তানকেই আক্রমণ করা হয় নি, কন্যাও আক্রমণের

লক্ষ্য হয়েছে—

মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে।

জননী চরিত্রের পর অবিসংবাদিত ভাবে যে চরিত্রটির কথা মনে আসে সেটি হ'ল পিতার চরিত্র। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হ'ল বাংলা প্রবাদে জননীকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে তুলনায় পিতাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দুটি একটি প্রবাদের মধ্যেই পিতা সীমাবদ্ধ থেকেছেন। তাও আবার পৃথক কোন প্রবাদের বিষয়রূপে পিতাকে উপস্থিত করা হয়নি, মাতার সঙ্গেই পিতাও উল্লিখিত হয়েছেন মাত্র।

বেশ কয়েকটি প্রবাদেই মাসী ও পিসি স্থান পেয়েছেন। কিন্তু প্রবাদে মাসী পিসিকে তেমন শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়নি, বরং নানাভাবে তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করা হয়েছে। যেমন একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

মাসীর গোঁফ থাকলে মামা হ'ত।

স্পষ্টতঃই এক্ষেত্রে মাসীর পুরুষালি ভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে বোঝা যায়। আর একটি প্রবাদে মাসীর একচোখামিকে সমালোচনা করা হয়েছে—

একচোখে মাসী, কারে ভালবাসি।

একটি প্রবাদে মাসীমার আদর দেখেও ক্রোধান্বিত হবার কথা ব্যক্ত হয়েছে—

মাসীমার আদরে সই অঙ্গ বিদরে।

অন্য একটি প্রবাদে মাসীমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে তিনি কখনও কিছু দেন না—

মাসী পিসি, টাট্‌কা বাসি, বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসী বলে নাক—খই নাড়ুটা ধর॥

অথচ মাসী-পিসির কাছে আমাদের প্রত্যাশাই প্রধান—

দিলে থুলেই পিসী মাসী, না দিলেই সর্ব্বনাশী।

মাসী কিরকম চতুর, সেই সম্পর্কে পরিহাস করা হয়েছে একটি প্রবাদে এই বলে—

মাসী বড় রসালা
জন পাঁচ ছয় কুটুম দেখে খুদে জল ঢালালা।

একটি প্রবাদে মাসীও আবার বোনপোকে আচ্ছামত ঠুকে দিয়েছেন। দুঃখের সময়টুকু মাসীর ছত্রচ্ছায়ায় কাটিয়ে যেই নিজের দুঃসময়টুকু অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন মাসীমাকে ত্যাগ করে অনায়াসে বোনপো পাড়ি জমাল। শুধু

পাড়ি জমানোই নয়, যাবার প্রাক্কালে মাসীকে দোষারোপ করে তার চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয়টুকুও রেখে গেল—

অকাল গেল, সুকাল এল, খেলে কাঁঠালের কোষ।
এখন কি বলে পালাবে বোন্‌পো, দিয়ে মাসীর দোষ ॥

প্রবাদে মাসীই আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন অধিকতর, তুলনায় পিসির প্রতি আক্রমণের পরিমাণ অনেক কম। একটি প্রবাদে এরূপ মানসিকতার কারণ-টুকু সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—

বাপের বোন পিসী ভাত-কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসী কাদায় ফেলে ঠাসি ॥

প্রবাদে মাকে যতখানি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সে তুলনায় মা'র বোন মাসীর প্রতি চরম অবহেলা আর অবজ্ঞাই প্রকাশিত হয়েছে। এ এক বড় কৌতূহলের বিষয়। সংসারের কর্তৃত্ব পিতার হাতেই থাকে। সেই কারণেই সম্ভবত পিতাকে খুশী করতে যদিবা পিসির প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, সে তুলনায় মাসীর প্রতি এতটুকু নমনীয়তা প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি।

মাসী ও পিসির পর দেখা যাক মামা এবং জ্যাঠা ও কাকাদের সম্পর্কে প্রবাদে কি ধরণের মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কি মায়ের ও বাবার বোন সম্পর্কিত মানসিকতারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, বিশেষ করে মায়ের ভাইদের সম্পর্কে?

আশ্চর্যের বিষয় প্রবাদে মামা সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। মামার ভালবাসাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে একটি প্রবাদে এইভাবে—

মামার বড় ভালবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা।

মামা কতখানি আপনজন, না ধানের মধ্যে খামা যেরকম সেই রকম—

ধানের মধ্যে খামা, ইষ্টির মধ্যে মামা।

মামা কোন কাজের নয়, তার বাক্ চাতুরীই সার। মামার এই অন্তঃসারশূন্যতাই রূপ পেয়েছে এইভাবে—

ফুটানির মামা, ভিতরে ককানি, উপরে জামা।

মামা-মামী ঝগড়া করলে তার ফল ভোগ করতে হয় ভাগ্নে-ভাগ্নীকে অন্যভাবে—

মামা মামী ঝগড়া করে নেকা পান্তা খেয়ে মরে।

হয়ত বা এক্ষেত্রে মামা-মামীর ঝগড়াটাই কৃত্রিম। একটি প্রবাদে মামা-ভাগনে

একত্রিত হলে কি হয় সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

মামা ভাগনে যেখানে, আপন নেই সেখানে।

সংসারে অশান্তি স্থষ্টির মূলে অনেক সময় মামার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, বোনের সংসারে থেকে বোনকে নানা কুপরামর্শ দিয়ে ভগ্নীপতির সংসারের শ্রী-শান্তি নষ্ট করার দায়ে অভিযুক্ত করে তাই বলা হয়েছে—

মামা শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারেখারে।

অন্য একটি প্রবাদেও মামার সম্পর্কে তীব্র বিষোদগার করা হয়েছে—

মামা বাপের জবানীতে শালা।

তবু এ হেন মামার হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশিত হয়নি কিন্তু প্রবাদে। বরং একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

এক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে অবশ্য বলতে চাওয়া হয়েছে যে শূন্যতার তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ ভাল, মন্দের ভাল আর কি!

মাসীর তুলনায় পিসির স্থান যেমন প্রবাদে অত্যন্ত সীমিত, অনুরূপভাবে মামার তুলনায় কাকার স্থানও মুষ্টিমেয় প্রবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটি প্রবাদে বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে বয়স্ক পাত্রের বিবাহের জন্যে মা-বাবার সঙ্গে তার খুল্লতাতকেও সমান ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সৎপাত্রে বিবাহদানের ব্যাপারে কেবল কন্যার মা-বাবার দায়িত্ব নয়, সেই সঙ্গে দায়িত্ব তার খুল্লতাতেরও—

চোখ থাক্ তোর মা—বাপ, চোখ থাক্ তোর খুড়ো।
এমন বরে বে দিয়েছেন তামাক খেকো বুড়ো॥

পরিবারে যতসব অবাঞ্ছিত কার্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, অনেক ক্ষেত্রেই সেইসব কার্যের নায়ক হতে হয় খুড়োকে—

গো বধের সময় খুড়ো কর্তা।

একটি প্রবাদে কাকা এবং ভাইপোকে নিয়ে বেশ সুন্দর পরিহাস করা হয়েছে। চোরের সঙ্গে লাঠি থাকলে তারা যেখানে সংখ্যায় দু'জন হয়, সেক্ষেত্রে খুড়ো ভাইপো একত্রে সংখ্যার দিক দিয়ে একের অধিক হতে পারেনি—

কাকা আর আমি একা,
চোর আর লাঠি দুজন।

অপর একটি প্রবাদে কাকাকে 'ইষ্টি কুটুম্বে'র মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছে—

ইষ্টি কুটুম কাকা, সকল কুটুম টাকা।

আর একটি প্রবাদেও কাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তবে কাকার নিজস্বতা কিছু প্রকাশিত হয়নি বেশ বোঝা যায়। ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা লাভের আশায় নিজেকে কাকা বলে পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছিল, কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন বিক্রেতা তা সত্ত্বেও কোন প্রকার সুবিধাদানে সম্মত হয়নি—

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচকড়া।

প্রবাদে খুড়ী বা জেঠীও স্থান পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রতি তেমন সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশিত হয়নি।

মা নেই যার জেঠী খুড়ী, ভাত নেই যার চিঁড়ে মুড়ি।

এ পর্যন্ত মা-বাবা, ভাই-বোন কিভাবে প্রবাদে উপস্থাপিত হয়েছেন দেখা গেল। এইবার দেখা যাক নিজেদের ভাই-বোন প্রবাদে কিভাবে চিত্রিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

বস্তুতঃ ছোট ভাই-বোনেরা দাদার ওপরে যে কতখানি নির্ভরশীল, কতখানি তাদের আস্থা তার বড় সুন্দর পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলি প্রবাদেই। যেমন একটি প্রবাদে দাদার অন্ধত্বের জন্যে ছোট ভাই বা বোনও দৃষ্টিশক্তি রহিত বলে উল্লিখিত হয়েছে—

দাদা কানা, তাই আমি চোখে দেখি না।

দাদার উপস্থিতিতে বাড়ী যেন আনন্দে মাতোয়ারা, বিপরীতক্রমে দাদার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর আকর্ষণ বহুলাংশে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়—

দাদা থাকলে রাজবাড়ী, দাদা না থাকলে শুধু বাড়ী।

অপর একটি প্রবাদে দাদার প্রতি বিশ্বস্ততা কতখানি গভীর, তার প্রমাণ প্রকাশিত—

দাদা বলেছে চণ্ডী, দুর্গা বলব কেন।

দাদার প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত। তাইত দাদা কোন কাজের নির্দেশ করলে তা বিনা প্রশ্নেই অনুষ্ঠিত হয়—

দাদা বলেছে চষতে তাই চষতেই আছি।

অপর একটি প্রবাদেও দেখি সেই একই আনুগত্যের প্রকাশ—

দাদা বলেছে বারা ভান, ভানছি তাই ওদা ধান।

কার্য-কারণ সম্পর্কে অবহিত থাকা দাদারই কর্তব্য, আর তাই তার পরিণামের জন্যেও মূলত দায়ী। তবু একটি প্রবাদে পরিণামের দায়িত্ব অনুজের ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ায় খেদোক্তি করে বলা হয়েছে—

আমি জানিনা, দাদায় জানে, তবু শালারা বেঁধে আনে।

দাদার সম্মান কতখানি, তার ইঙ্গিত সামান্য ব্যাপারেও ধরা পড়ে যায়।

বড় সম্বন্ধে দাদা, তায় নালতে শাকে আদা।

একটি প্রবাদে বাস্তুচ্যুৎ আশ্রয়হীন ব্যক্তির শেষবেশ দাদার শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে—

আপন ভাগ্যে নাই ঠাঁই, দাদার শ্বশুরবাড়ী যাই।

যে দাদার প্রতি অনুজদের এতখানি শ্রদ্ধার মনোভাব, সেই দাদা যদি অনুজকে বিস্মৃত হয়ে যান, তাহলে তা যে কতখানি অভিমানের ব্যাপার হয় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অভিমান ক্ষোভে রূপান্তরিত হয় না, এটাই লক্ষ্য করার—

আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই।

একটি প্রবাদে দাদার সঙ্গে বউদিরও প্রশংসা (?) করা হয়েছে সমান ভাবে—

যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি।

দাদা যদি পেয়াদা হন, তবে এই কারণে তাঁর স্ত্রী বোধকরি সঙ্গত কারণেই কিছুটা অহঙ্কার করতে পারেন। কথায় বলে, 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'। কিন্তু না, প্রবাদে এ হেন স্ত্রীর অহঙ্কারকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। বরং মৃদুভাবে কিছুটা সমালোচনাই করা হয়েছে—

দাদা করেছে পেয়াদাগিরি, সেই গ্যাদারে বউ গ্যাদারী।

দাদা দারোগা হলে, ফৌজদারী ব্যাপার স্যাপার গুলো সহজেই ঘরোয়া ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। তাইতেই বলা হয়েছে—

দাদা হয়েছে দারোগা, ফৌজদারি ত ঘরেই।

দাদা যদি হন পিতৃ সমান, তাহলে দিদি বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীও যে মায়ের সমান একথা আমরা অনায়াসেই বলতে পারি। প্রবাদে দাদাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, দিদিকে কিন্তু সে তুলনায় প্রায় কোনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি স্বীকার করতে হয়। একটি প্রবাদে কেবল বলা হয়েছে—

ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ, দাদার কড়ি দিদিকে দিস।

আর একটি প্রবাদে ছোট বোন দিদিকে জলাশয়ে যাবার জন্যে বললে দিদি

তাতে অসম্মতি জানিয়েছেন। অসম্মতির কারণ ব্যক্ত করে দিদি বলেছেন তাহলে ছোট বোন তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেবে—

দিদি লো দিদি, জলকে যাবি।
না বোন্, তুই ডুবিয়ে দিবি॥

অবশ্য এর থেকে ছোট বোনের সঙ্গে বড়ো বোনের সম্পর্ক কিংবা পারস্পরিক বিশ্বাস সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করাটা মোটেই সমীচীন হবে না বলা চলে। ছোট বোনের সঙ্গে বড়ো বোনের সম্পর্কও কি একই রূপ? সমাজ-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কি বলেন?

তবে বোনের টান ভাইয়ের প্রতি যতখানি গভীর এবং অকৃত্রিম, অনেক ক্ষেত্রে বোনের প্রতি ভাইয়ের টান যে ততখানি আন্তরিক নয় সে বিষয়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।

সহোদর ভাইয়ের প্রতি টানটা কতখানি গভীর এবং আন্তরিক, তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় একটি প্রবাদে—

মার পেটের ভাই,
কোথা গেলে পাই।

কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্কটা বড় বিচিত্র। এক ভাইয়ের উন্নতিতে যেমন অপর ভাই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, তেমনি এক ভাইয়ের শোচনীয় অবস্থাতেও অপর ভাই আবার নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারে না,

ভাইয়ের ভাই খাইতেও দেখতে পারে না,
আবার মরতেও দেখতে পারে না।

নিজেদের ভাই-বোনের প্রসঙ্গের পর স্বামী-স্ত্রীর ভাই-বোন বা ভাসুর, দেওর, ননদ, শালা-শালী আমাদের প্রবাদে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেখা যেতে পারে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে ভাসুর-ভাদ্দর বউ-এর সম্পর্কটা বড় বিচিত্র। ইদানীং এই সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও প্রাচীন পন্থী যারা তারা পূর্বের সম্পর্ককেই বজায় রেখে চলেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী

স্বামীর বড় ভাইয়ের নাম মুখে আনে না, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে বাক্যালাপ করে না, আর অঙ্গ স্পর্শ, নৈব নৈব চ। একটি প্রবাদে এক বউ তার ছেলেকে অপর ছেলে মেরে যাবার পর প্রহারকারী ছেলেটির. মাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে গৃহে ভাসুরের উপস্থিতির জন্যে-সে তেমন কোন প্রতিশোধ নিতে পারলে না, নইলে তার ছেলেকে মারা সুদে-আসলে উশুল করে নিত—

কি বলব ভাসুর ঘরে,
নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে।

আর একটি প্রবাদে ছোট ভাইয়ের স্ত্রী বট্ ঠাকুরের পাতে ডাল ভাতে দেওয়া হয়নি আক্ষেপ করে প্রকারান্তে বড় ভাসুরের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছে—

এত ডাল দিয়েছ ভাতে,
তবু নেই বট্ঠাকুরের পাতে।

অপর একটি প্রবাদে অবলীলাক্রমে ভাসুরকে 'বোকা' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে সান্ত্বনা এইটুকুই যে বক্তা নিজেকেও বোকা বলে স্বীকারোক্তি করেছে—

এক বোকা কেতো কামার, এক বোকা ভাসুর আমার,
আর এক বোকা তুই।
পথ না দেখে কাঁটা দেয় আর এক বোকা মুই॥

এখানে বোকার তালিকার বহর দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে অভিহিত-কারিণীর স্বামীটিও এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। এবং তার স্থান সম্ভবতঃ তালিকায় তৃতীয়। কারণ স্বামীর নাম স্ত্রী ধরেনা। তাই কেতো কামার কখনই স্বামী নয়। বয়সের দিক দিয়ে এবং মর্যাদার দিক দিয়েও বটে ভাসুরের পরেই সম্ভবতঃ স্বামী বেচারীর স্থান। সবশেষে তালিকা রচয়িত্রীর স্থান। যে পরিবারে ভাসুর-ভাদ্দর বউ উভয়েই বোকার তালিকা ভুক্ত, সে পরিবারের ভাদ্দর বউয়ের স্বামীটির বোকা হওয়াই স্বাভাবিক। অপর একটি প্রবাদে ভাসুরকে 'নিষ্কর্মা' বিশেষণে বিশেষিত করা হলেও সেইসঙ্গে তাঁর মিষ্ট ভাষণেরও সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে—

নিষ্কর্মা ভাসুরের বচন মিঠা, নিত্যই বসে খান চিতল পিঠা।

এবার ভাসুরের প্রতি ভাদ্দর বউয়ের কর্তব্যবোধের(?) একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

ভাসুরে মেগেছে ভাত, সে তত্ত্বে আছি।
সকাল বেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যাবেলায় বাছি॥

ভাশুরের সঙ্গে ভাদ্দর বউয়ের যে সম্পর্ক, তার বিপরীত চিত্র পাওয়া যাবে দেওরের সঙ্গে বউদির সম্পর্কে। দেওর স্বামীর ছোট ভাই, তাই তাকে বউদি নিজের ভাই বা বন্ধুর চোখে দেখে থাকে। উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি হ'ল বড় মধুর, ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক।

একটি প্রবাদে স্বামী খর্বাকৃতি হওয়ায় তাকে দেওর বলে মনে হওয়ার কথা বলা হয়েছে—

খাটো ভাতার দেওর হেন সাজে।

আমরা আগেই দেওরের সঙ্গে তার বউদির মিষ্ট-মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছি। এবারে তারই দু'টি একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। একটি প্রবাদে প্রায় সমস্ত কলাই ভাতে দেওরের পাতে দেওয়া হয়েছে বলে পরিহাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হ'ল দেওরের পেছনে লাগা। হয়ত কিছু বেশি কলাই ভাতে সে নিয়েছে, কিন্তু বলার গুণে মনে হয় যেন সমস্ত কলাই ভাতে তার পাতে—

এত কলাই ভাতে, ছোট্ ঠাকুরের পাতে।

অপর একটি প্রবাদেও ছোট দেওরের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করে বলা হয়েছে—

ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্ ঠাকুরপোর গোঁফে ঘষি।

বাংলা প্রবাদে ননদকে অত্যাচারিণী রূপেই দেখান হয়েছে। শ্বশুরালয়ে বধূর দুঃখভোগের মূলে যারা, তাদের অন্যতম হল ননদ। কখনও কখনও আবার তার সঙ্গে যোগসাজস থাকে জা-এর।

দেখে শুনে বড় ঘর বিয়ে দিল বাপে।
এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে।

অপর একটি প্রবাদেও দেখি—

জা-জাউলী আপনা উলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর॥

স্বামীর ছোট বোন হ'ল ঠাকুরঝি। সাধারণত বউদি-দেওরের মত বউদি আর ঠাকুরঝির সম্পর্ক মধুরই হয়ে থাকে। ঠাকুরঝি বউদির বান্ধবীতে পরিণত হয়। প্রবাদেও তাই ঠাকুরঝি সম্পর্কে কোন আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিবর্তে ঠাকুরঝি সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবই অভিব্যক্ত হয়েছে। একটি প্রবাদে গুল খেয়ে গোল বাধিয়ে পরিত্রাণ লাভের জন্যে ঠাকুরঝিকে তেঁতুল গুলতে বলা হয়েছে—

ওল খেয়ে করেছি গোল, ঠাকুরঝি তুই তেঁতুল গোল।

অন্য একটি প্রবাদে ঠাকুরঝির কাছে কাজ করার ব্যাপারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে বেশ বেশি পরিমাণে ভাত দেবার অনুরোধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভাত যেন চেপে চেপে দেওয়া হয়, যাতে বাইরে থেকে ভাতের পরিমাণ বোঝা না যায়—

কাজকর্মে আমি নেই, ঠাকুরঝি।
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বাল্‌সে পোয়াতী॥

ঠাকুরঝিকে নিয়ে রসিকতা অন্যত্রও দুর্লভ নয়—

বল্ দেওরা রে, এর বেওরা কি।
নন্দাইয়ের কোলে কেন শোয়না ঠাকুরঝি॥

কিংবা,

ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে॥

অন্য একটি প্রবাদে অনূঢ়া কন্যার ঠাকুরঝি বলার সাধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

যার মোটে বিয়ে হয়নি, তার ঠাকুরঝি বলার সাধ।

ঠাকুরঝি সম্পর্কিত মানসিকতা ঠাকুরজামাইয়ের প্রসঙ্গেও প্রতিফলিত হয়েছে—

ঠাকুরজামাই, চাকরি কামাই, মাসে দুদিন এসো।
ঠাকুরঝিকে যেমন তেমন, আমায় ভালবেসো॥

প্রবাদে 'শালা' সম্পর্কে মিশ্র মানসিকতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একটি প্রবাদে শালাকেই কুটুমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়েছে—

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের বধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥

শালাকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতাও প্রকাশিত হয়েছে—

শালার গলায় শাল দোশালা।

আবার প্রবাদে তাকে গালাগালও করা হয়েছে এই বলে—

শালা, তোর বোনের গলায় মালা।
তোর বোনকে বিয়ে করে আমার এত জ্বালা॥

কিংবা, খেলে শালা, না খেলে বোনাই।

'শালা' একটি মধুর সম্ভাষণ। আবার ক্রোধের সময় এটি হয়ে পড়ে গালাগাল। তাইতো দেখি—

গাজনে উঠলে, বাপকে শালা বলে ।

অথবা, চারকড়ার পিঠে খেয়ে বাপকে বলে শালা ।

শেষ পর্যন্ত 'শালা' সম্পর্কে সেই নির্মম সত্যটিকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

শাপ শালা জমিদার, তিন নয় আপনার ।

স্ত্রীর বোন শালীর প্রতি ভগ্নীপতিদের অনুরাগটা সচরাচর একটু বেশিই হয়ে থাকে । আর সেই কারণেই—

আপনার বোন ভাত পায়না, শালীর তরে মোণ্ডা ।

অপর একটি প্রবাদে দেখি—

চোরে চোরে আলি ।

এক চোরে বিয়ে করে আর এক চোরের শালী ।

হিন্দু সমাজে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় সতীন প্রথারও বিলোপ সাধিত হয়েছে । নতুবা আগেকার দিনে, বিশেষত কুলীনেরা অসংখ্যবার বিবাহ করতেন আর তার ফলে অনেক সতীন নিয়ে ঘর করতে হোত পত্নীদের আর ভোগ করতে হ'ত সতীনের জ্বালা । কোন স্ত্রীই তার পতিপ্রেমের দ্বিতীয় ভাগীদারকে বরদাস্ত করতে পারে না । ফলে সতীন সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিদ্যমান । তার ওপর স্বামীর যে পত্নীর ওপর দুর্বলতা অধিক থাকে, সেই পত্নী অন্যান্য সতীনদের ওপর অনায়াসে আধিপত্য বিস্তার করে । সপত্নী বিদ্বেষের এও একটা কারণ । বাংলা ছড়ায় যেমন, প্রবাদেও তেমনি সপত্নী বিদ্বেষ প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । একটি প্রবাদে সতীন সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সতীনের পেলে নুনো খাই, পেটের বিষে ঘুম নাই ।
সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো ।
সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ মেরে থাক ॥

শুধুই কি সতীন, সতীনের সন্তান সম্পর্কেও বিরূপ মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে—

সতীনের পুত, সুন্দরও ভূত ।

অন্য একটি প্রবাদে সতীনের পুত্রকে দিয়ে সাপ ধরানোর কথা বলা হয়েছে । এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটি আর চাপা থাকে নি—

সতীনের পোয়ের হাত দিয়ে সাপ ধরানো ।

সতীনের বাপ, ভাইও প্রবাদে স্থান পেয়েছে এবং বলা বাহুল্য উভয়ের প্রতিই

বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—

বাড়ী হতে বাহির হলাম সতীনের তাপে।
পথে গিয়ে দেখি আসে সতীনের বাপে॥

কিংবা,

জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

একাধিক সতীন থাকলে সেই সংসারে আর শান্তি থাকে না। এমন কি ঘর-গৃহস্থালীর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্মও যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

দুই সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পান না।

আর সেই কারণেই প্রার্থনা জানানো হয়েছে অন্য একটি প্রবাদে—

দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।

স্বামীর মৃত্যু সেও যদি বা সয়, কিন্তু সতীন স্বামীর প্রেম-সোহাগের অধিকারিণী হবে চোখের সামনে, তা আর যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না—

যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি।

অনেক ক্ষেত্রেই সতীনের পতিপ্রেমের ভাগীদার হওয়াকে বরদাস্ত করতে না পেরে আত্মহননের পথের পথিক হতেন অনেকে—

যার ভাতার যারে নিয়ে বড় পিরীত করে।
সতীন তার দেখে গলায় দড়ি দিয়ে মরে॥

স্বামীর জীবিতাবস্থায় সে সতীনদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিবাদের সম্পর্ক, স্বামীর মৃত্যুর পর কিন্তু সেই সতীনদের মধ্যেই দিব্যি ভাব জমে ওঠে। কারণ যাকে কেন্দ্র করে বিবাদ, সেই স্বামীর মৃত্যুতেই বিবাদের সব নিষ্পত্তি—

ভাতার ম'ল ভাল হল, দুই সতীনে পিরীত হল।

যে পর্যন্ত একা স্ত্রী থাকা যায়, সে পর্যন্ত তার আর সৌভাগ্যের অন্ত থাকে না, কিন্তু সতীন আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমা পত্নীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পালা হয়ে যায় শুরু। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রবাদটি—

একা ছিলাম ঘরে মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল, আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর॥

স্বামীর অধিকতর প্রিয় পত্নীর কপালে স্বর্ণনির্মিত অলংকার জোটে কিন্তু হতভাগিনী, অপেক্ষাকৃত অনাদরের পত্নীরা অলঙ্কার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু এই বঞ্চনার কথা তো চিরকাল চাপা থাকে না। একদিন না একদিন

তা প্রকাশ পায়ই। তখন বঞ্চিত পত্নী ক্ষুব্ধকণ্ঠে, অভিমানবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলে ওঠে—

এও জানি সেও জানি, কিছু নাইক বাকি।
সতীনে দিলে সোনার গয়না, মোরে দিলে ফাঁকি॥

আবার এ হেন সতীন যদি অভিমানিনী হয়, কোন কারণে যদি খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে, তখন হতভাগিনী পত্নীকে সাংসারিক কাজকর্ম তো সব করতেই হয়, তার ওপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত স্বামীর মন রাখতে অভিমানিনী সতীনের মন ভাঙ্গিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হয়—

খলসে মাছ দিয়ে আজ রাঁধলাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধরে তোল॥

যে হতভাগ্য রমণীকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়, তার দাম্পত্য জীবন যে কতখানি মর্মান্তিক হয়, তা আজকের দিনে সতীন প্রথা যখন অচল তখন ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। কিন্তু তবু, বাংলা ছড়ায় কিংবা প্রবাদে সতীন সম্পর্কে বিরূপতার গভীরতা থেকে আমরা তার কিছুটা অন্ততঃ উপলব্ধি করতে পারি বোধ হয়। একটি প্রবাদে সতীন নিয়ে যাকে ঘর করতে হয়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

একাধিক প্রবাদেই সতীন সম্পর্কে রোষ প্রকাশিত হয়েছে বড় বেশি অকপট ভাষায়। যেমন—বঁটি বঁটি বঁটি, সতীনকে ধরে কুটি।

কিংবা, অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি। সেকালে, সতীন প্রথা প্রচলিত ছিল যখন, তখন মেয়েদের ঐকান্তিক কামনা ছিল একটি আর তা হল—

ময়না, ময়না ময়না, সতীন যেন হয় না।

বাংলা প্রবাদে মেয়ে এবং জামাইও বিষয় হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। খাইয়ে-দাইয়ে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যে কন্যাকে মানুষ করা হয়, বড় হলে তাকেই তুলে দিতে হয় অপরের গৃহে চিরদিনের জন্যে। এইভাবে যে ছিল একান্ত আপনজন সে হয়ে যায় পর। তাই কন্যা স্বভাবতঃই আমাদের পারিবারিক জীবনে একদিকে যেমন সীমাহীন দায়িত্বের বোঝা তেমনিই সে বিচ্ছেদ-বেদনার এক কেন্দ্রবিন্দু। একটি প্রবাদে সুপাত্রে কন্যা দেবার কথা বলা হয়েছে। স্পষ্টতঃই তাহলে কন্যার জীবন হবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় এই ইঙ্গিতটি

এখানে রয়ে গেছে—

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায়, যতই কেন পিত্রালয়ের সকলে অভিভূত হোক, তবু একথা সত্যি যে কন্যা কিন্তু মনে মনে জানে যে শ্বশুরালয়েই তার প্রকৃত স্থান আর সেই কারণে শ্বশুরালয়ে যাবার জন্যে সে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে।

ঝিয়ে চায় বর, মায়ে চায় ঘর।

মেয়ে শেষ পর্যন্ত পরের বাড়ী চলে যাবে—এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে পিত্রালয়ে কন্যাকে শাধ্যমত বিলাসিতায় রাখা হয়। পরিণামে কন্যা শ্বশুরালয়ের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সেইজন্যে বলা হয়েছে—

পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট।

বাড়ীর মেয়ে হয় পর, কিন্তু পুত্রের বিবাহের কারণে আবার পরের বাড়ীর মেয়ে বাড়ীর বউ হয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং বাড়ীর সকল রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারিণী হয়। আপাত এই বৈষম্যমূলক অথচ সমাজ স্বীকৃত রীতিতে বিশেষ করে মায়েদের মনে সৃষ্টি হয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়াই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এই বলে—

সোনামুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
থেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায়॥

মূলতঃ মেয়েকে যেন সুখে রাখা হয় এই ভরসা এবং আশাতেই জামাইয়ের কদর করা হয় শ্বশুরবাড়ীতে। আয়োজন হয় জামাইয়ের জন্যে ভালোমন্দ খাবারের।—

জামাইয়ের লাগি পিঠা বানাই।

কিন্তু দেখা গেল শেষপর্যন্ত জামাই কোন কারণে এলো না, তার জায়গায় তার ভাই এসে ঐসব উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করে গেল—

এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

অবশ্য জামাইয়ের জন্যে যে খাদ্যসামগ্রীর আয়েজন হয়, তাতে বাড়ীর লোকও যে ভাগ বসায় এমন নয়। বরং দেখা যায় জামাই আসা উপলক্ষ্যে বাড়ীর সকলেরই বেশ একচোট ভুরিভোজ হয়ে যায়—

জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস।

শ্বশুর-বাড়ী আসার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল ভাল-মন্দ খেয়ে মুখটাকে ঠিক করা।

সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

খাওয়া দাওয়ার গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

যদিও জামাইকে পুত্রস্থানে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, কিন্তু এই ব্যাপারে তার সম্পর্কে প্রকৃত মানসিকতাটুকু কিন্তু গোপন থাকে নি—জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা। বর্তমানে যেখানে নিজেদেরই সংসার প্রায় অচল, সেখানে আবার ঘর-জামাই পোষা কল্পনাতীত বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ঘর-জামাই সম্পর্কে মানসিকতা যে কোনো কালেই ভাল ছিল না, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের প্রবাদে। বহু প্রবাদেই ঘর-জামাইকে নানা ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কথা বলা হয়েছে। একটি প্রবাদে ঘরজামাইয়ের আপ্যায়নের কথা বলা হয়েছে এই ভাবে—

যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে-ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই র'মের তরে ধান শুকাতে দিনু॥

আর একটি প্রবাদে ঘর-জামাইয়ের সঙ্গে দূর-জামাইয়ের পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে এই বলে—

দূর জামাইয়ের কাঁধে ছাতি, ঘর-জামাইয়ের মুখে লাথি।

অপর একটি প্রবাদে ঘর-জামাই কি রকম সুখ-ভোগ করে সেই সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

শ্বশুরবাড়ীর সুখ বড়, ঘর-জামাই কিলে দড়।

নাতজামাইয়ের সঙ্গে দাদাশ্বশুর বা দিদি-শাশুড়ীর ঠাট্টার সম্পর্ক। একটি প্রবাদে নাতজামাইকে নিয়ে দিদি-শাশুড়ীর রসিকতা প্রকাশিত হয়েছে এই বলে—

অভাবে নাতজামাই ভাতার।

প্রবাদে শুধু জামাই বা মেয়েই স্থান পায় নি, সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছে শ্বশুর ও শাশুড়ীও।

আমাদের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্ক বড়ই বিচিত্র। যে মাতা পুত্রকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করে তুললেন, তিনিই কিন্তু পুত্রবধূকে আর তেমন যেন সহ্য করতে পারেন না। এর জন্যে যে কেবল শাশুড়ীই দায়ী এমন কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না, অনেক সময়ে বধূও দায়ী কম হয় না। যে পিতা-মাতা অনেক কষ্টে সন্তানকে মানুষ করেছেন, বধূ যদি সেই পিতা-মাতাকে

পর করে দিতে চায় অথবা পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে স্বামীকে বাধা দেয়, তবে শ্বশুর ও শাশুড়ী পুত্রবধূকে ভাল-চোখে দেখতে পারেন না। এর বিপরীত চিত্রও আছে। শাশুড়ীও এক সময় বধূ হয়েই সংসারে এসেছিলেন, তখন তিনি নানাভাবে তাঁর শাশুড়ীর কাছে নির্যাতিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শাশুড়ী হয়ে পুত্রবধূর ওপর সেই প্রতিশোধ তিনিও নিতে থাকেন নানাভাবে পীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে। এছাড়াও আর একটি মনস্তাত্বিক কারণ আছে। সেটি হল, যে জননী সন্তানকে মানুষ করেছেন, সংসারের ওপর যাঁর এতকাল কর্তৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত, পুত্রবধূ আসার পর যখন জননী দেখেন পুত্র হয়ে গেল পর, সে হ'ল বধূর অধীন, বিশেষতঃ সংসারের কর্তৃত্বও আর তাঁর রইল না, তখন স্বভাবতঃই শাশুড়ী বধূর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বাংলা প্রবাদে তাই শাশুড়ী সম্পর্কে পুত্রবধূর বিরূপ মানসিকতাই প্রধানভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। একটি প্রবাদে হিসেবী ও সতর্ক শাশুড়ীকে ফাঁকি দিয়ে বধূর দুধ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে—

শাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ ॥

শাশুড়ীর সঙ্গে বউয়ের বিরোধের একটি চিত্র প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

শাশুড়ী মারেন গুঁতা, বউ বেটি পেল ছুতা।

যে শাশুড়ীকে মাতৃ সম্বোধন করতে হয়, আসলে তার সম্পর্কে বধূর মানসিকতা কি তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রবাদটিতে—

জা জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।

শাশুড়ীর জীবিতাবস্থায় বধূকে কাজ করেই সারাটা দিন কাটাতে হত, বেচারীর খাওয়াও জুটতো না ঠিকমত, তাই এ হেন শাশুড়ীর মৃত্যুতে বধূ যে শুধু স্বাধীনতাই লাভ করে তাই না, সেই সঙ্গে নিজের ইচ্ছেমত দুটি খেতেও পায়—

শাশুড়ী নেই, ননদ নেই, কার বা করি ডর।
আগে খাব পান্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর ॥

শাশুড়ী কি রকম, না ডালের মধ্যে যেমন মুসুর তেমনি—

ডাইলের মধ্যে মসুরী মানুষের মধ্যে শাশুড়ী।

শাশুড়ী বা গিন্নীর সব ভাল এমন কি তাঁর গায়ের গন্ধও গন্ধ নয়—

গিন্নীর গায়ে গন্ধ নেই।

শাশুড়ীর সঙ্গে বধূর কার্যকলাপের পার্থক্য দেখান হয়েছে একটি প্রবাদে অতি সুন্দরভাবে। শাশুড়ী যে কাজ করলে অন্যায় হয় না, বধূ সেই কাজ করলেই কিন্তু অন্যায় বলে পরিগণিত হয়। যেমন—

বউ ভাঙ্‌লে সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নী ভাঙ্‌লে নাদা, ও কিছু নয় দাদা॥

অন্যত্রও দেখি—

শাশুড়ী ভাঙ্গলে খেলা হয়, বউ ভাঙ্গলে কামের নয়।

একটি প্রবাদে বধূ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সম্ভবতঃ শাশুড়ী যা অপছন্দ করেন সেই পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হয়ে শাশুড়ীকে সেজন্যে গাল না দেবার অনুরোধ জানিয়েছে, সম্ভবতঃ তাকে আরও রাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—

হেই শাশুড়ী গাল দিও না পাশা খেলতে বসেছি।

সংসারের শান্তি এবং শ্রী নির্ভর করে মূলতঃ শাশুড়ী-বউয়ের আন্তরিক সম্পর্কের ওপর। একটি প্রবাদে এর ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—

শাশুড়ী বউয়ে ভাব থাকলে, মাচার ধানেও ভাত হয়।

সাধারণভাবে শাশুড়ী সম্পর্কে বধূদের মানসিকতা কিরকম, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রবাদটিতে যেখানে শাশুড়ীর মৃত্যুর পর বধূ কখন শোক প্রকাশ করবে সেইকথা জানিয়েছে।

শাশুড়ী মল সকালে।
খেয়েদেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে॥

বাংলা প্রবাদ থেকে তালুইও বাদ যান নি। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

থাকলে তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাকলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ নয়।

বাংলা প্রবাদে যেখানে খোদ শাশুড়ী ঠাকরুণকেই সুনজরে দেখা হয়নি, সেখানে অন্যান্য শাশুড়ীদেরও যে বেশ সুনজরে দেখা হবে না, তা আমরা অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারি। আর বাস্তবেও তার প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রবাদে খুড় শাশুড়ী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ভাতারের মা শাশুড়ী, তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাল-ঠাকুরাণী॥

অপর একটি প্রবাদে পিস্‌শাশুড়ী উল্লিখিত হয়েছেন এইভাবে—

ইয়া জানে বিয়া জানে, পিস্‌শাশুড়ীর নাম জানে না।

বধূর দৃষ্টিতে শাশুড়ী কিরকম, অথবা শাশুড়ী সম্পর্কে বধূর মানসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি, এইবার শাশুড়ীর দৃষ্টিতে বধূর পরিচয় লাভের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বধূ সম্পর্কে আমরা শাশুড়ীদের মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হবারও সুযোগ পাব।

একটি প্রবাদে তার চাল-চলন সমালোচিত হয়েছে, এমন কি তার গলার স্বরও বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি—

বউয়ের চলন ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক চেঁচায় যেমন ॥

একটি প্রবাদে বউকে ত স্পষ্টই 'ডাকিনী' এবং 'বাঘিনী' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে—

বউ নারে বউ না গরল ডাকিনী।
দিন হলে মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী ॥

শাশুড়ী কর্তৃক বউকে আপ্যায়নের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। বউয়ের জন্যে ক্ষীর রেখে, শাশুড়ী তা তাকে খেতে বলেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি লেজুড়ও জুড়েছেন—

বউমা, ক্ষীর রইল খাবে।
যদি খাবে ত যমের বাড়ী যাবে ॥

অর্থাৎ ভাল-মন্দ কিছু বউকে খেতে দিতে শাশুড়ী নারাজ।

প্রচুর অর্থ ব্যয় করে জননী পুত্রের বিয়ে দিয়ে বউ আনলেন। কিন্তু তারপর দেখা গেল সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সব তাঁরই ঘাড়ে, আর বউ তাঁর ওপর চালায় খবরদারি। স্বভাবতঃই এতে অসন্তুষ্ট শাশুড়ীর অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি বাঁদী।
সে হল গিন্নী, আর আমি বসে রাঁধি ॥

বউ আনায় নিজের গিন্নীপনা যাওয়ায় ক্ষুব্ধ শাশুড়ীর অনুযোগ—

পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নীপনা গেল।

বউয়ের গিন্নী হবার সাধকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্রবাদে—

একলা ঘরে গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।

আর একটি প্রবাদেও একই রূপ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়—

কাঁখে কলসী চড়ক পাক, গিন্নী হবার জাঁক।

বউ যদি সংসারের কর্ত্রী হয়ও, তবু শাশুড়ী স্বাভাবিক কারণেই এই কর্তৃত্ব সুনজরে দেখেন না, তার ওপর যদি কর্তৃত্ব হয় ত্রুটিপূর্ণ তাহলেত কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ীর তরফে বয়ে যাবে সমালোচনার ঝড়—

বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে ত নুন থাকেনা।

অন্য একটি প্রবাদে গিন্নীপনার আদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

পান থেকে চুন খসেনা, এমনি হল গিন্নীপনা।

মা-বাবাকে খাওয়াবার দায়িত্ব পুত্রের। পুত্রকে উপার্জন করে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু তাই বলে পুত্রতো আর নিজে রান্না-বাড়া করে মা-বাবাকে খাওয়াবে না, সে দায়িত্ব পুত্রবধূর। তাই বধূ যদি কর্তব্যপরায়না না হয় তাহলে পুত্র শত রোজগার করলেও মা-বাবার ভাগ্যে জোটে অনন্ত দুঃখ, অর্ধাহার কিংবা অনাহার। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

পুতের ভাত, বউয়ের হাত।

অনেক সময়েই ছেলের স্ত্রৈণতার জন্যে এবং সেই সঙ্গে কর্তব্য বোধের অভাবে স্ত্রী এবং জননীর মধ্যে দৃষ্টিকটু পার্থক্য রচিত হতে দেখা যায়। শাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক খারাপ হওয়ার এটাও একটা কারণ। যেমন একটি প্রবাদে দেখি—

গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।

কিংবা,

কলির কথা কই গো দিদি কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি বউয়ের পাতে দই॥

গিন্নীর বধূর ওপর রাগের প্রধান কারণ সংসারের কর্তৃত্ব চলে যাওয়া। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—হই গিন্নী না ছুঁই হাঁড়ি।

আজকালকার দিনে ছেলেরা সব বউয়ের অনুগত, তাই ছেলের আনুগত্য লাভের জন্যে বউয়ের সুনজরে থাকতে হয় শাশুড়ীদের—

বউরে সেবিলে পুতেরে পায়।

অনেক সময়েই বউ ঠিক মত সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম করতে এগোয় না। তখন শাশুড়ী ঠাকরুণকে খানিকটা মেজাজ দেখাতে হয়, আর তাতেই কাজ হয়—

বউটি ভাল বটে, টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।

একটি প্রবাদে বউয়ের ব্যাজস্তুতি করা হয়েছে এই বলে—

বউ নয় ত হীরে।
কাল দিয়েছে পাটের শাড়ী, আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।

আবার সরাসরি বউকে আক্রমণ করা হয়েছে, এমন প্রবাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। যেমন এইটি—

বউনা সেবা, বউনা বাবা।

সব শেষে প্রবাদে স্বামী-স্ত্রী কি ভাবে চিত্রিত হয়েছে দেখা যেতে পারে। প্রবাদে স্বামীকে বড় করে দেখান হয়েছে, দেখান হয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আন্তরিক ব্যাকুলতা। একটি প্রবাদে স্বামীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে বলা হয়েছে—

উদ্‌বিড়ালী উদ্ খা, স্বামী রেখে সতীন খা।

অপর একটি প্রবাদে স্বামীর দেওয়া ভাতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

মা বাপ ভাত দেয় দিন গুণতি করে
স্বামীর তুল্য ভাত আর কেউ দিতে নারে॥

একটি প্রবাদে স্ত্রীর যত্নপূর্বক সংসার করার কথা বলা হয়েছে, বিশেষত নিজের হাতে রেঁধে স্বামীকে খাওয়াবার কথা, কিন্তু এই সংসারিক শান্তি অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে বলে বলা হয়েছে। বস্তুত আদর্শ স্ত্রীর নিজের হাতে রান্না করে স্বামীকে যত্নপূর্বক খাওয়ানোয় যে পরিতৃপ্তি, তা অন্য কোন কিছুতে হয় না—

আপনি রাঁধি আপনি বাড়ি, মোর সোয়ামী খায়।
পাড়া পড়শী মাগীগুলা চোখ পাকিয়ে চায়॥

একটি প্রবাদে অবশ্য স্বামীকে এই বলে ঠোকা হয়েছে যে স্ত্রী মারা গেলে স্বামীরা আবার বিয়ে করে; স্ত্রীর প্রতি তাদের মমতা ও প্রীতি যে কত সাময়িক এবং অগভীর তারই উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে—

বউ মরে, উলু পড়ে, ঘরে ঘরে বিয়ে করে।

এক্ষেত্রে মূল কথাটি হ'ল স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের যে দরদ, সে তুলনায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীদের আন্তরিকতা অনেকখানিই কৃত্রিম। এইবার স্বামীদের দৃষ্টিতে স্ত্রীর পরিচয় নেওয়া যাক। একটি প্রবাদে আবার স্ত্রীরা যে পর্যন্ত স্বামীর হাতে পয়সা থাকে সে পর্যন্ত স্বামীর প্রতি অনুরক্ত থাকে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সময়ে সব হয় বোন ভাগনা ভাই।

ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই।

স্বামীর কর্মের মূলেও যে স্ত্রীর ভূমিকাই মুখ্য অন্য একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, লক্ষ্মী পালায় ভয়ে।
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট, ভাত নেই ঘরে॥

আমরা আগে দেখেছি পতি পরায়ণা স্ত্রী নিজের হাতে স্বামীকে খাওয়াবার কথা গর্বভরে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সব স্ত্রীই তাই বলে এইরূপ আচরণ করে তা নয়। অনেক আহ্লাদী স্ত্রী তো রান্না করতেই গররাজি। অগত্যা হতভাগ্য স্বামীকে সেক্ষেত্রে বলতেই হয়—

আহ্লাদের মাগ তুমি, কেঁদোনা কেঁদোনা।
চাল চিবিয়ে খাব আমি রেঁধোনা রেঁধোনা॥

স্ত্রীকে যতই দেওয়া যাক, তবু তার আশ আর মেটেনা, কেবল তার চাই চাই রব, অনির্বান অসন্তোষ তার মনে। সেই জন্যেই দুঃখ করে বলা হয়েছে—

মাগের আব্দার মেটাবে যে, জন্মায়নি ভাতার সে।

বিশেষত স্ত্রী যদি হয় দ্বিতীয় পক্ষের তাহলেত কথাই নেই। সেক্ষেত্রেই স্বামীকে স্ত্রীর অনুগত হয়ে থাকতে হয়। তা নইলে অশেষ দুর্ভোগ।

দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি।

একটি প্রবাদে দোজবরের স্ত্রীকে ত সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে—

দোজবরের মাগ, সোঁদরবনের বাঘ।

মুসলমান সমাজে নিকে করা স্ত্রীর স্থায়িত্ব কত সাময়িক তা বোঝান হয়েছে এই ভাবে—

ঠিকের জমি, নিকের মাগ।

একটি প্রবাদে মা-বাবার সঙ্গে পত্নীর তুলনায় কি রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তার সুন্দর চিত্রটি ধরা পড়েছে—

মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা।

অনেক সময় স্বামীরা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, কিন্তু এর ফল কখনই ভাল হয় না। প্রবাদেও তার সাক্ষ্য রয়েছে—

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে।

ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে ॥

অবশ্য অন্য একটি প্রবাদে স্ত্রীকে মারার কথা বেমালুম অস্বীকার করা হয়েছে, বলা হয়েছে—

বউয়ের গায়ে কি হাত উঠায়,
লোক দেখিয়ে বালিশ কিলায়।

স্ত্রীর হাতের রান্না আবার পত্নী সোহাগী পতির কাছে অমৃততুল্য বলে মনে হয়—

মায়ে রাঁধে যেমন তেমন, বোনে রাঁধে পানি।
ওই অভাগী রাঁধে যেন চিনি পরমান্নি ॥

অবশ্য এক্ষেত্রে সত্যতা কতখানি, সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। স্ত্রীর মন রাখতেই বুঝিবা এ হেন উক্তি, অবশ্যই সে স্ত্রী দর্জাল প্রকৃতির। তবে হ্যাঁ, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে যে সব কথা সত্যি নয়, তবু স্বামীরা বলে থাকে, কিংবা বলা যায় বলতে বাধ্য হয় গৃহশান্তি রক্ষার জন্যে, একটি ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু মন রাখা কথা নয়, পরম সত্যকেই প্রকাশ করা হয়েছে ; যদিও এ উক্তি নিঃস্বার্থ নয়, তবু এতেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের খুশী থাকা উচিত—

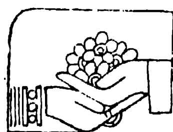
আর মাগ যেমন তেমন, বয়সকালের মাগ মাথার রতন।

প্রথমত বেশী বয়সে বিবাহ করলে স্ত্রীরা একটু অতিরিক্ত মর্যাদা এবং গুরুত্ব পেয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীই হয়ে ওঠে একমাত্র সঙ্গী, প্রাণের দোসর, আর স্বভাবতঃ মাথার রতন হতে দেরী লাগে না।

এইভাবে বাংলা প্রবাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাঙালীর পারিবারিক জীবনের, বিশেষত পারিবারিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত যারা তাদের যথার্থ পরিচয়টুকুর সন্ধান যেমন পাই, তেমনি সেইসঙ্গে আমাদের পারিবারিক জীবন এবং চরিত্র বিশেষের মনস্তত্ত্বেরও পরিচয় লাভ করি। প্রবাদে সচরাচর মুখ্য বক্তব্যকে ভিন্নতর মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়, কিন্তু পারিবারিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলিতে একান্তভাবে পারিবারিক চরিত্রগুলির বিশেষত্বকেই তুলে ধরা হয়েছে, কোন ভিন্নতর বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি স্বীকার করতে হয়।

বাংলা প্রবাদে সামাজিক রীতি-নীতি

সাহিত্য সমসাময়িক সমাজজীবনের নির্ভরযোগ্য দলিল। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দেশেই সমাজ জীবনে সময়োচিত পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই এক শতাব্দী পূর্বে আমাদের সমাজজীবনে যে সব বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হতো, আজ আর সেগুলি হয়তো দৃশ্যমান নয়; তেমনি আজকের সমাজ জীবনে যে সব রীতি-নীতি সত্য হয়ে সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে, বিগত শতাব্দীতে হয়ত তার লেশমাত্রও ছিল না। অবশ্য কিছু কিছু সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ থাকে যা দীর্ঘদিন ধরে একটি জাতির জীবনে সত্য হয়ে বিরাজ করে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এমন কিছু সামাজিক রীতি-নীতির পরিচয় লাভ করবো, যা অতীতের বিষয় হয়ে গেছে। তেমনি কিছু কিছু রীতি-নীতি আবার অতীতের মত বর্তমানেও অনুসৃত হয়ে চলেছে। লোক-সাহিত্যের অন্যতম বিভাগ প্রবাদ যে সর্বোপরি সাহিত্যেরই অঙ্গ, আর সাহিত্যের অন্যতম শর্ত সমাজ সচেতনতা—বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সত্য-টিকেই নতুন করে স্মরণ করবো।



হাটে হাঁড়ি ভাঙা

এই প্রবাদটির মূল তাৎপর্য হলো সর্ব সমক্ষে গোপন বিষয় ফাঁস করা। কিন্তু এই প্রবাদটিতে আগেকার দিনে প্রচলিত একটি বিচিত্র রীতির বিষয় স্থান পেয়েছে লক্ষ্য করা যায়। সমাজে যতগুলি দূষণীয় অপরাধ আছে, তারমধ্যে অন্যতম হল লাম্পট্য। পূর্বকালে লাম্পট্যের অভিযোগে অভিযুক্ত নর-নারীকে শাস্তিদানের জন্য এক বিশেষ রীতির অনুসরণ করা হতো। সিদ্ধাচার্য লুইপাদের নামে একটি হাঁড়িতে সিঁদুর লেপন করে প্রথমে পূজা করা হতো। তারপর একটি ছাগলকে বলি দিয়ে তার নাড়ি-ভুঁড়ি সব ঐ হাঁড়িতে পুরে সেই হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে গিয়ে হাটের মাঝখানে যেখানে বহুলোকের সমাগম হয়

সেখানে অভিযুক্ত নর-নারীদের কুৎসা কীর্তন করে ভাঙা হতো। এরফলে অভিযুক্তরা সকলের পরিচিত হয়ে যেত। তারা আর সমাজে স্থান পেত না। বর্তমানে আমরা কিন্তু 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' বলতে নিছক কিছু গোপন কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করাকেই বুঝিয়ে থাকি। আগেকার মত সামাজিক শাস্তি-বিধানকে বোঝায় না। কারণ সেই শাস্তিবিধান এখনকার সমাজে আর প্রচলিত নেই।

ধর্মের ঢাকে কাঠি দেওয়া বা কাঠি পড়া।

এটিও একটি বহুল পরিচিত প্রবাদ। কিন্তু আমরা অনেকেই এই প্রবাদটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত নই। এই প্রবাদটিতেও অতীত সমাজের একটি রীতির কথা স্থান পেয়েছে। আগেকার দিনে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে অভিযোগকারী স্বয়ং বা তার পক্ষে অন্য কেউ ধর্মঠাকুরের ঘট মাথায় করে নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়ে সকলকে অভিযোগ শোনাত। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অভিযোগকারীর সঙ্গে থাকতো একজন ঢাকী। প্রথমে ঢাকে কাঠি মেরে জনসাধারণকে উপস্থিত করিয়ে তারপরই অভিযোগ করা হতো। এরই নাম 'ধর্মের ঢাকে কাঠি দেওয়া'।

চোদ্দশাকের মধ্যে ওল পরামানিক।

কার্তিক মাসের ভূত-চতুর্দশ তিথিতে গৃহস্থ বাড়ীতে চোদ্দ প্রদীপ জ্বালাতে হয়, চোদ্দ শাকও খেতে হয়। চোদ্দ শাক খেলে নাকি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হতে হয়না। এই চোদ্দ শাক তোলার সময় বলতে হয় 'চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামানিক বা শ্রেষ্ঠ'। 'প্রামাণিক' শব্দ থেকেই 'পরামানিক' শব্দটির উৎপত্তি।

জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিরূপা।

এই সংস্কার আজকের সমাজেও অনুসৃত হতে দেখা যায়। কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজার দিন প্রচলিত সংস্কার হলো রাত্রি জাগরণ। রাত্রি জাগরণে নাকি ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ঘটে, বিপরীতক্রমে নিদ্রা গেলে লক্ষ্মীদেবী অসন্তুষ্ট হন এবং গৃহস্থকে পরিত্যাগ করেন।

কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে।

আগেকার দিনে আইবুড়ো নাম খণ্ডনের জন্য কুলীন কন্যাদের কলা গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল। এছাড়া, যেসব পুরুষের পর পর দু'বার দার-পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও দুবারই পত্নীবিয়োগ ঘটত, তারা তৃতীয়বার দার-

পরিগ্রহ করার আগে যাতে পুনরায় না কোন অমঙ্গল হয়, সেজন্যে কলা-গাছের সঙ্গে তাদের আগে একটা কাল্পনিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। এইভাবে তৃতীয়বার দারপরিগ্রহকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করা হত।

এয়োতির পুত খেলতে যায়।

অশুভ কোন কথা বা নেতিবাচক বক্তব্যকে আমরা সচরাচর এড়িয়ে যাই। যেমন চাল না থাকলে বলা হয় 'চাল বাড়ন্ত'। উদ্ধৃত প্রবাদটিতেও সেই একই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। সধবা রমণীর সন্তান মৃত্যু মুখে পতিত হলেও তাকে মৃত বলা হয় না। কারণ সধবা রমণীর আবার সন্তান লাভের সম্ভাবনা থাকে তাই।

উলটে চোরা মশান গায়।

প্রাচীন কালে এক বিচিত্র প্রথা অনুসৃত হত। প্রথাটি হল চোরকে শূলে দেবার জন্য মশান বা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় রাজ পথের বিশেষ বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে কোটাল সমবেত জনতার কাছে চোরের অপরাধ সম্পর্কে বলত, একেই বলা হত 'মশান গাওয়া'। বর্তমান প্রবাদটিতে সেই প্রথাটির কথাই স্থান পেয়েছে। বলা হয়েছে চোর কোটালকে মশান গাইতে না দিয়ে নিজের নির্দোষিতা এবং অন্যের বিরুদ্ধে উল্টে অভিযোগ প্রচার করেছে।

গো জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্ব জন্ম।

আগেকার দিনে গরু মারা গেলে মৃত গরুর মুখে ধান-দূর্বা বা ঘাস-জল দিয়ে বলা হতো—'গো জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্ব জন্ম'। গন্ধর্বরা স্বর্গের গায়ক, এদের মুখ ঘোড়ার মত। অনুমিত হয় এরা খুব সুখী। প্রবাদটির প্রচলিত অর্থ হল দুর্দিন অপগত হয়ে সুদিন আসুক।

পইতে পুড়িয়ে বামুন হওয়া।

সন্ন্যাসী মাত্রই দণ্ডধারী। দণ্ডধারী সন্ন্যাসী দণ্ড গ্রহণের সময় একটা সুপারির সঙ্গে নিজ মস্তকস্থিত শিখা ও গলার উপবীত একত্রে ঘৃত ও মাটি দিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তারপর এগুলি ভস্মীভূত হলে দণ্ডী তা ভক্ষণ করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী দণ্ডী ঐগুলি ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যান।

বুধে সাত পুতে নেঙটা।

বুধবার দিন নতুন কাপড় পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বর্তমান প্রবাদটি-তে। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এইদিন নতুন বস্ত্র পরিধান করলে সাত

পুত্রের জনক-জননী হলেও তাকে পরিণামে উলঙ্গ থাকতে হয়, পরার কাপড় কপালে জোটে না।

আগিয়ে দিয়ে দখিন পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

যাত্রার সময় দক্ষিণ পা আগে বাড়িয়ে দিলে যাত্রা শুভ হয় বলে আমাদের সমাজের একাংশ মানুষের বিশ্বাস। প্রবাদটিতে সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। অপর একটি প্রবাদে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ'।

বাংলাদেশের মেয়েরা সোমবার সোম বা চন্দ্রের নামে উপবাস করে থাকে। এই প্রসঙ্গেই একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

চিংড়ি মাছ খেয়ে সোমবার নষ্ট।

চিংড়িকে মাছের মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাই সোমবার নষ্ট করতে হলে চিংড়ির বদলে উপযুক্ত মাছ খেলে বরং কিছুটা যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু চিংড়ি খেয়ে সোমবার নষ্ট করা অর্থহীন। প্রবাদটির মূল অর্থ হল, সামান্য জিনিসের কারণে মহত্তর বিষয় পরিবর্জন।

আমাদের সমাজে যতগুলি সামাজিক ক্ষত ছিল, তারমধ্যে অন্যতম হল সতীদাহ প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় পত্নীকে পুড়িয়ে মারা হতো। এতে নাকি ঐ হতভাগিনী পত্নীর অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভের পথ প্রশস্ত হতো। এই যুক্তিতে কত যে অনিচ্ছুক রমণীকে বলপূর্বক জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো, তার আর ইয়ত্তা নেই। অনেক সময় আবার ভুলবশতঃ মৃতব্যক্তির চিতায় অন্য কারো পত্নীকে তুলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো এবং পাছে ঐ রমণীর প্রতিবাদ শ্রুতিগোচর হয় সেজন্যে উচ্চৈঃস্বরে উলুধ্বনি দিয়ে তার আর্তস্বরকে ডুবিয়ে দেওয়া হতো। একটি প্রবাদে এই মর্মান্তিক প্রথার কথা বর্ণিত হতে দেখা গেছে—

কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে দে উলু।

বলপূর্বক সতীদাহের উদ্দেশ্যে কলুর বউকে ভুলবশতঃ অন্যের চিতায় তুলে দিলে কলুবউ তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে চাইলে সমবেত জনতার উলুধ্বনি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রবাদটিতে।

এখন সরকারী আইন বলে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ হলেও দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চলে এসেছে আর পরিণামে সতীনে-সতীনে

বিরোধ, পারস্পরিক সন্দেহ, প্রতিহিংসায় কত সংসারই না নষ্ট হয়েছে, নষ্ট হয়েছে কত হতভাগিনীর জীবন। তাই বাংলার ছড়া, প্রবাদ সর্বত্রই সতীনের প্রতি চরম বিষোদ্গার ঘটেছে। একটি প্রবাদে সতীনের প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

সতীনের হাত, সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।
সতীনের ডাক, নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ মেরে থাক ॥

প্রবাদটির শেষ পংক্তিতে তৎকালীন বাংলাদেশের একটি কুৎসিত প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথাটি হল নিশির ডাক। অপরের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা—এই হল নিশির ডাকের তাৎপর্য। তাই রাত্রে ডাকলে কেউ সাড়া দিত না সহজে। সাড়া দিলে নাকি মৃত্যু ছিল অবধারিত। নিশি একবার মাত্র ডাকত, তাই কমপক্ষে তিনবার না ডাকা পর্যন্ত কেউ রাত্রে সাড়া দিত না।

এক সন্তানের জন্মের পর ঋতুতে গর্ভিত 'একমুড়া' সন্তান নাকি পরিবারস্থ কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রাণনাশের কারণ—এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

মুড়ায় খায় বুড়া।

দণ্ডায়মান বধূর হাতে পান-সুপারি দিয়ে মঙ্গলাচরণ করার রীতিটি আজকের সমাজেও বর্তমান। একটি প্রবাদে এই রীতিটির কথাও বলা হয়েছে—

দাঁড়া 'গো পান' দিয়ে বরণ করা।

এখানে 'গো পান' অর্থে গুয়া পান।

বাঙ্গালী হিন্দুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হল সপ্তপদী। এই ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বর-বধূকে সপ্তপদ একসঙ্গে গমন করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বধূও চারদিকে সাতবার ঘুরে থাকে। এর ফলে বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য হয় বলে বিশ্বাস। একটি প্রবাদে এই সামাজিক রীতির কথা বর্ণিত হয়েছে—

সাত পাকের বিয়ে চোদ্দ পাকেও খোলে না।

হিন্দুদের সকল প্রকার দেবপূজায় এবং শুভ কার্যে জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করার রীতি। এই জলপূর্ণ ঘটের ওপর রক্ষিত হয় কাঁঠালি কলা। নানা শ্রেণীর কলার মধ্যে পূজার জন্যে কাঁঠালি কলাই প্রশস্ত। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

সর্বঘটে কাঁঠালি কলা।

প্রবাদটির মূল অর্থ হল—কাঁঠালি কলার মত যে ব্যক্তি সকল ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

আমাদের দেশের হিন্দুসমাজে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মার মুক্তির জন্যে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হয়। পিতা-মাতা এবং অপরাপর গুরুজনদের শ্রাদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় হয়। এই উপলক্ষ্যে আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানান হয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় লৌকিকতা স্বরূপ অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গটিও প্রবাদে উল্লিখিত হয়েছে—

শ্রাদ্ধ করে ভরে, বিয়ে দিয়ে মরে।

অর্থাৎ বিবাহাদিতে কন্যার পিতা-মাতার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, বিনিময়ে যে সব উপহার-সামগ্রী লাভ হয়, তা পায় কন্যা। বিপরীতক্রমে শ্রাদ্ধাদিতে প্রাপ্ত লৌকিকতা ব্যয়ের অনেকাংশ পূরণ করে।

দোষ-ত্রুটি গোপনের বৃথা চেষ্টাকে সমালোচনা করা হয়েছে একটি প্রবাদের মাধ্যমে। বহুল পরিচিত এই প্রবাদটি হল—

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

এই প্রবাদটির মধ্য দিয়েও হিন্দু-সমাজের একটি বিশেষ রীতির কথা প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু বিধবার পক্ষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। তাই বিধবা রমণী, লোককে গোপন করার জন্যে শাক চাপা দিয়ে মাছ লুকোবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা পড়তেই হয়। কারণ মাছ দেখা না গেলেও গন্ধেই টের পাওয়া যায়।

লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী শনিবার যদি কেউ মারা যায়, তাহলে মৃতব্যক্তি নাকি অপর একজনকে সঙ্গী করতে চায়। অর্থাৎ শনিবার একজন মারা গেলে অপর একজনেরও মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। অসৎ ব্যক্তি নিজের দলে আর একজন ভাল মানুষকে টানতে চায় বোঝাতে বলা হয়—

শনিবারের মড়া দোসর চায়।

'লালবাতি জ্বালা' আর একটি পরিচিত প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। ব্যবসা বন্ধ হওয়া বোঝাতে এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার নিয়মিত দৈনিক লেন-দেন স্থগিত রেখে রাত্রিবেলায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলো জ্বেলে ব্যবসার হিসাব-নিকেশ ভাল করে

পরীক্ষা করতেন এবং কারবারের সঙ্গিন অবস্থা বোঝাতে দোকানের বাইরের দিকে একটা লাল আলো জ্বেলে রাখা হতো। এই রীতি থেকেই বর্তমান প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির উদ্ভব।

হিন্দুদের মধ্যে একটি সংস্কার প্রচলিত আছে শয়ন করা বিষয়ে। উত্তরদিকে মাথা রেখে শয়ন করা নিষিদ্ধ। উত্তর শিয়রে মাথা রেখে শয়ন করলে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা। হিন্দুদের শবদেহ কেবল উত্তর শিয়রে রাখার রীতি। অবশ্য যে ব্যক্তির স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, সেই ব্যক্তি উত্তর শিয়রে মাথা রেখে শয়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর বৈধব্যদশা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না, তাই। আবার যে হতভাগ্য ব্যক্তির শয়নের জন্য সামান্য মাদুর পর্যন্ত জোটেনা, তার ক্ষেত্রে কোন শিয়রে শয়ন করবে, সে প্রশ্নই অবান্তর। এই সম্পর্কিত প্রবাদটিতে তাই বলা হয়েছে—

মূলে মাগ নেই, তার আবার উত্তর শিয়র।

আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষ মানুষ যে পথ দিয়ে বিবাহ করতে যায়, বিবাহের পর আর সেই পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না। অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করে। এই কারণেই সৃষ্ট হয়েছে একটি প্রবাদ, যার মাধ্যমে বলতে চাওয়া হয়েছে, আইবুড়ো অবস্থা শেষ করে নূতন বিবাহিত জীবনের সূচনাকে। প্রবাদটি হল—

আইবুড়ো পথ বদলানো।

পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে দক্ষিণ অঙ্গ—যেমন চোখ, পা ইত্যাদি খুব শুভ, বিপরীত-ক্রমে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে বাম অঙ্গকে শুভ বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। তাই পুরুষ মানুষের ডান চোখ নাচলে শুভ কিছু ঘটবে বলে ধরা হয়। যাত্রার সময় পুরুষ মানুষ যদি ডান পা আগিয়ে দেয়, তাহলে যাত্রা শুভ হয়। একটি প্রবাদে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আগিয়ে দিয়ে দখিন পা, যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজেও নানা সংস্কার এবং রীতি-নীতি প্রচলিত আছে। বাংলা প্রবাদে যে কেবল হিন্দুদের সামাজিক রীতি-নীতির কথাই স্থান পেয়েছে তাই নয়, মুসলমান সমাজের রীতি-নীতিও বেশ কয়েকটি প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই রকম একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

আগে থাকে উল্লা তুল্লা, পরে হয় উদ্দিন,
তলার মানুষ উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন।

হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ নেই ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নতা বিদ্যমান। তথাকথিত নিম্নতর থেকে উন্নততর স্তরে উন্নীত হয়ে এই সমাজে মানুষ সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নাম-করণেরও পরিবর্তন ঘটে। কিংবা বলা চলে ক্রমোন্নতি ঘটে। এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির নামের শেষে যদি উল্লা বা তুল্লা থাকে, তবে তা পরি-বর্তিত হয়ে দাঁড়ায় উদ্দিন। যেমন বদরুল্লা থেকে বদরুদ্দিন। পুনরায়, নামের শেষে যদি মামুদ থাকে, তাহলে সৌভাগ্য অর্জনের পর তা পরিবর্তিত হয়ে হয় মুহাম্মদ। শুধু তাই নয়, এই পরিবর্তিত নামটি সকলের আগে বসে। যেমন ফজল মামুদ হয় মুহাম্মদ ফজল আলি।

মুসলমান সমাজে শহীদ এবং গাজী উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তি খুব সম্মানিত বলে বিবেচিত হন। এই সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে যুক্ত হওয়ায় পুণ্যলাভ হয়। বিধর্মীকে হত্যার মাধ্যমে এরা 'গাজী' এবং বিধর্মীর হাতে নিজেরা মৃত্যু বরণ করলে 'শহীদ' উপাধি প্রাপ্ত হয়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

মরলে শহীদ, মারলে গাজী।

মুসলমান সমাজে আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে যা 'নিকে' নামে পরিচিত। বিধবা কিংবা পতি-পরিত্যক্তা নারীকে বিবাহ করাই হল নিকা। নিকা অবশ্য শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ বলে বিবেচিত হয় না। যাইহোক, নিকা অত্যন্ত অস্থায়ী। নিকাকরা স্ত্রী যে কোনও সময়ে চলে যেতে পারে। তাই একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঠিকে চাকরী, নিকের মাগ—কখন আছে কখন নেই।

আমাদের বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে ভাসুরের সঙ্গে ভাদ্দর বউয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। ভাসুর যদিও স্বামীর বড় ভাই, তবু ছোট ভাইয়ের স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলেনা, আর স্পর্শ, তা তো কল্পনারও অতীত। ভাসুর যেহেতু গুরুজন তাই—

ভাসুরের নাম সবাই জানে, মুখে আনতে মানা।

ভাসুরও সযত্নে ভাদ্দর বউয়ের সম্পর্ক পরিহার করে চলেন—

একদিকে ভাদ্দর বউ একদিকে আঁস্তাকুড়।

—তাই এহেন ক্ষেত্রে বেচারী ভাসুর পথ পান না কি ভাবে যাবেন। ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের সম্পর্কটি কিরকম, তা বিশেষভাবে বোঝা যাবে আর একটি প্রবাদ থেকে। ভাসুর পাঁকাল মাছ খান কিনা ভাদ্দর বউ তা জানতে চায়,

কিন্তু সরাসরি ভাসুরকে তার পক্ষে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব। তাই ভাসুরকে শুনিয়ে ঘরের মাটির দেওয়ালকে উদ্দেশ করে ভাদ্দর বউ প্রশ্ন করে—

"কাঁথখান, কাঁথখান, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান ?"

ভাসুরও এর উত্তর দেন ঠারে-ঠোরে। সেই সঙ্গে তাঁর আবার স্নানের জন্যে যে তেলের প্রয়োজন, তা'ও জানিয়ে দিতে ভোলেন না—

"খান খান খান, এখন একটু তেল পেলে নাইতে চলে যান।"

আমাদের সমাজে ব্যবসায়ীরা দিনের প্রথম বিক্রয় লব্ধ অর্থকে লক্ষ্মীর দান মনে করে থাকে। একে বলা হয় বউনি। বউনির একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

বউনির কড়ি লক্ষ্মীর দান।

আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু তীর্থক্ষেত্র আছে। অবশ্য গুরুত্বের বিচারে সব তীর্থক্ষেত্র সমান নয়। এদিক দিয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগ যা নাকি বর্তমান এলাহাবাদে বিদ্যমান—খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে যত পাপ করুক, এই প্রয়াগে এসে মস্তক মুণ্ডন করলে সব পাপের স্খালন হয় বলে বিশ্বাস। তাই প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডনের বড় ধুম—

প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যেথা সেথা।

প্রাচীনকালে দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডদানের এক বিচিত্র রীতি প্রচলিত ছিল। দণ্ডিত ব্যক্তির মাথায় পাঁচ জায়গায় ছোট ছোট চুলের গোছা রেখে অবশিষ্ট অংশ মুড়িয়ে কেটে দেওয়া হত। এর নাম ছিল পাঁচচুলো করা। এই নিয়ে রচিত প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি হল—

পাঁচচুলো করা।

কারো মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে কেউ কিছু বললে সেই বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়। কারণ মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যা বললে যার মাথায় হাত দেওয়া হয়, তার অকল্যাণ হয় তা'হলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, অথচ নিজের বক্তব্যকে সত্য বলে বিশ্বাস উৎপন্ন করতে চায়, সেক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি আপনজনের মাথায় হাত রেখে শপথ না করে অন্যের মাথায় হাত রেখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে। যাতে ক্ষতি হলেও তা অপরের ওপর দিয়েই চলে যায়, নিজের জনের তাতে কোন ক্ষতি হয় না। একটি প্রবাদে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাৎ

এখানে 'কিরা' অর্থে শপথ করাকে বোঝান হয়েছে।

যাত্রা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে নানাবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে, ক্রমে সংস্কারগুলি আবার সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। একটি বহুল প্রচলিত সংস্কার হল ভাদ্র মাসের প্রথম দিনটিতে যাত্রা না করা। এই সম্পর্কিত প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি হল—

অগস্ত্য যাত্রা।

ভাদ্রমাসের প্রথম দিন (কৃষ্ণ প্রতিপদে) অগস্ত্য মুনি নাকি বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করে দক্ষিণা পথে গমন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সেখানে আর্য সভ্যতার বিস্তার করেছিলেন আর এরপর আর্যাবর্তে ফিরে আসেননি। এই থেকেই ভাদ্রমাসের প্রথম দিনটিকে অযাত্রা বলে সামাজিক প্রথাটি তৈরী হয়েছে। বর্তমানে শুধু আর ভাদ্রমাসের প্রথম দিনটিই নয়, বাংলা মাসের প্রথম দিন এবং প্রতিপদ তিথি, যাত্রার ক্ষেত্রে অশুভ বিবেচনায় এড়িয়ে চলা হয়। হিন্দু বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ হল—

অরুন্ধতী দর্শন।

হিন্দু বিবাহে কুশণ্ডিকা যজ্ঞের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিয়ে অরুন্ধতীর মত পাতিব্রত্যের অধিকারী হবার কথা বলা হয়। অরুন্ধতী ছিলেন কর্দম মুনির দুহিতা এবং রাজ পুরোহিত বশিষ্ঠের সহধর্মিনী। পুণ্য বলে অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সঙ্গে সপ্তর্ষি মণ্ডলে স্থান লাভ করেন। একটি পরিচিত ইডিয়ম হল—

কালরাত্রি।

বিবাহ প্রসঙ্গে আমরা 'কালরাত্রি' কথাটির সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত। হিন্দু মতে বিবাহের ঠিক পরবর্তী রাত্রি হল কালরাত্রি, এই দিন বর ও বধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। এই সামাজিক রীতিটির পেছনে রয়েছে রামায়ণের একটি ঘটনা। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের ঠিক পরদিনই রাত্রে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন। এই জন্যই কৈকেয়ী দশরথের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। তাই কালরাত্রিতে বর-কনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলে কনের কারণে বরের মৃত্যু ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হয়।

আকাশ প্রদীপ।

সমগ্র কার্তিক মাস ব্যাপী রাত্রে গৃহের সংলগ্ন উঁচু একটি দণ্ডে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। এই প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয় লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে। বামন

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে বলিরাজা কার্তিক মাস ব্যাপী উচ্চ দণ্ডে প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই থেকেই এই প্রথাটির উদ্ভব।

যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বহুল পরিচিত আর একটি ইডিয়ম হল—

কচ্ছপ অযাত্রিক।

যাত্রার সময় কচ্ছপ দর্শন করা দূরে থাক, কচ্ছপের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয়না। কারণ কচ্ছপকে স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। আমরা জানি কূর্ম বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম এবং বসুমতীকে কূর্ম রূপে ইনি পৃষ্ঠদেশে ধারণও করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক ভাবে পৃথিবীর গতিশীলতা স্বীকৃত হলেও, শাস্ত্রে একে নিশ্চল, গতিশক্তি হীন বলেই বলা হয়েছে।

গুরুজন অনুজকে আশীর্বাদ করেন, আর এই আশীর্বাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ হল ধান ও দূর্বা। প্রবাদের ভাষায়—

ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা।

ধান ও দূর্বা উভয়কেই পরমায়ু এবং বংশবৃদ্ধির প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়। ধান এবং দূর্বা উভয়ই শীঘ্র বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে।

একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

আজ মলে কাল তুদিন হবে।

হিন্দু সমাজের রীতি হল যেদিন কারো মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই দিন গণনা শুরু হয় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে।

জ্ঞাতির মৃত্যু হলে অশৌচ হয় আর অশৌচ হলে গৃহস্থকে পাকশালায় ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে রচিত প্রবাদটি হল—

আপনি মরে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

আগেকার দিনে সদ্যোবিধবা সহমরণে যেতে মনস্থ করলে আমগাছের ডাল ধরে তার সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করত। এই সম্পর্কিত প্রবাদটি হল—

আমের ডাল ধরা।

প্রাচীনকালে অপরাধীকে জীবিত অবস্থাতেই মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে পুঁতে বধ করা হত। একে বলা হত গাড়ে দেওয়া। এই সম্পর্কিত বাক্যাংশটি হ'ল—এক গাড়ে দেওয়া।

হিন্দু বিবাহে স্ত্রী আচারের সময় বর-কন্যার শুভদৃষ্টি গোপনে সম্পন্ন করতে

কন্যাপক্ষীয় নাপিত বর-কন্যার মাথার ওপর বস্ত্রের একটা আচ্ছাদন খাটায় এবং স্ত্রী আচারে অংশ গ্রহণকারী এয়োদের এই গোপন ব্যাপারটি দেখা থেকে বিরত রাখতে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে যদি কেউ শুভদৃষ্টি দেখে ফেলে, তাহলে তার হাত হবে নাপিতের হাতের মতন—অর্থাৎ অলঙ্কার শূন্য। সোজা কথায় বিধবা হবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে। এই সম্পর্কিত প্রবাদটি হল—

আমার মতন হাত হবে।

কার্তিক মাসে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার সময় অলক্ষ্মীকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় দেবার রীতি—

আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলোর বায়ে বালাই ওড়ে।

রীতি হচ্ছে নতুন ফসল উঠলে তা আগে দেবতা এবং তারপরে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে নিবেদন করতে হয়। একেই বলে নবান্ন। অগ্রহায়ণ মাসে হয় নবান্নের অনুষ্ঠান। আবার এই মাসেই হিন্দুদের বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত কাল। এই জন্যে অগ্রহায়ণ মাসে কন্যার বিবাহ এবং নবান্নের আয়োজন একসঙ্গে করলে একই আয়োজনে দুটি কাজ সম্পন্ন হয় বলে বলা হয়েছে—

এক কর্মে দুই কর্ম, ঠাকুরঝির বিয়ে আর নবান্ন।

বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহের স্ত্রী আচার নানা রকমের। যেমন একটি স্ত্রী আচার হল কন্যার মা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ বরের হাতে তাঁত বোনা মাকু দিয়ে হাত দুটি ফুলের মালায় জড়িয়ে দেয় এবং মুখে বলে—

কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম।
হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা বল তো বাপু॥

এই স্ত্রী আচারের মধ্য দিয়ে বর পণের মাধ্যমে জামাই কেনার ইঙ্গিতটি প্রতিফলিত।

কলাপাতে না এগোতেই গ্রন্থ লেখার সাধ।

আগেকার দিনে পাঠশালায় লেখা শুরু করা হত প্রথমে বালি ছড়িয়ে তার ওপর আঙ্গুল দিয়ে লেখা দিয়ে। এরপর মাটিতে খড়ি দিয়ে লেখার মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হত। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কালিকলম দিয়ে তালপাতায় লিখত, সবশেষে কাগজে লেখা শুরু হত। এইবার আগেকার দিনে প্রচলিত আর একটি শাস্তিদানের প্রথার উল্লেখ করা গেল।

এই সম্পর্কিত প্রবাদটির উল্লেখ প্রথমে করা হল—

কারও শূল হয়, কেউ পাবে পাবে গণে।

বাঁশের এক গাঁঠ থেকে পরবর্তী গাঁঠের মধ্যস্থ অংশকে বলে পাব। আগে অপরাধীকে শূলে দেবার প্রথা ছিল। এক ব্যক্তি যখন একটু একটু করে শূলের ওপর চড়ে মৃত্যু পথে অগ্রসরমান, তখন সমবেত জনতা লক্ষ্য করে মৃত্যু পথ যাত্রী ব্যক্তিটির দেহ মধ্যে শূলদণ্ডের এক একটি গাঁঠ কি করে প্রবেশ করছে, মৃত্যু পথযাত্রীটির প্রাণঘাতী যন্ত্রণা কেউই লক্ষ্য করেনা।

পাখার বদলে কুলোর বাতাস দান খুবই অপমানকর। আগেকার দিনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করার প্রথা ছিল। তাই বলা হয়—

কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করা।

হিন্দু সমাজে মৃতদেহের সৎকার না হলে তার শ্রাদ্ধ হয় না। তাই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি মৃত বলে প্রতিপন্ন হলে এবং এক্ষেত্রে তার মৃতদেহ যদি না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কুশপুত্তলিকা করে তাকে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি রূপে দাহ করা হয়ে থাকে। এর থেকেই সৃষ্ট হয়েছে 'কুশপুত্তলিকা দাহ' কথাটি।

প্রাচীনকালে দুষ্কৃতকারীর এক গালে চুন এবং অন্য গালে কালি মাখিয়ে পথে পথে ঘোরান হত। এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে—

মুখে চুনকালি।

হিন্দুদের শ্রাদ্ধে প্রেতের তৃপ্তির জন্যে জল ও তিলের অঞ্জলি দান করে মৃতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করা হয়,—একেই বলে

জলাঞ্জলি দেওয়া।

আজকের দিনেও আমরা বলতে শুনি—

বাসি করা কাপড়।

আগেকার দিনে ধোপা শুধু কাপড়ই কাচত না, কাচা কাপড় সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে সুবাসিত করে দিত। এই জন্যেই বাসি করা কাপড় বলার রীতিটি চলে আসছে।

ঢোলের ঘোষণা দিয়ে আগে হাট বসাতে হোত। অলক্ষ্মীর হাটে এই ঘোষণাই ছিল সার, যেহেতু বিক্রয়-বাটা কিছু হত না। তাই বলা হত—

অলক্ষ্মীর হাটে বাজনা সার।

জমিদারের 'পুণ্যাহ' উপলক্ষে বাজনা বাজাবার রেওয়াজ ছিল আগেকার দিনে। তাই বলা হয়—

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী।

আঁতুড় ঘরে নবজাতককে একলা ফেলে রেখে যেতে নেই। কাউকে না কাউকে আঁতুড় ঘরে থাকতে হয়। এর থেকেই এসেছে এই প্রবাদটি—

আঁতুড় আগলানো।

শিব চতুর্দশীর দিন রাতে একটিমাত্র পলতে দিয়ে প্রদীপ জেলে রাখা রীতি, এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে—

শিবরাত্রের সলতে।

যে ব্যক্তির একটিমাত্র সন্তান, তাও কোন ক্রমে যে টিঁকে থাকে, তেমন ক্ষেত্রেই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

বাংলার সমাজ জীবনে জ্যোতিষের প্রভাব অনেকখানি, তারই প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধার করা গেল বর্তমান প্রবাদটি—

একে শনি তায় রন্ধ্র গত।

বলা হয়েছে যে অষ্টম স্থানে আশ্রিত শনি জাতকের প্রাণহানির কারণ হয়।

সরস্বতী পূজার দিন অনধ্যায়, এদিন পড়াশুনা করতে নেই। তাই বলা হয়েছে—

ওরে আমার শ্রীপঞ্চমী।

লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবাদটি প্রযোজ্য হয়।

পূর্বকালে অল্প বয়স্ক বালিকাদের বিবাহ দানের রীতি প্রচলিত ছিল। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহদানকে আদর্শ বিবাহ বলে গণ্য করা হত, আর এরকম ক্ষেত্রে বলা হত গৌরীদান। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বিয়াল্লিশের হাতে গৌরীদান।

অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক বা প্রৌঢ়ের সঙ্গে নাবালিকার যে অসম বিবাহ, তাকে উদ্দেশ করেই প্রবাদটি রচিত হয়েছে।

যাত্রাকালে বেলপাতা শোঁকানর প্রথা ছিল আগেকার দিনে, এর ফলে যাত্রা নাকি শুভ হত বলে বিশ্বাস,—আর এই প্রথা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে—

বেলপাতা শোঁকান।

—এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি।

আগে কাঠের তোড়ঙ (Trone) বা আধারের ছিদ্রে অপরাধীর হাত-পা ঢুকিয়ে দণ্ড বিধানের রীতি ছিল, এর থেকেই সৃষ্ট হয়েছে—

তুড়ুঙ বা তুরুম ঠোকা।

আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে গৃহ ভিত্তিতে সিঁদুর ও ঘি দিয়ে ধারা দেওয়ার

রীতি। একে বলা হয়—বসুধারার ফোঁটা।

মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী, চেদিরাজ উপরিচর বসু ঋষিদের দ্বারা শাপ-গ্রস্ত হয়ে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। ইনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। এই কারণে এঁকে উদ্দেশ করে বসুধারার ফোঁটা দানের রীতি চলিত আছে।

ভরার মেয়ে।

—কন্যা দুর্লভ বলে আগে পূর্বদেশ থেকে নৌকা করে অজ্ঞাত কুলশীল কন্যা এনে বিবাহদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এর থেকেই এই ইডিয়মটি সৃষ্ট হয়েছে।

এখন যত ভূত ও সাপের উপদ্রব কমছে, তত কমছে রোজার সংখ্যা। কিন্তু পূর্বে অবস্থা ছিল অন্যরকম। তখন ভূতের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে রোজাদের সংখ্যাধিক্যও চোখে পড়ত। সর্পদষ্ট বা ভূতে পাওয়া মানুষকে রোজা মুড়ো ঝাঁটার সাহায্যে মারত, এতে অসুস্থ ব্যক্তি নাকি নিরাময় হয়ে উঠত। এই প্রথা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে—

ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ানো।

নিমন্ত্রণ খেয়ে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা আগে ভোজ্য দ্রব্য সঙ্গে বেঁধে বাড়ী নিয়ে যেত। একে বলা হত, ছাঁদা বাঁধা।

আবাতিকালে অনন্তের ব্রত।

—ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে অনন্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর ব্রত করার রীতি। এই ব্রত চোদ্দ বছরের জন্য করতে হয়। 'আবাতিকাল' বলতে অল্প বয়স বোঝান হয়েছে।

কে আছ গো পুতন্তী, স্নান কর গে রটন্তী।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী 'রটন্তী চতুর্দশী' নামে পরিচিত। পুত্রবতীদের এদিন পুত্রের কল্যাণে স্নান করার রীতি প্রচলিত।

প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পদের রক্ষক দেবযোনি বিশেষ, তাই ধনী-কৃপণ মানুষ তাদের ধন যকে দিত। এই কারণে ভূগর্ভে একটি সুরক্ষিত স্থানে পূজা দিয়ে একটি বালককে অন্তরীণ করে রাখা হত। অনাহারে বালকের মৃত্যু হলে সে নাকি যক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়ে ধনীর সঞ্চিত সম্পদ রক্ষা করত। এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে—'যকের ধন' কথাটি।

ওরে আমার কেরে, শেজে মুতো নেরে—

—যে শিশু রাত্রে শয্যায় প্রস্রাব করে ফেলে, তাকে তেমাথার রাস্তায় বসিয়ে

রাখা হত। কেউ তাকে সম্বোধন করলে সে এই কথাটি বলেই পালিয়ে যেত ; এর ফলে বিছানায় প্রস্রাব করার বদভ্যাস নাকি চলে যেত।

পরিবর্তনশীল সমাজের বহু রীতি-নীতির কথাই এইভাবে আমাদের প্রবাদে ধরা পড়েছে। আমাদের সমাজ তথা সামাজিক জীবনকে ভালভাবে জানতে এইসব প্রবাদগুলি যে বিশেষভাবে সহায়ক তা বলাই বাহুল্য। আর এই কারণেই এগুলির নৃতাত্ত্বিক গুরুত্বও যে অপরিসীম তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এ পর্যন্ত বেশ কিছু প্রবাদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এক একটি বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবাদগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা তেমন হয় নি। শুধু সামাজিক রীতি-নীতি নিয়েও অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে। এইসব প্রবাদগুলিকে একত্রিত করে যদি সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে।
